NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

MSW

PAPERS - 10A, 10B & 11

(Bengali)

Community Development (Rural, Urban) & Contemporary Social Problems

MASTER OF SOCIAL WORK

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলেছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : মে, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় : সমাজকর্ম

স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম ঃ

M. S. W. : 10 (A), 10(B), 11

M. S. W. : 10 (A)

		রচনা	সম্পাদনা
একক 1 এবং 7	□	শ্রী সতীনাথ ভুইঞা	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি
একক 2 এবং 3	□	শ্রী বাদল চন্দ্র দাস	
একক 4 এবং 6	□	শ্রী সুধাকর ঘোষ	
একক 5	□	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি	

M. S. W. : 10 (B)

		রচনা	সম্পাদনা
একক 8	□	ভীষ্মদেব অধিকারী	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি
একক 9 এবং 12	□	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি	
একক 10, 11, 13	□	অশেষ মুস্তাফি	
একক 14	□	বাদল চন্দ্র দাস	

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ M.S.W. : 11

		রচনা	সম্পাদনা
একক 1, 2, 3	□	অধ্যাপক অশেষ মুস্তাফি	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 4, 5	□	অধ্যাপক অসিত বসু	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 6, 11, 12	□	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 7	□	শ্রীমতী শিখা গঙ্গোপাধ্যায়	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 8, 9, 10	□	শ্রী কনককান্তি সরকার	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
		অনুবাদ	
একক 1–12	□	শ্রী কনককান্তি সরকার	

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনিবাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MSW - 10 (A) & 10 (B) & 11

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

MSW - 10 (A)

একক 1 ❑ গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতি ও জনবিদ্যা 9–26

একক 2 ❑ গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা, সুযোগ ও সমাজকর্ম পাঠে এই বিষয়ের গুরুত্ব 27–38

একক 3 ❑ অতীতের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ বিশেষকরে শ্রীনিকেতন, গুরগাঁও, ভূ-দান, গ্রামদান ও নীলোখেরীর আলোকে পল্লি পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা 39–51

একক 4 ❑ গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রনালয়, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা এবং গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প 52–67

একক 5 ❑ পঞ্চায়েতি রাজ 68–82

একক 6 ❑ গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও কেন্দ্রীয়করণের ধারণা এবং গ্রামোন্নয়নে ব্যাংক, সমবায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা 83–95

একক 7 ❑ আদিবাসী উন্নয়ন-ধারণা, গুরুত্ব ও পর্যালোচনা 96–108

MSW - 10 (B)

একক 8 ❑ পৌর সমষ্টির উন্নয়ন ধারণা, গুরুত্ব, (কাজের) পরিধি এবং ভারতবর্ষে পৌর সমষ্টির উন্নয়ন 111–115

একক 9 ❑ বস্তি 116–125

একক 10 ❑ পৌর সমষ্টি উন্নয়নের কয়েকটি বিশেষ সংস্থা 126–135

একক 11 ❑ পৌর স্থানীয় সংজ্ঞাসমূহ 136–141

একক 12 ❑ স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা ইত্যাদি; নগর উন্নয়নপ্রকল্পের পশ্চাৎপট, প্রশাসন, লক্ষ্য, লক্ষ্যগোষ্ঠী এবং কাজ 142–147

একক 13 ❑ শহুরে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ 148–160

একক 14 ❑ নগরোন্নয়নে ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা 161–174

MSW 11

একক 1 ❑ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা 177 — 183

একক 2 ❑ ভারতে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা, বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল, বিচ্ছিন্নতা, বাল্যবিবাহের সমস্যা, পণপ্রথা 184 — 193

একক 3 ❑ সামাজিক নির্ভরশীলতার সমস্যা ঃ বার্ধক্য, অক্ষম, গৃহহীন 194 — 215

একক 4 ❑ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, সমস্যার রূপরেখা, মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা, সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান 216 — 223

একক 5 ❑ নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যা, তার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা ও কারণ। পাচার নিবারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা 224 — 228

একক 6 ❑ ভারতে গণিকাবৃত্তির সমস্যা 229 — 242

একক 7 ❑ বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সমস্যা 243 — 250

একক 8 ❑ দারিদ্র্য 251 — 260

একক 9 ❑ বেকারত্ব 261 — 268

একক 10 ❑ জন বিস্ফোরণ 269 — 280

একক 11 ❑ কৈশোর অপরাধ 281 — 293

একক 12 ❑ যুবসম্প্রদায়ের সমস্যা 294 — 305

M. S. W. : 10 (A)

একক—১ ❑ গ্রামীণ সমাজিক কাঠামো, অর্থনীতি ও জনবিদ্যা

গঠন

১.১. প্রস্তাবনা

১.২. গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো

১.২.১. সমাজ ও সামাজিক কাঠামো

১.২.২. গ্রামীণ জনসম্প্রদায়

১.২.৩. গ্রামীণ পরিবার

১.২.৪. জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়গোষ্ঠী, গোত্র

১.২.৫. জাতিভেদ প্রথা

১.৩. গ্রামীণ অর্থনীতি

১.৩.১. অতীত প্রেক্ষাপট

১.৩.২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গ্রামীণ অর্থনীতি

১.৩.৩. গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক

(ক) উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থা,

(খ) কৃষক ও কৃষি শ্রমিক,

(গ) দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

১.৪. গ্রামীণ জনবিদ্যা

১.৪.১. জনবিদ্যার অর্থ, অধ্যয়নের গুরুত্ব

১.৪.২. জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামের শ্রেণিবিভাগ

১.৪.৩. গ্রামীণ জনসংখ্যার আকৃতি ও গতিপ্রকৃতি

১.৪.৪. জনসংখ্যার গঠন

১.৪.৫. জন্ম

১.৪.৬. মৃত্যু

১.৪.৭. নারী ও পুরুষের অনুপাত

১.৪.৮. পরিযান

১.৫. উপসংহার

১.৬. গ্রন্থপঞ্জি

১.৭. প্রশ্নাবলি

১.১. প্রস্তাবনা

মানবসভ্যতার প্রাচীনতম স্থায়ী জনপদ হল গ্রাম। এক-একটি ছোটো ভৌগোলিক এলাকা যেখানে মানুষ মূলত কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করে- তাকেই সাধারণত গ্রাম বলা হয়। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বেশ কিছু

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা রয়েছে। জনসম্প্রদায়ের সমষ্টিগত চেতনা, একান্নবর্তী পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন জাতির সক্রিয় উপস্থিতি গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ়তা প্রদান করে। একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ, সাম্রাজ্যবিস্তার, অনুপ্রবেশ কোনো কিছুই এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারেনি। আবার দেখা যাচ্ছে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি সমাজকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। তাই ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা চিরকালই সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু। বর্তমানে দেশের প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামই ভারতের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। কৃষিকাজ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, উদ্যান-বাগিচা, মৎস্যচাষ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তারা জীবিকা অর্জন করে। তবু দেখা যায়- দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের মানুষের নিত্য সঙ্গী আর অশিক্ষা যেন তার সহোদর। উচ্চ জন্মহার ও দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে। তার সাথে রয়েছে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সমস্যা। তবে আশার কথা, বিগত কয়েক দশকে গ্রামে মানুষের আর্থিক পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে, দরিদ্র মানুষের শতকার হার কমছে, জন্মহার, মৃত্যুহার এবং শিশুমৃত্যুর হারও কমছে।

১.২. গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো

১.২.১ সমাজ ও সামাজিক কাঠামো ঃ

মানুষ সমাজবধ্য জীব। পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বুননের ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। সমাজ কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। এটি একটি বিমূর্ত ধারণা (abstract concept)। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের মতে বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, গোষ্ঠী ও শ্রেণি এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই হল সমাজ।

সামাজিক কাঠামো বলতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সমাহার সৃষ্ট সম্পর্ককে বোঝায়। এটিও একটি বিমূর্ত ধারণা। মনে রাখতে হবে সংগঠিত গোষ্ঠী বা সংস্থা হল সংঘ। আর সংঘ যে সমস্ত কার্যপদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি হল প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- পরিবার একটি সংঘ আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হল বিবাহ। রাষ্ট্র একটি সংঘ আর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হল সংবিধান, আইন, নির্বাচন, সরকার ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে বুঝতে হলে- গ্রামীণ জনসম্প্রদায়, পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়গোষ্ঠী এবং জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যিক।

১.২.২ গ্রামীণ জনসম্প্রদায় ঃ

ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যেমন ঃ

সমষ্টিগত চেতনা (Community consciousness) — গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ উৎসব অনুষ্ঠানে কিংবা দুর্দিনে সবাই একজোট হয়ে কাজ করে। ব্যক্তি নিজের গ্রামের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রামের নাম উল্লেখ করে। সবাই যেন সমমনোভাবাপন্ন। এসবই সমষ্টিগত চেতনার পরিচয়।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতি — গ্রামীণ অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর। অধিকাংশ মানুষ সরাসরি চাষবাস করে জীবিকানির্বাহ করে। অনেকে আবার কৃষির সাথে যুক্ত এমন আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করে থাকে। কৃষিকাজে পুরুষ, মহিলা এমনকি শিশু এবং বয়স্করাও নিযুক্ত থাকে। কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামে অনেক ধরনের পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, নাচ, গান অনুষ্ঠিত হয়।

সরলতা ও প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব — গ্রামের জনসংখ্যা সাধারণত কম হয়। মানুষের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল। গ্রামে সমাজের নিয়ম, প্রথা, লোকাচার মেনেই তাদের চলতে হয়। মানুষের আচার আচরণ খুবই স্বতঃস্ফূর্ত। অপরাধের ঘটনাও খুব কম দেখা যায়। পরস্পর পরস্পরকে বিপদে আপদে সাহায্য করে। একে অপরকে চেনে, খোঁজ খবর রাখে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কারে বিশ্বাস — গ্রামের মানুষের সাথে বাইরের জগতের সম্পর্ক খুবই কম থাকে। নিজেদের সম্বন্ধে অন্ধ আবেগ ও বিশ্বাস থাকে। অনেক সময় গোঁড়ামি প্রকাশ পায়। খোলামনে নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না। অনেকে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে।

১.২.৩ গ্রামীণ পরিবার ঃ

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা খুবই কম। পরিবারই ব্যক্তির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামে ব্যক্তির অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা, বিবাহ, বিনোদন ইত্যাদি বিষয় পরিবার ঠিক করে দেয়। ভারতবর্ষের গ্রামে যৌথ পরিবার বা একান্নবর্তী (joint family) পরিবারই বেশি দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীভূত (nuclear family) পরিবারের সংখ্যা কম। একান্নবর্তী পরিবারের একাধিক

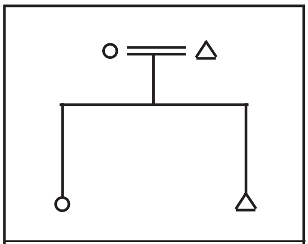

কেন্দ্রীভূত পরিবার

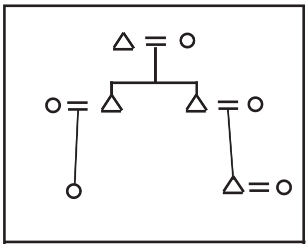

একান্নবর্তী পরিবার

প্রজন্মের অনেক সদস্য একসঙ্গে বসবাস করে। যৌথ সম্পত্তি থাকে এবং যৌথভাবে উৎপাদন করে। সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা অনেক বেশি, সহযোগিতার মানসিকতা দেখা যায়। তবে সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ হতেও দেখা যায়।

ভারতবর্ষের গ্রামে সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক (patriarcheal) পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ মানুষই একান্নবর্তী পরিবারের কর্তার ভূমিকা পালন করে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার পুরুষ থেকে পুরুষে (patri-lineal) বর্তায়। তবে বর্তমানে আইন করে মহিলাদেরও সম্পত্তির সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে। বিবাহের পর মহিলারা স্বামীর গৃহে (patrilocal) যায়। তবে কেরালার নায়ার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারের গুরুত্ব অনেকটা কমছে এবং এই ধরনের পরিবার ভেঙে ছোটো হচ্ছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা, ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আয়ের সুযোগ, প্রবাসন ইত্যাদি কারণে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। অনেক সময় এটাও দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ মানুষেরা জীবিকার সন্ধানে পরিবার থেকে দূরে থাকছে আর মহিলারা সংসার চালাচ্ছে। এখন শুধু পারিবারিক পরম্পরা নয়, ব্যক্তির মর্যাদা নির্ভর করে তার শিক্ষা, আয় ও অন্যান্য সাফল্যের ওপর। বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন, স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী গঠন ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে।

১.২.৪ জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়গোষ্ঠী, গোত্র ঃ

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রামে একটি পরিবারের সঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি পরিবারের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। এই বৃহত্তর গোষ্ঠী জ্ঞাতিগোষ্ঠী (lineage) হিসেবে পরিচিত। একই পূর্বপুরুষ থেকে এদের উৎপত্তি। এই পূর্বপুরুষকে শনাক্ত (traceable descent) করা সম্ভব। বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন- জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তারাই কেবল অশৌচ পালন এবং নির্দিষ্ট কিছু আচার-আচরণ পালন করে।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী ছাড়াও বৈবাহিক সূত্রে একটি পরিবারের সাথে অন্যান্য গ্রাম বা ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত বেশ কিছু পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে। এই আত্মীয়তা মূলত একই জাতির মধ্যে গড়ে উঠে। আবার দেখা যায় নির্দিষ্ট বৃহত্তর গোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মানুষ পূর্বপুরুষে (mythical descent) বিশ্বাস করে। এই বৃহত্তর গোষ্ঠী গোত্র নামে পরিচিত। যেমন কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, মাদুগল্য, আলম্বায়ন ইত্যাদি। এইভাবে পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়গোষ্ঠী, গোত্র বেশ কিছু সামাজিক কাজকর্ম এবং সদস্যদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও বর্তমানে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে তবু গ্রামীণ জীবনে এই সকল গোষ্ঠীর ভূমিকা এখনও অনস্বীকার্য।

১.২.৫ জাতিভেদ প্রথা ঃ

জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজের এক সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এটি একটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ। এই প্রথা কোথায়, কবে, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয় উৎপত্তির প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি মুষ্টিমেয় কিছু বর্ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। কালক্রমে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে জাতিভেদ প্রথা বর্ণভেদ প্রথার রূপান্তরিত রূপ। বর্ণ সংখ্যায় মাত্র কয়েকটি, কিন্তু জাতি অসংখ্য। বর্ণভেদ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দেখা যায় তাই এটি সমাজ ব্যবস্থার একটি বৃহত্তর কাঠামো (macro model)। এক একটি জাতি এক এক জায়গায় দেখা যায়। তাই এটি একটি ক্ষুদ্রতর কাঠামো (micro model)। একটি গ্রামে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। সেইসব জাতিগুলির মধ্যে উলম্ব (vertical) কাঠামো বা সম্পর্ক এবং বিভিন্ন গ্রামের জাতিগুলির সাথে অনুভূমিক (horizontal) কাঠামো বা সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক আন্দ্রে বেতাইলের মতে - জাতিভেদ প্রথা এমন একটি সামাজিক প্রথা যেখানে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যগণ স্ব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ রীতি, বংশগত সদস্য গ্রহণ পদ্ধতি, নির্ধারিত পেশা ও একটি সুনির্দিষ্ট জীবনশৈলী অনুসরণ করে।

জাতিভেদ প্রথার কতকগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল—

ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থা ঃ জাতিভেদ প্রথা বংশগত পদমর্যাদার ভিত্তিতে এক একটি গোষ্ঠী তৈরি করে সমগ্র সমাজকে ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে বিভক্ত করে। এই বিভাজনের ভিত্তি কর্ম ও ধর্ম।

জনসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যতা সংরক্ষণ ঃ পেশা, আচার-আচরণ, পূজা-উপাসনা, বিবাহ, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই জাতিগুলি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এর ফলে জনগোষ্ঠীর বংশগত স্বাতন্ত্র্যতাও বজায় থাকে।

কর্মদক্ষতার বিকাশ ও কর্মনিশ্চয়তা ঃ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পেশা থাকায় সেই পেশায় মানুষের দক্ষতা বাড়ে। উন্নতমানের কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু এক জাতির মানুষের পেশা অন্য জাতি করতে পারবে না তাই কর্ম নিশ্চয়তা থাকত।

অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ ঃ জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে উঁচু নীচু ভেদাভেদ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা এবং ঐ পর্যায়ে সীমাবন্ধ রাখার মতো অমানবিক ঘটনা সমাজে ঘটত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান সমাজে কোথাও কোথাও এখনো এই রকম ঘটনার নমুনা পাওয়া যায়। এর ফলে বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি হয়। এই ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। সবাইকে সমান অধিকার দেয় না।

নিশ্চল, নিরুদ্যম সমাজব্যবস্থা ঃ যেহেতু কেউ স্ব-জাতির পেশা ভিন্ন নতুন কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারবে না তাই হতাশার সৃষ্টি হয়। সমাজের অগ্রগতির থেমে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাতি তার সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। কেউ নিয়মভঙ্গ করলে জাতির অধিকার ছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার।

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় আর একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যজমানি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। জাতিগুলি যে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল তা এই পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কাজ আছে। সেই কাজের মাধ্যমে অন্য জাতির মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হত। এই সম্পর্ক একটি চিরস্থায়ী, বংশগত সম্পর্ক। এর ফলে কাজ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকত। এখনো গ্রামে জন্ম, মৃত্যু বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, কুমোর, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকার ইত্যাদি জাতির গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায় জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা, বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে জাতিভেদ প্রথার গুরুত্ব কমছে। এক সময় জাতি সামাজিক পদমর্যাদা প্রদান করত এখন তার বুদ্ধি ও কাজ মর্যাদা স্থির করছে। রাজনৈতিক কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কর্তৃত্ব হ্রাস পাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে, পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুপ্রবেশ ঘটছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বাড়ছে। এর ফলে গোষ্ঠীর গুরুত্ব ক্রমশ কমছে।

১.৩. গ্রামীণ অর্থনীতি

১.৩.১ অতীত প্রেক্ষাপট ঃ

ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর। একসময় গ্রামগুলি প্রায় আত্মনির্ভরশীল (self-sufficient) ছিল। বিভিন্ন জাতি তাদের পেশাগত পরিসেবা দিত। বিনিময়ে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য জিনিস পেত। জমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ শ্রমিক ভূমিহীন ছিল। চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষবাস হত। উৎপাদন ছিল খুবই কম। বিটিশ শাসনের সময় গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কৃষকদের কাছে নিয়মিত জমির রেভিনিয়্যু সংগ্রহ করত, এই অর্থ মূলত প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করত। অবশিষ্ট অর্থ কোম্পানির লাভ হিসেবে দেশে পাঠাত। কোনোদিন তারা কৃষির উন্নতির কথা ভাবেনি। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। ভারতের সুতিবস্ত্র যাতে রপ্তানি হতে না পারে সেজন্য ৭৮% লেভি ধার্য করা হয়েছিল। ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণ করে পাট, চা, কফি, রাবার চাষের ওপর জোর দিয়েছিল। রেলপথ তৈরি করে এদেশের কাঁচামাল বিদেশে নিয়ে যেত। গ্রামীণ কারিগর মেশিনে উৎপাদিত ব্রিটিশ সামগ্রীর সাথে পাল্লা দিতে না পারায় তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তারাও কুটিরশিল্পের বদলে কৃষিতে বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করে। এইভাবে কৃষির গুরুত্ব বাড়ে আর কুটির শিল্পের গুরুত্ব কমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রামীণ অর্থনীতি এতই খারাপ হয়েছিল যে বারবার মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

১.৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ

স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বল, অনগ্রসর, নিশ্চলভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫০ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠন করা হয়। ১৯৫১ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলছে। গ্রামীণ তথা সর্বভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ও সাফল্য আলোচনা করা হল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	উদ্দেশ্য	সাফল্য বা প্রভাব
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	খাদ্যসমস্যা সমাধান, কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন।	এই পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় ১৮% এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি পায়। এই সময় গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতিগুলির বিস্তার ঘটানো হয়।
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, বুনিয়াদি শিল্পের ওপর গুরুত্ব, আয় সম্পদ বণ্টনে সমতা আনা।	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য না আসায় খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়।
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	কৃষির ওপর জোর দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করা।	কৃষি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা যায়। খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। সেই সময় ভারত-চিন যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ, খরা পরিস্থিতি ইত্যাদির ফলে ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা দূর করার জন্য পর পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯) করা হয়।		
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)	কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, সমবায় সম্প্রসারণ।	কৃষিক্ষেত্রে নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হয় এবং বার্ষিক উৎপাদন দাঁড়ায় ২.৮%।
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা।	কৃষিতে রেকর্ড উৎপাদন হয়। (এই সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়।)
ষষ্ঠ পঞ্চমার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাস করা, উচ্চতর হারে উন্নয়ন, আয় সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করা ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়।	এই সময়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার পরিমাণ ৪৮.৩% থেকে কমে ৩৬.৯% হয়।
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা।	কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি বার্ষিক ৩.৪% দাঁড়ায়, এবং এই অগ্রগতির স্থিতাবস্থা ছিল না।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭) রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য অষ্টম পরিকল্পনা ১৯৯০ সালে শুরু হতে পারেনি।	নিয়োগ সৃষ্টি, সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ওপর গুরুত্ব।	এই পরিকল্পনায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতির ৩.৫ শতাংশ দাঁড়ায়।
নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার সাথে আর্থিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার।	কৃষিক্ষেত্রে ২.৭ শতাংশ অগ্রগতি ঘটে।
দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭)	দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশ নামিয়ে আনা। কৃষিতে বিকাশের হার স্থির করা হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ।	

এক কথায় বলা যায়, বিগত ৫৫ বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ তথা সারা ভারতের অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। ১৯৭০ এর দশকে সবুজ বিপ্লব হয়েছে। ঐ সময় খাদ্যশস্যের উৎপাদন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করেছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের পর খাদ্য আমদানি একপ্রকার বন্ধ হয়েছে। অতীতের মতো আর খাদ্যসংকট দেখা যায় না। তবে দেশের সব জায়গায় সমান উৎপাদন হয় না এবং খাদ্যবণ্টনে এখনও বৈষম্য রয়েছে।

১.৩.৩ গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ঃ

(ক) উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ

কৃষি — ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষি ও কৃষি আনুষঙ্গিক কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। স্বাধীনতার পরেও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত। ওই সময়ে কৃষি উৎপাদন খুবই কম ছিল। মৌসুমি বৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত। উন্নত বীজ, সার কিংবা কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগ ছিল না বললেই হয়। কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছিল। জনচাপ বৃদ্ধির ফলে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন কমে, বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে কৃষির উন্নতির জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভূমিসংস্কার করা হয় এবং জমিদারি প্রথার অবসান ঘটানো হয়। বড়ো বড়ো জলাশয় বা বাঁধ তৈরি করে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো হয়। ফলে শস্য পর্যায় বদলায়। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, সার ও ওষুধের প্রয়োগ, বহুফসলি চাষ ইত্যাদি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৮৮-৮৯ এই সময়ে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব দেখা যায়। কৃষি বিপ্লবের ফলে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে যায়। কৃষকদের সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা ও সহজে কৃষি ঋণ দেওয়ার জন্য কৃষি সমবায় গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। ব্যাংকের মাধ্যমেও ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক (NABARD) গড়া হয়। শস্যবিমা ও শস্যের ন্যূনতম দাম বেঁধে দেওয়ার ফলে গরীব কৃষকেরা অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে চিরাচরিত কৃষির বদলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের ওপর ঝোঁক বেড়েছে ঠিকই তবে বেশ কিছু সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। আধুনিক কৃষিতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের সঙ্গে উপকারী বা বন্ধুপোকাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাটির অম্লতা বাড়ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কৃষিতে জৈব সার যেমন- নাদেপ, ভার্মি-কম্পোস্ট, জৈব ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রাণীসম্পদ — কৃষির সাথে গ্রামীণ অর্থনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রাণীসম্পদ। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারের এই নিবিড় খামার ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। জাতীয় আয়ের প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ প্রাণীসম্পদ থেকে আসে। বিশ্বের মধ্যে ভারতে গোরু, মোষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ চাষের কাজে লাগে আবার চাষ থেকেই এদের খাবার পাওয়া যায়। বলদের সাহায্যে হাল করা হয়, গোরুর গাড়ি চালানো হয়। গোরু, মোষের দুধ বিক্রি করে গ্রামীণ পরিবারগুলি নিয়মিত আয় করে। বর্তমানে বলদের বদলে ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ হচ্ছে। ফলে বলদের ব্যবহার কমছে। অন্যদিকে ছাগল ও ভেড়ার চাষ বাড়ছে। মাংসের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকায় এই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। খামার অর্থনীতির আর এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল হাঁস ও মুরগি। অনেক মানুষ পোল্ট্রি করে জীবিকা অর্জন করছে। প্রত্যেক বছর আমাদের দেশে ডিমের উৎপাদন বাড়ছে। গ্রামের পরিবারগুলি চিরাচরিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি রাখে। ফলে প্রাণীজ সম্পদের উৎপাদন কিছুটা কম হয়। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সংকর জাতের গো-পালনের মাধ্যমে বেশি পরিমাণ দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। উন্নত জাতের হাঁস, মুরগি ও শূকর পালন এবং নিয়মিত টিকাকরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্লকস্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর রয়েছে এবং সেখানে বি. এল. ডি. ও., ভি. এস., এল. ডি. এ. এই সব কর্মী রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা ও এলাকায় প্রাণীসম্পদ বিকাশের চেষ্টা করেন। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাণী-বন্ধুরা টিকাকরণের মাধ্যমে প্রাণীসম্পদ সুস্থ রাখার দায়িত্ব পালন করেন।

মৎস্যচাষ — গ্রামীণ অর্থনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মৎস্যচাষ। গ্রামের বেশিরভাগ পুকুর, ভেড়িতে মাছ চাষ করা হয়। সেই মাছ সারাবছর যেমন পরিবারের চাহিদা মিটায় তেমনি বাজারেও বিক্রি করা হয়। চিংড়ি রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী মাছ। অনেক মানুষ আবার নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, গুজরাট এই সকল রাজ্যের সৈকত এলাকার মানুষের মূল পেশা মাছ ধরা।

বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যগোষ্ঠী গঠন (FFDA বা মৎস্য চাষি উন্নয়ন সংস্থা) করা হচ্ছে। সরকার থেকে মাছ চাষের জন্য তাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে মাছের উৎপাদন বাড়ছে আর মানুষের কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে।

উদ্যান — গ্রামে অধিকাংশ কৃষকের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও উত্তরপূর্ব ভারতে কমলালেবু, হিমাচলপ্রদেশ ও কাশ্মীরে আপেল, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে আঙুর, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের আম বিখ্যাত। এই সকল এলাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফল চাষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তা ছাড়া দেশের প্রায় সর্বত্র নারিকেল, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, আনারস, লেবু, সফেদা ইত্যাদির ফলন দেখা যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারিকেল ও কাজু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তেঁতুল, হলুদ, আদা, এলাচ, গোলমরিচ ইত্যাদি গ্রামীণ এলাকায় আয়ের একটি উৎস। অনেকে আবার ফুলচাষ, পানচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফলবাগান তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে ফল বাগানের এলাকা বাড়ছে। আবার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ধরনের উদ্যোগ অদূর ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বনজ-সম্পদ — ভারতের প্রায় ২২ শতাংশ ভূখণ্ড বনভূমি। অধিকাংশ আদিবাসী এই জঙ্গল এলাকায় বাস করে। তাদের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। তারা জঙ্গলের ফলমূল, মধু, লতা-পাতা সংগ্রহ করে, শিকার করে। কেঁদ পাতা, শাল পাতা, জ্বালানির কাঠ ইত্যাদি বিক্রি করে সারাবছর তারা

উপার্জন করে। আদিবাসীদের গোরু, ছাগল সারাদিন জঙ্গলেই ছাড়া থাকে। তাদের বিভিন্ন উৎসব জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে প্রকৃতিক বনভূমির আয়তন কমছে। এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ গাছ কেটে জঙ্গল ধ্বংস করছে। বনসংরক্ষণ কমিটি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমানে সরকার থেকে সামাজিক বনসৃজনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। লাক্ষা ও তসর চাষের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চলছে।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প — গ্রামের বিভিন্ন পরিবার বংশপরম্পরায় বেশ কিছু শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক শিল্পই হল কুটিরশিল্প। এখানে পরিবারের সদস্যরা শ্রম দিয়ে বিক্রির জন্য পরিবারের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। এসবের মধ্যে তাঁতশিল্প, মৃতশিল্প, লৌহশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প, শঙ্খ শিল্প, অন্যান্য ধাতবশিল্প ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া বাঁশ, বেত, মাদুর, নারিকেল ও বাবুই দড়ির শিল্প ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। কুটিরশিল্পে বড়ো বা জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। ভাড়াটিয়া শ্রমিক থাকে না। অন্যদিকে ক্ষুদ্রশিল্পে ভাড়াটিয়া শ্রমিক থাকে। উৎপাদন সংস্থার নিজস্ব কারখানা বা কাজের জায়গা থাকে। প্রাচীন খাদি শিল্প, বয়ন শিল্প, জুতো, তেল, সাবান, প্রসাধন সামগ্রী, বিড়ি, ধূপ ইত্যাদি ক্ষুদ্রশিল্পের উদাহরণ। গ্রামের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ কারিগর ভূমিহীন। আবার কুটিরশিল্পে যেহেতু বড়ো যন্ত্র ব্যবহার হয় না তাই উৎপাদন কম। উৎপাদিত দ্রব্য মেসিনজাত দ্রব্যের সাথে পাল্লা দিতে না পারায় বাজারে কম দামে বিক্রি করতে হয়। এর ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ওপর নির্ভরশীল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো হয় না।

(খ) কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ঃ

ভারতবর্ষে কৃষকের চেয়ে কৃষি শ্রমিক অনেক বেশি। মনে রাখতে হবে কৃষক নিজে জমি চাষের সিদ্ধান্ত নেয়, মূলধন বিনিয়োগ করে, শ্রম দেয়, ঝুঁকি গ্রহণ করে। আমাদের দেশে কৃষকদের মধ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষক এই শ্রেণিভুক্ত। নিম্নে কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণির পরিসংখ্যান দেওয়া হল ঃ

কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণি		শতকরা হার
প্রান্তিক চাষি	(১ হেক্টর পর্যন্ত)	৫৭%
ক্ষুদ্র চাষি	(১-২ হেঃ পর্যন্ত)	১৮%
মাঝারি চাষি	(২-১০ হেঃ পর্যন্ত)	২৩%
বড়ো চাষি	(১০ হেঃ এর বেশি)	২%

এ ছাড়া দেশে ভাগচাষি অনেক ছিল। তারাও আংশিক কৃষক। তাদের জমি থাকে না, কিন্তু চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভাগচাষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা বহন করে। অন্যদিকে কৃষিশ্রমিক কেবল শ্রম দেয়, বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা মজুরি পায়। তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কোনো ঝুঁকি থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র। এক সময় জমিদারি প্রথা ছিল। কৃষিশ্রমিকরা ঋণগ্রস্ত থাকত। তারা শ্রম দিতে বাধ্য থাকত। শোষণের শিকার হত। এমনকি বংশপরম্পরায় একই পরিবারে শ্রম দিতে হত। তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। পরবর্তীকালে ভূমিসংস্কার আইনের ফলে জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, জমি পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। ফলে ভূমিহীন শ্রমিক জমির মালিক হয়েছে। শ্রম-সমবায় গঠনের ফলে কৃষি-শ্রমিকরা কৃষিমরসুমের পরে কাজ পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প চালু হয়েছে। বিশদফা কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে

কৃষি-শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এখনো কৃষি-শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার হয়। মহিলারা পুরুষদের সমান মজুরি পায় না।

(গ) দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ঃ

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দারিদ্র্য। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি আমাদের মৌলিক চাহিদা। তার সঙ্গে চাই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। আমাদের দেশের একটি বৃহৎ অংশ এই সকল চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাতে পারে না। তাদের জীবনযাত্রার মান এতই খারাপ যে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে থাকে। তারা অপুষ্টিতে ভুগে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে, তাদের মধ্যে শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব এবং বেকারত্ব দেখা যায়। গ্রামের ওই সব দরিদ্র মানুষ কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। অবহেলা ও শোষণের শিকার হয়।

কারা দরিদ্র তা বোঝবার জন্য দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা এই সীমার নীচে বাস করে তাদেরকেই সাধারণভাবে দরিদ্র বলা হয়। এই সীমারেখার আর্থিক মানদণ্ড সময় সাপেক্ষে বদলে যায়। যদিও দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের বিষয়টি জটিল বেং বিতর্কিত, তবু এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। এই সীমা নির্ধারণে নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয় (১) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যায়ের অনুপাত, (২) খাদ্যের ক্যালোরি মূল্য, (৩) জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ব্যয় ও (৪) মাথাপিছু আয় ইত্যাদি। এখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মাথাগুনতি মানুষের সংখ্যাকে দরিদ্র বলা হলেও দরিদ্র ও খুব দরিদ্র মানুষের ধারণা পাওয়া যায় না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দারিদ্র্য পরিমাপ করার বিশেষ পদ্ধতি (সেন ইন্ডেক্স) প্রয়োগ করেন যার সাহায্যে দারিদ্র্যের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। সূত্রটি নিম্নরূপ—

$$P = H [1 (1 – I) G]$$

এখানে, P = দারিদ্র্যের পরিমাপ,

H = দারিদ্র্যের মাথাগুণতি অনুপাত (HCR) অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তুলনায় দারিদ্র্যসীমার নিম্নবর্তী মানুষদের সংখ্যাগত অনুপাত,

I = আয়ের ফারাক (Income gap)

G = গিনি গুণাঙ্ক (Gini Co-efficient)

গ্রাম ও শহরে দরিদ্র মানুষের শতকরা হার ঃ

সময়	গ্রাম	শহর	মোট
১৯৫৭-৫৮	৫০.২	-	-
১৯৬৭-৬৮	৫৬.৫	-	-
১৯৭৭-৭৮	৫৩.০	৪৫.২	৫১.৩
১৯৮৭-৮৮	৩৯.১	৩৮.২	৩৮.৯
১৯৯৯-২০০০	২৭.১	২৩.৬	২৬.১

ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ২৬.১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র মানুষের শতকরা হার অনেকটাই বেশি। পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্রতা কম থাকলেও ষাটের দশকে তা বৃদ্ধি পায়। তারপরে ধীরে ধীরে কমছে। গ্রামের দারিদ্রতার অন্যতম কারণগুলি হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, মাথাপিছু কম চাষের জমি, মাথাপিছু কম আয়, স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প সঞ্চয় ইত্যাদি। তার সাথে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি

সমস্যাকে আরো তীব্রতর করছে। বেকার ও অর্থ-বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ২০০২ সালে দেখা যায় ভারতে ৩.৪৮ কোটি মানুষ বেকার এবং তাদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। গ্রামে বেশির ভাগ জমিতে একবার চাষ হয়। এর ফলে কৃষকরা কৃষি মরশুমের পরে কাজ পায় না। আবার উদবৃত্ত শ্রমিক রয়েছে। এইভাবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনস্ফীতির দুষ্টচক্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মতো গভীর সমস্যা অপসারণের জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ সময় নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়—

১। সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) ও সংশ্লিষ্ট তিনটি কর্মসূচি (TRYSEM, DWCRA, MWS)

২। ভূমিহীন কৃষকদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত কর্মসূচি (RLEGP)

৩। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যক্রম (NREP)

৪। জওহর রোজগার যোজনা (JRY)

৫। সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)

৬। প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY)

৭। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্ব-রোজগার যোজনা (SGSRY) ইত্যাদি।

তা ছাড়া বর্তমানে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প (NREGS) চালু হয়েছে। বেকার ছেলে মেয়েদের স্বনির্ভর করার জন্য স্কুল, কলেজে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সকল কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে কিছুটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও গতির সঞ্চার করতে পারলে উৎপাদন আরো বাড়বে এবং দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে। তার সঙ্গে চাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার সুনির্দিষ্ট প্রয়াস।

১.৪. গ্রামীণ জনবিদ্যা

১.৪.১ জনবিদ্যার অর্থ ও অধ্যয়নের গুরুত্ব ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণত মানুষকে কেন্দ্র করেই হয়। কোনো এলাকার জনসংখ্যা কত, পুরুষ কত, মহিলা কত, শিশু কত, শিক্ষার হার কেমন, জন্মহার, মৃত্যুহার কেমন এসবই পরিকল্পনা তৈরির সময় দরকার হয়। আর জনসংখ্যার গঠন, বৈশিষ্ট্য, গতিপ্রকৃতি, জন্ম, মৃত্যু, জনসংখ্যার ওপর সমাজের প্রভাব, সমাজের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব ইত্যাদি জনবিদ্যা (Demography) বা জনসংখ্যা বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। জনবিদ্যার সাহায্যে জনসংখ্যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবটাই জানা যায়। গ্রামীণ জনবিদ্যায় (Rural Demography) মূলত গ্রামের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়। কেনই বা গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার হার কম, জন্মহার ও মৃত্যুহার বেশি; গ্রাম থেকে শহরে মানুষের চলে যাওয়ার (Migration) কারণ কী এবং গ্রামীণ সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করা হয়। যদিও জনসংখ্যা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ শহুরে ও গ্রামীণ জনবিদ্যা আলাদা বিষয় হিসেবে ধরেন না, তবু গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে গ্রামীণ জনসংখ্যার বিষয়বস্তু আলাদাভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। আর ভারতের মতো দেশে যেখানে প্রায় ৭২ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে সেখানে গ্রামীণ জনবিদ্যার আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

১.৪.২ জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামের শ্রেণিবিভাগ ঃ

২০০১ সালের লোক গণনা অনুসারে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

জনসংখ্যা	গ্রামসংখ্যা
৫০০ চেয়ে কম	২৩৬,০০৪
৫০০ - ৯৯৯	১৫৮,১২৪
১০০০-৪৯৯৯	২২১,০৪০
৫০০০-৯৯৯৯	১৫,০৫৮
১০০০০ও বেশি	৩,৯৭৬

নির্দিষ্ট জনসংখ্যার নিরিখে যখন কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় তখন দেখা যায় সমস্ত ছোটো গ্রামে পরিসেবা কার্যালয় চালু করা যাচ্ছে না। ফলত পরিসেবা গ্রহণের জন্য এক গ্রামের মানুষকে অন্য গ্রামে যেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রতি ২৫০০ জনসংখ্যাপিছু একটি করে জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার কথা, প্রতি ১০০০ জনপিছু একটি স্বাস্থ্য পরিসেবা কেন্দ্র চালু হওয়ার কথা। ওসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছোটো ছোটো গ্রামে পরিসেবা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের কেরালাতে অধিকাংশ গ্রামে ১০,০০০ জনের বেশি মানুষ বাস করে। সেখানে ছোটো গ্রাম নেই বললে হয়। কিন্তু ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও জম্মুকাশ্মীরে অধিকাংশ গ্রামের লোকসংখ্যা খুবই কম। জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় এবং আদিবাসী গ্রামগুলিতে সাধারণত দেখা যায় জনসংখ্যা কম। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নে অসুবিধা বা বিলম্ব হয়।

১.৪.৩ গ্রামীণ জনসংখ্যার আকৃতি ও গতিপ্রকৃতি ঃ

বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামে বাস করে। ২০০১ সালের লোক গণনা অনুসারে ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যা ৭৪.২৪ কোটি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২.২২ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশি।

স্থান	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	নারী ও পুরুষের অনুপাত
সমগ্র ভারত	১০২৮৬১০৩২৮	৫৩২১৫৬৭৭২	৪৯৬৪৫৩৫৫৬	৯৩৩
গ্রামের জনসংখ্যা	৭৪২৪৯০৬৩৯	৩৮১৬০২৬৭৪	৩৬০৮৮৭৯৬৫	৯৪৬
শহরের জনসংখ্যা	২৮৬১১৯৬৮৯	১৫০৫৫৪০৯৮	১৩৫৫৬৫৫৯১	৯০১

বিগত দশকে (১৯৯১ — ২০০১) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮.০৬ কোটি আর গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৬১ কোটি। গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধীরে ধীরে শহরের জনসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে বিগত ৫০ বছরের পরিসংখ্যান দেওয়া হল এভাবে ঃ

সাল	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
১৯৫১	৩৬.১	৮২.৮%
১৯৬১	৪৩.৯	৮২.০%
১৯৭১	৫৪.৮	৮০.১%
১৯৮১	৬৮.৫	৭৬.৮%
১৯৯১	৮৬.৩	৭৪.২৭%
২০০১	১০২.৮	৭২.২২%

রাজ্যগুলির মধ্যে হিমাচলপ্রদেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার সবচেয়ে বেশি (৯০.২১%)। আর কেন্দ্র শাসিত দিল্লিতে সবচেয়ে কম (৭%)। বিহার, সিকিম, অসম, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যেও এই হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ৭১.৯৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। শহরায়ণ ও নগরায়ণের ফলে শহরে জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ছে। তা ছাড়া শহরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকায় মানুষ শহরে এসে বসবাস করছে। এমনকি গ্রামের রাজনৈতিক ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে শহরে চলে আসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে কোনো এলাকায় জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে ঐ এলাকায় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও পরিমাণের ফলে। জন্মের ফলে জনসংখ্যা বাড়ে, মৃত্যুর ফলে কমে, বিবাহের ফলে সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে এবং অভিবাসনের ফলে বাড়ে আবার প্রবাসনের ফলে কমে।

অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি = (জন্ম + অভিবাসন) – (মৃত্যু + প্রবাসন)

১.৪.৪. গ্রামীণ জনসংখ্যার গঠন ঃ

গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় ৩৭ শতাংশ শিশু (০-১৪ বছর) এবং শহরে প্রায় ৩০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় গ্রামে জন্মহার বেশি। বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে গঠিত পপুলেশান পিরামিড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- পিরামিডের তলার দিক অনেকটা চওড়া অর্থাৎ কম বয়সের (০-১৪) ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি। এর কারণ উচ্চ জন্মহার। তবে বিগত ৫০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (০-১৪) বছর বয়সের জনসংখ্যার শতকরা হার ধীরে ধীরে কমছে এবং (১৫-৫৯) বছর ও ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের শতকরা হার ক্রমশ বাড়ছে। কম বয়সের জনসংখ্যা বেশি হলে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, তেমনি (১৫-৫৯) বয়ঃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়লে কাজের চাহিদা ও বেকারত্ব বাড়বে। আর বয়স্ক (৬০ +) মানুষের সংখ্যা বাড়লেও বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন উন্নত দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে। বয়স্ক মানুষদর সামাজিক সুরক্ষা ও স্থাস্থ্য পরিসেবার দিকে বেশি নজর দিতে হয়। তা ছাড়া পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মানসিক সমস্যাও রয়েছে।

(০-১৪) এবং (৬০ +) বয়ঃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হল নির্ভরশীল জনসংখ্যা। এই সংখ্যা বৃদ্ধি সঞ্চয়, বিনিয়োগ তথা অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

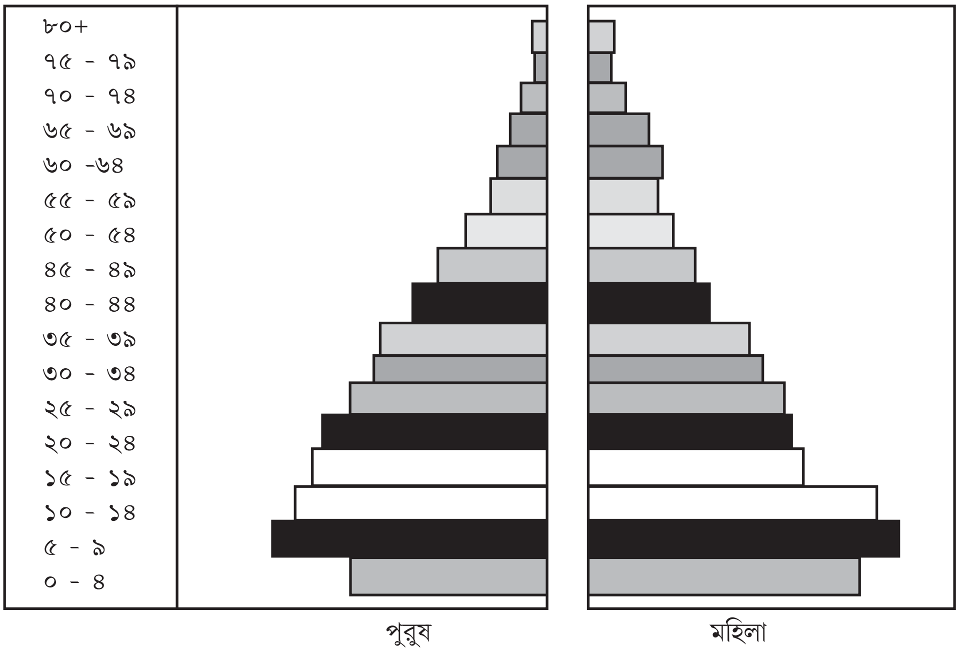

নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত (Dependency Ratio) = $\dfrac{\text{০-১৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা + ৬০ উর্ধ জনসংখ্যা}}{\text{১৫ - ৫৯ বছর বয়সের জনসংখ্যা}} \times \text{১০০}$

তবে, গ্রামে শিশুরা চাষবাস, প্রাণীপালন, জ্বালানি সংগ্রহ ইত্যাদি নানান কাজে যুক্ত থাকে।

১.৪.৫ জন্ম (Fertility) ঃ

সন্তানের জন্ম দেওয়া একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মানবসমাজে বিশেষকরে গ্রামীণ এলাকায় ঘটনাটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নানান দিক থেকে প্রভাবিত হয়। নিম্নে ছকের সাহায্যে (বোঙ্গার্ট মডেল) বিষয়টি আলোচনা করা হল—

গৌণ বা পরোক্ষ কারণ-
আয়
শিক্ষা
পরিবারের ধরন
বাসস্থান
ধর্ম
জাতি
আইন
রাজনৈতিক পরিস্থিতি

→

মুখ্য বা প্রত্যক্ষ কারণ-
বিবাহ
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার
গর্ভপাত
সন্তানের জন্মের পর কিছুদিন
সন্তানধারণ ক্ষমতা হ্রাস

→

জন্মহার বা
সন্তান উৎপাদন

সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কারণগুলি হল - বিবাহ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, গর্ভপাত, সন্তানের জন্মর পর কিছুদিন সন্তানধারন ক্ষমতা হ্রাস। এই প্রত্যক্ষ কারণগুলি আবার সামাজিক, আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং ব্যক্তির শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতবর্ষের গ্রামে জন্মহার শহরের তুলনায় বরাবরই বেশি। সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলির প্রভাব গ্রামেই বেশি। মানুষ খুব একটা সচেতন নয়। শিক্ষার হার কম। ছেলে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়। সন্তানের জন্ম সাধারণত বিনা পরিকল্পনায় হয়। পুত্র সন্তানের আশায় অনেকের সন্তান সংখ্যা বেশি হয়। জন্মহার বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা হয় যেমন - সি. বি. আর. (CBR), জি. এফ. আর. (GFR), টি. এফ. আর. (TFR), এন. আর. আর. (NRR) ইত্যাদি।

নিম্নে সি. বি. আর. নির্ধারণের পদ্ধতি দেওয়া হল—

$$\text{সি. বি. আর. (CBR)} = \frac{\text{এক বছরে কোনো এলাকায় জন্ম সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মধ্যবর্তী সময়ে এলাকার জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

মূলত সরকারি প্রচেষ্টার ফলে উন্নতশীল দেশগুলিতে জন্মহার কমছে। শহরের শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ অবশ্য সচেতন হয়েই কম সন্তান জন্মদানের পক্ষপাতি। উন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের পর মানুষ সচেতন হয়ে জন্মহার কমিয়ে ফেলে।

১.৪.৬ মৃত্যু (Mortality) ঃ

জন্মহারের মতো মৃত্যুহারও জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। শিশু মৃত্যুর হার (IMR), মায়ের মৃত্যুর হার (MMR) ইত্যাদি কোনো এলাকায় স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও জীবনের মান কেমন তা বিচারে সাহায্য করে। উন্নয়নশীল দেশে বয়স ভিত্তিক মৃত্যু 'U' আকার ধারণ করে অর্থাৎ শিশু মৃত্যু এবং বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর হার বেশি। আবার উন্নত দেশগুলিতে এটি 'J' আকার ধারণ করে অর্থাৎ শিশু মৃত্যু খুবই কম। উন্নয়নশীল দেশে গ্রামের তুলনায় শহরে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বেশি থাকায় শহরে মৃত্যুর হার কম।

নিম্নলিখিতভাবে মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়—

$$\textbf{সি. ডি. আর. (CDR)} = \frac{\text{কোনো এলাকায় এক বছরে মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মধ্যবর্তী সময়ে এলাকার জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

খুব সহজেই এই হিসাবে করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপের সময় সি. ডি. আর. (CDR) ব্যবহৃত হয়।

শিশু মৃত্যু (IMR) ঃ

শিশু মৃত্যু (IMR) বলতে জন্মের প্রথম এক বছরের মধ্যে মৃত্যুকে বুঝায়। জন্মের প্রথম এক মাসের মধ্যে (Neonatal mortality) মৃত্যু সাধারণত কিছু শারীরিক ও বংশগত কারণে হয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কারণ। এক মাস থেকে এক বছরের মধ্যে মৃত্যু বাহ্যিক কারণ যেমন— পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, স্থাস্থ্য সচেতনতা, টিকাকরণ, শিশুর যত্ন ইত্যাদির ফলে হয়ে থাকে। দু-টি বাচ্চার মধ্যে জন্মের ব্যবধান, মায়ের বয়স, স্বাস্থ্য, সন্তান সংখ্যা ইত্যাদি ও শিশু মৃত্যুকে প্রভাবিত করে। গ্রামে শিশু মৃত্যুহার শহরের তুলনায় বরাবরই বেশি। উন্নত দেশগুলিতে শিশু মৃত্যু কম থাকার কারণ ভালো স্বাস্থ্য পরিসেবা, নিয়মিত টিকাকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। কেবল মাত্র শারীরিক বা বংশগত কারণে প্রতি হাজারে ৬-১০ জন মারা যায়। আমাদের দেশে এই হার ৭০। আমাদের দেশের কেরালাতে শিশু মৃত্যু কম।

নিম্নলিখিতভাবে শিশু মৃত্যুর হার নিরুপণ করা হয়—

$$\textbf{শিশু মৃত্যুর হার} = \frac{\text{এক বছরে কোনো এলাকায় শিশুর মৃত্যু (১ বছর বয়সের মধ্যে)}}{\text{ওই বছরে জন্ম হওয়া জীবিত শিশুর সংখ্যা}} \times ১০০০$$

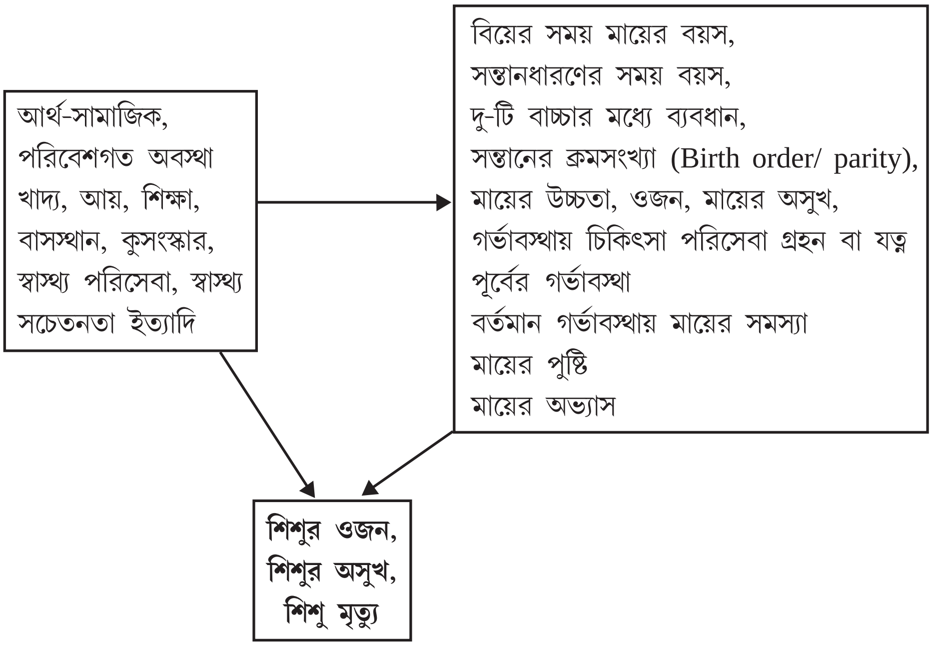

মাতৃ মৃত্যু (MMR) ঃ

মাতৃ মৃত্যু (MMR) বলতে মাতৃত্বজনিত কারণে অর্থাৎ গর্ভবতী অবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে মৃত্যুকে বুঝায়। মাতৃত্ব মেয়েদের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিদিন ভারতে প্রায় ১০০০-এর বেশি মা গর্ভজনিত বা প্রসবজনিত কারণে মারা যায়। গ্রামে মাতৃ মৃত্যুর হার শহরের তুলনায় বেশি। মাতৃ মৃত্যুর কারণগুলি হল—

মেয়েদের বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে বিয়ে, ২০ বছরের নীচে সন্তানধারণ, অপুষ্টি, গর্ভাবস্থায় পরিমাণ মত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করা, গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত বিশ্রাম না নেওয়া, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেক্ আপ না করা, প্রসব হাসপাতাল বা নার্সিংহোম বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা না করার ফলে, দু-টি সন্তানের মধ্যে ৩ বছরের কম ব্যবধান, উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, নানান সামাজিক কুসংস্কার, অধিক সন্তানের জন্ম, ৩৫ বছরের পরে সন্তানধারণ ইত্যাদি।

১.৪.৭ নারী-পুরুষের অনুপাত ঃ

সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার সমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার তুলনায় কম। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় এই অনুপাত নারীর অনুকূলে। ভারতবর্ষে ১৯০১ সাল থেকে নারী-পুরুষের অনুপাত ক্রমশ কমছে। গ্রামীণ এলাকায়ও একই চিত্র লক্ষ করা যায়। তবে, ২০০১ সালের লোক গণনায় কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা গেছে। ঐ সময় আমাদের দেশে অনুপাত ছিল ৯৩৩। যদিও গ্রামে (৯৪৬) এই অনুপাত কিছুটা ভালো, শহরে (৯০১) অনেকটাই কম। এই

অনুপাত কেরালায় সবচেয়ে ভালো (১০৫৮) আর দমন দিউতে সবচেয়ে খারাপ (৭০৯)। তা ছাড়া চণ্ডিগড়, হরিয়ানা, দিল্লি, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, দাদরা ও নগর হাভেলিতে খুবই কম। এই উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। তবু বলা যায় অপুষ্টি, শিশু কন্যার মৃত্যু, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যা, বাল্য বিবাহ, মাতৃ মৃত্যু, পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের প্রতি অবহেলা ও অত্যাচার ইত্যাদি কারণে নারী-পুরুষের অনুপাত ক্রমশই কমছে। প্রাথমিকভাবে, নারী-পুরুষের মধ্য সামাজিক বৈষম্য শুরু হয় পরিবারে। খাদ্যবণ্টন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সম্পত্তির অধিকার সবক্ষেত্রেই মহিলারা বঞ্চনার শিকার। তা ছাড়া পণপ্রথা, ডাইন প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ এবং নারীকে অবদমিত করে রাখার সমাজ মনস্তত্ত্ব ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

কেরালায় পরিস্থিতি যে-কোনো উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ নায়ার সম্প্রদায়ের মানুষ, যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-স্বার্থ রক্ষিত হয়। তা ছাড়া রাজ্যে সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য পরিসেবা খুবই ভালো। সমাজ ও রাজনীতিতে নারীদের প্রভাব ও অগ্রণী ভূমিকা - নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তাই শহরে এই অনুপাত গ্রামের তুলনায় কম। আদিবাসী সমাজে অনুপাতটি নারীর অনুকূলে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরপ্রদেশে চামার জাতীয় তপশিলিজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নারী-পুরুষের অনুপাত কমেছে। কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজ-মনস্তত্ত্বের কারণে ঐ সমাজে উচ্চবর্ণের কুপ্রথা, কুসংস্কার ও নারী বৈষম্যের দিকগুলি অনুপ্রবেশ করেছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও আদিবাসী সমাজে পুরুষের সাথে নারীরাও শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে। তাই সেখানে নারীদের অধিক মর্যাদা থাকে।

ভারতের উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হলে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে এবং মহিলাদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। গ্রামে মহিলারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে, পরিবারে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে এক অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.৪.৮ পরিযান (Migration) ঃ

পরিযান বা Migration বলতে অভিবাসন বা immigration এবং প্রবাসন বা Emigration উভয় ঘটনাকে বোঝায়। মানুষ যখন কোনো প্রশাসনিক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তখন ঘটনাটিকে পরিযান বলা হয়। অন্যদেশ থেকে এসে এদেশে বাস করলে ঘটনাটিকে অভিবাসন বা immigration এবং এদেশ থেকে গিয়ে অন্য দেশে বসবাস করলে ঘটনাটিকে প্রবাসন বা Emigration বলা হয়। উভয় ঘটনার পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণ থাকতে পারে। আদিমকালে মানুষ খাদ্যের সন্ধানে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করত। বর্তমানে শিক্ষা, চাকুরি, অধিক সুযোগ সুবিধার জন্য মানুষ এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করছে। এমনকি বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, চাকুরির জন্য উন্নত দেশে চলে যাচ্ছে। ঘটনাটিকে ব্রেন ড্রেন বলা হয়। সাধারণত ১৫-৩৫ বছর বয়সের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ (৭২ শতাংশ) গ্রামে বাস করে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে বসবাস করার প্রবণতা বাড়ছে। এর কারণগুলি হল—

১। কৃষিকাজে কম আয়, কম মজুরি, গ্রামে সারাবছর কাজ না পাওয়া,

২। জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্রতা,

৩। জমির অসম বণ্টন, জমি ভাগাভাগি

৪। গ্রামে উচ্চশিক্ষার অভাব,

৫। চিকিৎসা পরিসেবার অভাব,

৬। রাজনৈতিক ঝামেলা

১.৫. উপসংহার

গ্রামীণ জনসম্প্রদায়, পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো বোঝা যায়। বর্তমানে সমাজে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বাড়ছে, গোষ্ঠীর গুরুত্ব কমছে। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজকে বুঝতে হলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা অপরিহার্য।

স্বাধীনতার সময় গ্রামে অর্থনৈতিক নিশ্চলতা ও অনগ্রসরতা খুবই প্রকট ছিল। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিগত ৫৫ বছরে কিছুটা উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো পায় ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপধারণ করছে। কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন পরিসেবার মাধ্যমে গ্রামে শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যু কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হলেও এখনো লক্ষে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। মহিলাদের শিক্ষার হার খুবই কম। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ক্ষেত্রগুলির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১.৬. গ্রন্থপঞ্জি

১। Caste in Modern India and Other Essays — by M. N. Srinivas

২। Rural Sociology in India — by A. R. Desai (ed.)

৩। Rural Sociology — by P. C. Deb

৪। Indian Economy — by A. N. Agarwal

৫। Population of India (2001 census) results & methodology, — by Ashish Bose

৬। Census 2001 — Govt. of India

১.৭. প্রশ্নাবলি

১। সামাজিক কাঠামো বলতে কী বোঝেন? ভারতীয় গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

৩। গ্রামীণ জনসংখ্যার গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

একক—২ ❑ গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা, সুযোগ ও সমাজকর্মপাঠে এই বিষয়ের গুরুত্ব

গঠন

২.১. প্রেক্ষাপট
২.২. গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়নের ধারণা
২.৩. গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের সুযোগ
২.৪. গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব
২.৫. গ্রন্থপঞ্জি
২.৬. প্রশ্নাবলি

২.১. প্রেক্ষাপট

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ জোট বেঁধেছিল। শক্তি, সাহস ও বিপদাপদ মোকাবিলা করার ক্ষমতা যার যত বেশি থাকত তাকে কেন্দ্র করেই এক-এক-জায়গায় একদল মানুষের বসবাস ঘটত। এই রকম বসতিগুলি তৎকালীন 'আদিম জনসম্প্রদায়' হিসেবে পরিগণিত হত। পরবর্তীকালে মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদনের কৌশল অবলম্বন করল তখন এই ধরনের জনসম্প্রদায় বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল। এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা জনবসতিকেই গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। E. S. Bogardus তাঁর Development of Social Thought বইটিতে গ্রাম প্রসঙ্গে বলেছেন Human Society has been cradled in the rural group. অর্থাৎ মানবসমাজ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য থাকলেও সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতি ও আকৃতিগত দিক দিয়ে এর আমুল পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেবের ভাষায়, গ্রামীণ সমাজের আকার নগরায়ণের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে (the rural social forms have changed under the impport of urbanisation)।

গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের আগে গ্রামের উদ্ভব ও তার বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সঞ্চার করা যেতে পারে। গ্রাম বলতে তেমন কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও কৃষিকাজ এবং চাষাবাদের ওপর নির্ভরশীল অল্পসংখ্যক মানুষের একসাথে স্থায়ীভাবে বসতিই হল গ্রাম। অর্থাৎ মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক এবং একে অপরের প্রতি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে গভীর সমষ্টিগতবোধের প্রকাশ ঘটত এই জনবসতির মধ্যে। পরবর্তীকালে জমিদারি প্রথা এই জনবসতির ভূ-সম্পত্তির মালিকানা খর্ব করার ফলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে সমষ্টিগত বোধের শৈথিল্য লক্ষ করা যায়।

এই জনবসতিতে বা গ্রামাঞ্চলে মানুষজনের ধীরে ধীরে নিজেদের একটি অঞ্চলের সম্প্রদায় হিসাবে ভাবনাতেও পরিবর্তন ঘটল। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তার বহুল ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। মূল যে বিষয়গুলির প্রভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করা হয় তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও এক একটি জনবসতির আয়তন আগের চাইতে অনেক বড়ো আকারে রূপান্তর। এর

ফলে কৃষিনির্ভর মানুষ একজায়গা থেকে অন্য জায়গা যাওয়ার সুযোগ পেল। বিভিন্ন জায়গার জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালী তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করল। পরবর্তনের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর হলেও তার প্রভাবে গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। তাদের পারিবারিক জীবনযাত্রায়, জাতিগত ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক কাজকর্মে, আত্মীয়তার সম্পর্কে, সামাজিক নিয়ম-নীতির পালনে ও রাজনৈতিক চর্চায় ঘটল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের মতো নানা-ভাষাভাষী মানুষ, নানা বর্ণের মানুষ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নাই। এই দেশের আয়তন যেমন সুবিশাল, আবার জনসংখ্যাও বিপুল। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ গ্রামে বসবাস করে। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনধারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তার তিনটি পর্যায় বা স্তর উল্লেখযোগ্য, যেমন—

(ক) আদিম জনবসতি, (খ) মধ্যযুগীয় জনবসতি স্তর ও (গ) আধুনিক জনবসতি স্তর। এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

(ক) আদিম জনবসতি স্তর (Primistive village level) ঃ প্রাচীনকালে শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে কোনো একজন বা বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কিছু মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কম জনের বসতি হওয়ার জন্য পরস্পরের মুখোমুখি দেখা, পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চেনা-জানার সুযোগা বেশি ছিল। এই সময় জমিজমার ওপর সাধারণের মালিকানাই থাকত। সকলে মিলে যৌথ চাষের প্রচলন এই সময় দেখা যেত। অর্থাৎ এই স্তরে মানুষে মানুষে ভাব ভালোবাসার এবং একাত্মতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। খাদ্য বা আহরণের পরিবর্তে উৎপাদনের উদ্যোগ বৃদ্ধি পায়।

(খ) মধ্যযুগীয় জনবসতি স্তর (Medieval village level) ঃ এই স্তরে গ্রাম্যজীবনে যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হল জমিদার ও ভূমিদাস-প্রথার প্রভাব। জমির ওপর সাধারণের মালিকানা আর এই সময়ে থাকল না। শ্রমের বিনিময়ে জমিদারদের জমিতে চাষ ও জীবনধারণের মধ্যে একই রকম কাজে যুক্ত লোকেদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা, ভালো মন্দের দেখভাল, পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন বেশ মজবুত ছিল। অর্থাৎ জমির মালিকানা না থাকলেও জমিতে কাজ করাকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে সু-সম্পর্ক ও সংহতি রক্ষায় পরস্পরে সচেষ্ট হত। এমনকি একই ধরনের পেশায় যুক্ত সমষ্টিবাসীদের মধ্যে সমষ্টি বোধের বিষয়টি ছিল উল্লেখযোগ্য। ভূমিদাসত্ব সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে নিজেদের সুখদুঃখে সংগঠিত হত এবং সংঘবদ্ধভাবে ভূস্বামীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হতে দেখা গেছে।

(গ) আধুনিক জনবসতি স্তর (Modern village level) ঃ শিল্পক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন ও নগরায়ণের ফলে আধুনিক জনবসতির স্তরে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। শিল্প, কলকারখানায় কাজের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্রাম্য জনবসতির মধ্যে শহরের নানান কাজে যোগদানের সুযোগ বাড়ে। ফলে গ্রামীণ জনবসতির মধ্যে শহুরে আচার-ব্যবহারের প্রভাব পড়তে শুরু করে। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে এখনও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলেই অধিকাংশ লোকের বসবাস, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবে ভালোবাসা, আত্মীয়তা ও সংহতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও গ্রামীণ জনবসতির মধ্যে এসবের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। তা ছাড়া জমিদারি প্রথার অবলুপ্তির ফলে কৃষি ও জমি-নির্ভর জীবিকায় মানুষের যুক্ত থাকার প্রবণতা বহুলাংশেই আগের মতো রয়েছে।

ভারতবর্ষে গ্রাম ও তার ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা আজকের দিনে গ্রাম যেভাবে দেখি তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা স্বচ্ছ ধারণা পাবো। গ্রাম-উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য গ্রাম ও তার ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানকালে গ্রাম ও তার জনজীবনে যে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তার কয়েকটি দিক নিয়ে আলেকপাত করা যায়। যেমন—

প্রথমত ঃ চাষযোগ্য/আবাদি জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার কারণে এবং গ্রাম্য জনবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার

ফলে গ্রামবাসীদের একটি বিরাট অংশ আর্থিক স্বচ্ছলতায় পৌঁছোতে পারছে না। তা ছাড়া শিক্ষিত/অল্প-শিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী একটি বিরাট অংশ বর্তমানে কৃষি কাজকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত নয়। অর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তারা শহরকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় আগ্রহী।

দ্বিতীয়ত ঃ গ্রামীণ জনজীবনে জাতপাতের ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের প্রভাব সামাজিক সচলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গ্রাম-ছেড়ে শহরে কাজের টানে আসা মানুষের একটি বড়ো অংশ আর গ্রামে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী নয়।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষালাভ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে এখনও তেমন বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষালাভের পরিকাঠামো ও সুযোগের যথেষ্ট অভাব থাকায়, অপরদিকে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ শহরকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের একটি অংশ শহরে বসতি স্থাপন করছেন। এমনকি শিক্ষান্তে শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকার ফলে শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগসুবিধা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা থাকে না। ফলে গ্রাম তার সম্ভাবনাময় সম্পদশালী জনগোষ্ঠীকে কাছে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নানান রকমের বাধা বিপত্তির মধ্যে গ্রাম্যজীবনের একটি বিরাট অংশ এখনও গ্রামীণ সম্পদ সমৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য নিযুক্ত। যেহেতু এখনও ভারতবর্ষের বিশাল জনগোষ্ঠী গ্রামেই বসবাস করেন, সেই কারণে গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া সেই লক্ষ্যে এগোনোর ক্ষেত্রে স্বার্থকভাবে সহায়তা করে চলেছে।

২.২. গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা

গ্রাম, তার জনগোষ্ঠী এবং সমষ্টির উন্নয়ন প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যেই জড়িয়ে আছে প্রকৃত অর্থে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়। গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একসাথে বসবাসকারী কিছু মানুষ যারা মাটির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত ও চাষাবাদ/খেতক্ষামারে কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তাদের সমষ্টিগতভাবে বসবাসের ক্ষেত্রই হল গ্রাম। একাধিক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আবার গ্রামীণ সমষ্টির সূত্রপাত। 'সমষ্টি' প্রসঙ্গে Mac Iver বলেছেন, an area of social living marked by some degree of social coherence. অর্থাৎ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সু-সম্পর্কের নির্দিষ্ট মাত্রার দ্বারা চিহ্নিত একটি এলাকার সামাজিক জীবনই সমষ্টি হিসাবে পরিচিত। Ogburn ও Nimkoff বলেছেন, Community is the total organisation of social life within the limited area. অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক জীবনসমূহের সামগ্রিক সংগঠনই সমষ্টি। গ্রামীণ সমষ্টি প্রসঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সমীক্ষক দল হিসেবে বলবন্তরাই মেহেতা কমিটির ধারণায়...... in this country, intended to apply it to the concept of the village community as a whole. cutting accross the caste, religions and economic differences.

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমষ্টি বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাসকারী মানুষজন তাদের নিজেদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অর্থনৈতিক সীমারেখা ব্যতিরেকে একে অপরের সাথে মিলেমিশে চলার ও একাত্মতা (we-feeling) বোধের যে নির্দিষ্ট মাত্রায় অবস্থান করেন— তার সামগ্রিক রূপ। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরতে গেলে ধরা যাক কোন একটি জেলায় ২৫টি সমষ্টি উন্নয়ন খণ্ড (Block) আছে। আবার এক-একটি সমষ্টি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত ১০ থেকে ১৫টি করে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। সব শেষে আছে গ্রাম। গ্রামীণ সমষ্টি সাধারণ অর্থে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর সমষ্টি হতে পারে।

আবার কখনো কখনো ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভিত্তিক দুই বা তার বেশি সমষ্টি হিসেবেও মূল জনগোষ্ঠীকে দেখা যেতে পারে। কোনো উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কখনো কখনো একটি ব্লক বা সমষ্টি উন্নয়ন খণ্ডের সম্পূর্ণ এলাকাকেই গ্রামীণ সমষ্টি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি এলাকায় কতটা অংশের জনগোষ্ঠীকে সমষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত বলবন্তরাই মেহেতো কমিটির গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেছেন— We have so far used such terms as rural development, constructive work, adult education and rural upliff to denote certain of its aspects. অর্থাৎ গ্রামীণ উন্নয়ন, গঠনমূলক কাজ, বয়স্ক শিক্ষা এবং গ্রামের অন্যান্য সমস্ত দিকের উন্নয়ন প্রভৃতি গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন-এর ব্যাখ্যা থেকে যা পাওয়া যায়, তাতে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বলা যেতেই পারে। তার সপক্ষে বেশ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে যেমন কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ জনসমষ্টির অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির অবস্থা পরিবর্তনের পথ সুগম হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা রচনা ও তার বাস্তবায়নের মান উন্নত করা দরকার হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থায় স্বচ্ছলতা আনার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে তার গতিপ্রকৃতি ও পদ্ধতি-প্রকরণের তফাত থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামীণ সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে নিত্য নতুন মাত্রায় চলতে থাকবে।

বর্তমানে শহরবাসীদের জীবনধারাকে অনুসরণ করার প্রবণতা গ্রামবাসীদের একটি বিরাট অংশকে প্রভাবিত করেছে। এমনকি দৈনন্দিন রোজগারের সুযোগ বেশি থাকার ফলে গ্রামের অধিবাসীদের একটি অংশ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করছেন। এতে গ্রামের মানুষদের নিয়ে উন্নয়ন ভাবনার অবসান ঘটেছে একথা বলা যায় না। গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়া তার নিজস্ব ধারায় প্রবহবান, যদিও গ্রামীণ জীবনধারা ও কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রামীণ সমষ্টির বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নানান রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গ্রামীণ মহিলাদের সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ সমষ্টির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার মান উন্নয়নে নতুন কোনো কিছু ভাবনার দরকার যে হবে না তা নয়। একটি প্রকল্প থেকে অন্য একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনায় যেমন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন বা বিয়োজনের দরকার হয় ঠিক তেমনি শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তার প্রয়োজন সর্বদাই বিবেচনায় থাকবে যদিও পদ্ধতি ও উপাদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কোনো একদিনের পরীক্ষানিরীক্ষার ঘটনা নয়। এটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া এবং সমাজকর্মের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ১৯৪৮ সালের কেম্‌ব্রিজ সম্মেলনে ‘সমষ্টি উন্নয়ন’ প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। The conference defined Community Development as a movement designed to promote better living for the whole community, with the active participation and if possible on the initative of community, but if this initiative is not forthcoming sponteniously, then by the use of technique for arousing and stimulating it in order to secure its active and enthusiastic response to the movement.” যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা হল—

প্রথমতঃ নিজস্ব উদ্যোগে নিজের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ।

দ্বিতীয়তঃ কৌশলগত ও অন্যান্য সেবাদানমূলক বিষয়গুলির বিশেষ করে যেগুলি উদ্যোগ গ্রহণে, স্ব-সহায়তায় ও পারস্পরিক সাহায্যদানের অনুপ্রেরণা জোগাবে সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা।

গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আছে। ১৯৫২ সালে প্রথম যখন সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য সাধন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটানো হলেই সমষ্টি উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। এমনকি এই কাজে সার্থক রূপদানের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে গ্রামীণ সংস্থা/সংগঠনগুলি দায়িত্ব না নিলে গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি ও সমগ্র গ্রামীণ সমষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। এখানে গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি ও সমষ্টির জীবনমাত্রার মান— বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। পরবর্তীকালে ভারত সরকার গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। ধাপে ধাপে সেগুলির মূল্যায়ন ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সরকারের উদ্যোগে নানান রকমের কর্মসূচি ও প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের সরকারি উদ্যোগ/প্রকল্পগুলি খাতিয়ে দেখলে সমষ্টি উন্নয়নের যে বিভিন্ন দিক জড়িয়ে আছে তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। এগুলি হল—

- ➠ গ্রামীণ আবাস/গৃহনির্মাণ,
- ➠ রাস্তাঘাট/পরিকাঠামো উন্নয়ন,
- ➠ স্বনিযুক্তি ও দারিদ্র দূরীকরণ,
- ➠ মহিলা ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির ক্ষমতায়ন,
- ➠ গ্রামীণ প্রযুক্তির ব্যবহার ও জনসমষ্টির অংশগ্রহণ,
- ➠ প্রশিক্ষণ/দক্ষতাবৃদ্ধি ও উদ্যোগ স্থাপনের কৌশল দান,
- ➠ তথ্য আদানপ্রদান, শিক্ষা ও যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প বা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ সম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানোর সামগ্রিক উদ্যোগই গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বলে বিবেচিত। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

২.৩. গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের সুযোগ/আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি

সমষ্টি উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বলা হয়— সমষ্টির জনগণের উদ্যোগে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো, সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রভৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি ও তার সুযোগ নিয়ে বহু জনের বহু মত থাকতে পারে। কোনো একটি মতই যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে এমনটা নাও হতে পারে। বস্তুত গ্রামের একটি সামগ্রিক রূপ এই আলোচনায় ধরা পড়ে। বিশ্ববন্দিত গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টট্‌লের কথায়, বিরোধ বির্তকের উর্ধ্বে মানুষ হল সামাজিক জীব। প্রয়োজনের তাগিদে বা প্রবণতার তাড়নায় বানুষ সংঘবন্ধভাবে বাস করে, সমাজবিহীন স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। সমাজ বন্ধনের মূল ভিত্তিই হল দলবন্ধতা বা যুথবন্ধতা, সমষ্টির সৃষ্টি হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ, সহাবস্থানও সহযোগিতার মাধ্যমে। এইখানেই মানুষের ব্যক্তি গত চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিবোধের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

ভারতীয় সমাজ সংস্কারক তথা গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের রূপকারগণ ভারতবর্ষের গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন, সামাজিক পরিবর্তন জাতিভেদপ্রথা, পরিবার, বিবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাদের বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে আধুনিক কালের সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিনোভা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ।

গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের সুযোগ/পরিধির বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে যে ধরনের উন্নয়ন-প্রক্রিয়া চলছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

যেমন—

➠ ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি গ্রামীণ পুনর্গঠনের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

➠ সরকারি উদ্যোগে গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

➠ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যায়।

➠ বুনিয়াদি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল গড়ে তুলে গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

➠ গ্রামবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা সমাধান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রভূত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

➠ আধুনিক জীবনধারায় বহু দ্রব্য-সামগ্রী গ্রামীণ পরিবারগুলিতে সহজলভ্য হয়েছে।

➠ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চিন্তাচেতনায়, আচার-ব্যবহারে এখন আধুনিকতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

➠ আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রেও গ্রামবাসীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার দিনের তীব্র দারিদ্র্য বর্তমানে বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে।

➠ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে গ্রামীণ জনসম্প্রদায়গুলির আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটেছে।

➠ এমনকি, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারায় জাতিভেদ ও ধর্মভেদ প্রথার নিয়ন্ত্রণ আর আগের মত নেই।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের আকার-আয়তন ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনটি ঘটেছে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করার ও গবেষণা করার ক্ষেত্রেও। দিন বদলের সাথে সাথে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তারও পরিবর্তন ঘটেছে। ধাপে ধাপে এই যিয়ে চর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। একদিকে যেমন চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখকদের কাছে এই বিষয়ের গুরুত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এই বিষয়ে পঠন-পাঠনের আগ্রহ বাড়ছে। ভারতবর্ষে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। এই বিষয়ে আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি বা সুযোগ যে বিভিন্ন দিকগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে তার কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) **সমীক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ঃ** ভারতবর্ষ জনবহুল দেশ। এদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। দেশের সমৃদ্ধি ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বেশির ভাগটাই কৃষিনির্ভর অর্থাৎ গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন একটি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সরকারি উদ্যোগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং গবেষণা করার সুযোগও দিন দিন বাড়ছে। গ্রামের মানুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমীক্ষার কাজে গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আছে এমন লোকজনকে যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সমীক্ষা, গবেষণা,

তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি যে-কোনো কাজে সমষ্টি উন্নয়ন ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এই গ্রাম সমীক্ষা বা গবেষণা। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান/বিভাগ এই ক্ষেত্রে নিত্যনতুন তথ্য অনুসন্ধানের কাজে যুক্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে।

(খ) গ্রামীণ সংঘ বা সংগঠন স্থাপন ঃ গ্রাম্য জীবনের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। কেউ নিজের সাধ্য অনুযায়ী শ্রম ও উদ্যোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ হয়তো অন্যের সঙ্গে লক্ষ্য পূরণের প্রতিযোগিতায় বা বিরোধিতায় যুক্ত হন। আবার কেউ কেউ একই রকম আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণের সঙ্গী খুঁজে নেন। সমবেতভাবে পারস্পরিক লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হন। Mac Iver ও C. H. Page তাঁদের Society : An Introductory Analysis গ্রন্থে বলেছেন "A group may organise itself expressly for the purpose of pursuing certain of its interest together. When this happens an association is born." এই ধরনের সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের চিহ্নিত করা ও তাদের যৌথ ভাবে, সংঘবন্ধ ভাব নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্‌বুধ করার কাজে সমষ্টি উন্নয়ন ক্ষেত্রের সুযোগ বৃধি ঘটেছে। আজকাল বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মহিলা ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির মানুষদের সংঘবন্ধ করানো ও তাদের সামগ্রিক বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার নীরিখে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে সীমানা বিস্তৃত হয়েছে।

(গ) দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ঃ সচরাচর আমরা গ্রামাঞ্চলে কিছু সমস্যা দেখতে পাই যেগুলো খুব সহজেই সমাধান করা যায়। এমনকি সাময়িক কোনো সংকট বা দুর্যোগ প্রতিকার করাটাও গ্রামবাসীদের বেশির ভাগের খুব বেশি সময় লাগে না। যেমন ধানের ক্ষেতে পোকার উপদ্রব হলে, সংশ্লিষ্ট কৃষক কোনো কৃষিবিশারদদের কিংবা স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শে তা প্রতিকার করে ফেলতে পারেন। কোনো অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে সেই ক্ষয়ক্ষতিরও মোকাবিলা করতে পারেন। কিন্তু বারবার বন্যার কবলে পড়া বা বারবার শস্যক্ষেত্রে পোকার আক্রমণ ঘটলে বেশির ভাগ গ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ ভেঙে দেয়। যার প্রভাব পড়ে তার জীবন-জীবিকার মানেও। এই রকম পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে ধারণা আছে বা নির্দিষ্ট সংকট মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আছে এমন কর্মীদের একটি নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনায় দীর্ঘস্থায়ী ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে। যার ফলে সমষ্টি উন্নয়নের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে স্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার সুযোগ বাড়ছে।

(ঘ) সমষ্টি উন্নয়নের পঠনপাঠনে ঃ ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলের জীবন-জীবিকা নিয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ ক্রমশ বৃধি পাচ্ছে। শিশু শিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে পঠনপাঠনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবিকা, আচার-আচরণ, প্রথা-রীতি প্রভৃতি নিয়ে নানান ধরনের গল্প, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এমনকি গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানে শিক্ষালাভের সুযোগ এনেছে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংগঠন নিয়মিতভাবে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের নানান দিক নিয়ে পত্রিকা ও বহু জ্ঞানীগুণীজনের সম্পাদনায় এই বিষয়ে নানান রকমের বই ও গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই বিষয়ে একাধারে যেমন বিদ্যাচর্চার প্রচলিত ব্যবস্থা আছে, অন্যদিকে তেমনি এই বিষয়ে নিয়মিত চর্চা, মতামত বিনিময়, প্রতিবেদন প্রকাশ ও গ্রন্থ সম্পাদনার সুযোগও বেড়ে চলেছে। আজকাল বিভিন্ন বেতার ও দূরদর্শন প্রযোজক পরিচালকবৃন্দকেও গ্রাম্য জীবনচর্চার ও গ্রামীণ অর্থনীতির নানান দিক নিয়ে অনুষ্ঠান প্রয়োজনা ও পরিচলনা করতে দেখা যাচ্ছে। সত্যজিৎ রায়ের অপু-দুর্গার হাত ধরে আজকের চলচ্চিত্র জগতের বহু পুরস্কার এসেছে গ্রাম্যজীবনের ওপর আলোকপাতকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এই বিষয়ে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে একটি নবতম অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে বললে খুব একটা অত্যুক্তি করা হবে না।

গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে পরিধি দিন দিন যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হল গ্রামীণ সমষ্টি জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ও সমষ্টিগত ভাবনা (Community Sentiment) র ক্রমশ অবক্ষয়। এমনকি গ্রামাঞ্চলের যুবসমাজে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও তাদের শহরাঞ্চলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনচর্চায় আগ্রহ বাড়ার ফলে গ্রামীণ সমষ্টি ক্রমশ ছন্দ হারাচ্ছে, যার ফলে সমষ্টির প্রয়োজন এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করা এবং স্থানীয় সম্পদের ওপর ভিত্তি করে সমষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সম্পদ বৃদ্ধির কাজে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে।

(ঙ) কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি ঃ গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের সুযোগ ঘটেছে। একই রকম কাজে যুক্ত আরও অন্যান্য ব্যক্তি, কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে। ফলস্বরূপ কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে বহু স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি কল্যাণমূলক সংগঠনও গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে এইরকম বেসরকারি, কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী গ্রামোন্নয়নমূলক সংগঠনের সংখ্যা প্রায় লক্ষ্যাধিক। কিছু ব্যক্তি বা মানুষের সৎ ভাবনাও পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ করার মতো। সংগঠনের স্থায়ত্ব ও পরিধি যত বেড়েছে, তার সাথে তালমিলিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তত বেড়েছে। এমনকি আজকাল কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শদাতার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সব নিযুক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায়, সমীক্ষা ও প্রতিবেদন রচনায় এবং প্রকল্পের খসড়া রচনায় স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত। এদের মধ্যে একটি বড়ো অংশের গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা দুইই রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পঠনপাঠনে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করে সরকারি ও বেসরকারি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মংস্থস্থানের এবং স্বনিযুক্তির সুযোগ পাচ্ছে।

গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা দিন বদলের সাথে সাথে বিস্তৃত হচ্ছে। সমষ্টি উন্নয়নের সামগ্রিক ভাবনা মাথায় রেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষার প্রয়োজন যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনের প্রথও প্রশস্ত হয়েছে। গ্রামীণ সমষ্টিবন্ধ মানুষের জীবনধারার নানান দিককে নিয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান রচিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়টির গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে কারণ একে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান হিসেবেও কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন মানুষের জীবন জীবিকা ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে কখনোই সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, সমষ্টিবোধ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটা বিস্তৃত হবে এবং এই বিষয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা কতটা প্রশস্ত হবে। আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় গ্রামীণ সমষ্টির সদস্যদের একটি অংশ শহরকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় আগ্রহী হলেও অপর একটি অংশ প্রচলিত জমি চাষ ও পশুপাখি পালনের মাধ্যমে প্রচলিত ছন্দে জীবনযাপনে ব্যস্ত। এই দ্বিধাবিভক্ত মানুষের সমষ্টিবোধ মজবুত করতে এবং তাদের সমাগ্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ও তার নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে। এই বিষয়ে চর্চার সুযোগ যেমন বেড়েছে তেমনি এই বিষয়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৪. গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব

সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে

পঠনপাঠনের ফলে সমষ্টির বিশেষ করে গ্রামীণ সমষ্টির কী উপকার হবে, এই বিষয়ে পড়াশোনা করলে কী ধরনের সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এই অংশের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক ধরনের সমালোচক মনে করে ডিগ্রি লাভ করলেই গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়ন ঘটানো যাবে, এমনটা নয়। অন্য এক শ্রেণির সমালোচকদের মতে গ্রামোন্নয়নের কাজে সমষ্টিকে নিয়ে তাঁদের উদ্যোগে ও সহায়তায় কীভাবে এগোলে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে তার জন্য ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা শিক্ষালাভের প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জন তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকেন। আধুনিক সমাজ-সভ্যতার প্রভাবে মানুষের জীবনধারা বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমষ্টির জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ ও সাফল্যের স্বার্থে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পঠনপাঠনের গুরুত্ব অপরিহার্য। কেবলমাত্র গ্রাম্য প্রথা, রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার-আচরণের ভিত্তিতে সমষ্টির একটি বিরাট অংশ উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা রচনা ও তার বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এমনটা বর্তমানকালে সম্ভব নয়। সমষ্টির মানুষের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ তাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের গ্রামবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের আলোকে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যেতে পারে।

(ক) ভাবের আদানপ্রদান ঃ সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মানুষে-মানুষে এইভাবে আদানপ্রদান হতে পারে, সংঘ এবং সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে হতে পারে আবার সমষ্টি উন্নয়ন কর্মী বা নেতৃত্বের সাথে সমষ্টির মানুষের ভাবের আদানপ্রদান হওয়া দরকার। সমষ্টি উন্নয়নের কাজ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে গ্রামবাসীদের মধ্যে এই ধরনের ভাবের আদানপ্রদান সুযোগ তৈরিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি সমষ্টির মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণ মজবুত করার পথ প্রশস্ত হয়। দেখা গছে, দক্ষতার সাথে সমষ্টির উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলে, তাদের মূল্যবোধ বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিলে সমষ্টির স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়। যা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ বা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঃ গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন সম্পর্কে পঠনপাঠনের ফলে সমষ্টি সামাজিক ও আর্থনৈতিক অবস্থার কীভাবে পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া যায়। যার অভাবে একটি সমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ ও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য আসে না। এখানে আর্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়, তা হল সমষ্টির সদস্যদের অবস্থা, যেমন

- বেশির ভাগ মানুষ কী করেন, বাড়িতে কতজন আছেন,
- কীভাবে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়।
- বাসস্থানের অবস্থা ও গঠন।
- শিক্ষার মান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার ধরন।

প্রভৃতি নানান বিষয় সম্পর্ক তথ্যানুসন্ধান।

গ্রামীণ সমষ্টির কাজে যুক্ত হওয়ার আগে ঐ সমষ্টির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে বলে এই বিষয়ে লিখিত ও অভিজ্ঞ উন্নয়নকর্মীর গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

(গ) সামাজিক সমস্যার সমাধান ঃ কোনো একটি সমষ্টির সমস্যা বা সংকট বিনা কারণে সৃষ্টি হয় না, তার পিছনে যে সব কারণ থাকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য এই সব সমস্যার স্বরূপ, প্রকৃতি ও তার গভীরতা সম্পর্কে

অবগত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা শিক্ষালাভের মাধ্যমে এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান করা যায়। এমনকি বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন রকমের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে এক একটি সমষ্টি সাথে অন্য সমষ্টির সামাজিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে এই বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গ্রাম্য-জীবনে সমষ্টিভেদে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বসবাস। কেউ শারীরিকভাবে সবল, কেউ আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল, আবার কেউ সব দিক থেকে অসহায়, দুর্বল ও হীনমন্যতার শিকার। সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পঠনপাঠনের ফলে দুর্বল অসহায় শ্রেণির মানুষকে কীভাবে সংঘবদ্ধ করানো যায়, কীভাবে তাদের মধ্যে সমষ্টিবোধ জাগিয়ে তোলা যায় এবং কীভাবে তাদের আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা ও সহায়তার মাধ্যমে অবস্থার মান উন্নয়ন ঘটানো যায় তা জানা সহজ হয়।

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংঘ গঠন ঃ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা সংঘ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংঘ গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায় সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে। এমনকি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংঘ কীভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের কর্মপন্থা কী হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পঠনপাঠন করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনকার দিনে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির মানুষ কীভাবে নিজেদের সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে যাবে সে সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞানলাভের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন গুরুত্বপূর্ণ।

(ঙ) গ্রামীণ সম্পদ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি ঃ একটি গ্রামে একসাথে যেমন অনেক সমস্যা চিহ্নিত হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সেগুলির সমাধানে স্থানীয় সম্পদের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা, সভা করা ও পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে চিহ্নিত সম্পদ ও সম্ভাবনার ক্রমানুসারে কীভাবে বিন্যস্ত করলে একটা সমস্যার সমাধানে উক্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব ত্বরান্বিত হবে সে বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সম্পদ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধির কত রকমের কৌশল আছে এবং কতটা নিঁখুত ভাবে সেই সম্পদ মানুষের উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষালাভের দরকার হয়। গ্রামীণ সম্পদের ধরন ও তার প্রকারভেদ স্পর্কে আরও জানার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে জানার জন্যও সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

(চ) সহভাগী পরিকল্পনা ঃ গ্রামের প্রয়োজন বা সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে সম্পদ সংগ্রহ, কর্মসূচি গ্রহণ, উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ, অর্থের সংস্থান ও বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতির কাজে গ্রামবাসীদের কীভাবে যুক্ত করা যায়, কীভাবে তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলে তাদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত হবে সে সব বিষয়ে ধারণা সঞ্চার করার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে সহভাগী পরিকল্পনায় উন্নয়নকর্মীদের বেশির ভাগই সমষ্টির মধ্যে সহমতের ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগ করে সকলের দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন। যা এই বিষয়ে বিদ্যালাভ না হলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারতো।

(ছ) তহবিল গঠন ঃ সমষ্টি উন্নয়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজকর্মগুলির মধ্যে কোনো কোনো কর্মসূচি দীর্ঘ সময়ের হয়। আবার কোনো কোনো কর্মসূচি স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে কোথাও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, পুকুর খনন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি নানান কর্মসূচি রূপায়িত হয়। এই ধরনের বেশির ভাগ কর্মসূচি সরকারি বা বেসরকারি আর্থিক অনুদান বা সহযোগিতা নির্ভর। এই ধরনের অনুদান বা আর্থিক সহযোগিতার মেয়াদ ফুরোনোর আগে সমষ্টির অধিবাসীদের নিজেদের স্বার্থে

নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কীভাবে তহবিল গঠন করবেন, তার বিভিন্ন পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হয়। এমনকি এই তহবিল গঠনের নিয়ম নীতি কী হবে, তার ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করতে হয়। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন বিষয় পাঠের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

পরিশেষে বলা দরকার গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন পাঠের গুরুত্ব এক এক শ্রেণির মানুষে কাছে এক এক রকমের হতে পারে। উন্নয়ন কর্মীদের কাছে এক রকমের সমষ্টি উন্নয়নের শিক্ষাবিদদের কাছে এক রকমের গুরুত্ব। আবার স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন পরামর্শদাতা বা গবেষকদের কাছে এই বিষয়ের গুরুত্ব অন্যরকমের হতে পারে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বিষয়ের গুরুত্ব আরও আলাদা রকমের কিছু হতে পারে। গ্রামীণ দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের সংঘবদ্ধতা ও তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির (goal setting) করানোর জন্যও বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাদীক্ষা থাকলেও ব্যাবহারিক জগতে তার সঠিক মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ের গুরুত্ব সব সবয়ই যে বৃদ্ধি পাবে এমনটা নাও হতে পারে। তাই এই বিষয়টি অধ্যয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামীণ সমষ্টির জীবন জীবিকা অনুধাবনের মাধ্যমে এই বিষয়কে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ তত্ত্ব অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বের যথার্থ প্রয়োগের ব্যাপারটিও এই বিষয়পাঠের একটি অন্যতম দিক।

২.৫. গ্রন্থপঞ্জি

১। ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র, — বিষয় সমাজতত্ত্ব, ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলকাতা।

২। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও ডি. আর. সচদেব — 'An Introduction to Sociology' Kitbmahal Allahabad.

৩। Mac Iver, R. M. and Page C. H. — 'Society : An Introductory Analysis' Mac Millan & Co. London.

৪। Mac Iver R. M. — 'Community, A sociological Study Mac Millan, London.

৫। Bogardas, Emory S. — 'The Development of Social Thought' New York, Hoot, Rinchart and Wineton.

৬। Desai, A. R. — 'Rural Sociology in India' Popular Prakasan, Bombay.

৭। Report of the team for the study of community Development Projects and National Extension Services, Vol - I.

৮। Gangrade K. D. — Integrated Approach to Rural Development with, Social Justice. NSS - UNIT, Delhi School of Social Work.

৯। V. M. Kulkarni — Voluntary Action in a Developing Society. Indian Institute of Public Administration, New Delhi.

২.৬. প্রশ্নাবলি

১। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটটি ব্যাখ্যা করুন।

২। গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কী ? তার পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩। সমাজকর্ম বিষয়ের ছাত্রের কাছে সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা কী ?

একক—৩ ❑ অতীতের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ বিশেষকরে শ্রীনিকেতন, গুরগাঁও, ভূ-দান, গ্রামদান ও নীলোখেরীম আলোকে পল্লি পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

গঠন

৩.১. প্রেকাপট
৩.২. শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প
৩.৩. গুরগাঁও প্রকল্প
৩.৪. ভূ-দান ও গ্রামদান আন্দোলন
৩.৫. নিলোখেরী পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প
৩.৬. গ্রন্থপঞ্জি
৩.৭. প্রশ্নাবলি

৩.১. প্রেক্ষাপট

আদিমকালে বলদে টানা হালের চাষ এবং ঘরোয়াভাবে বানানো যন্ত্রপাতির ওপর ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের ধারণা এসেছিল মূলত গ্রামের মানুষজন তাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্যে মিটিয়ে ফেলতে পারতেন এমন একটি জীবনচর্চা থেকেই। গ্রামের মানুষজন সম্মিলিত ভাবে পরিশ্রম করে আবাদ করতেন এবং ধীরে ধীরে নিজ নিজ কৃষিজমির দখল নিজেরা নিতে সচেষ্ট হলেন। দেখা যেত আলাদা আলাদা চাষবাস করলেও কৃষিজমির ফসলকে রোগ-পোকালাগা, কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় ও পশুপ্রাণীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পরস্পর সংঘবন্ধ হতেন। গ্রামে কৃষক ছাড়া ছুতোর কুমোর, মুচি, ধোপা, তেলি, নাপিত ও অন্যান্য কারিগরেরা বসবাস করতেন। সকলের আর্থিক অবস্থা সমান ছিল না। কৃষকদের ফসল গ্রামের অন্যান্যদের মধ্যেও বিনিময় করা হত। বিনিময়ে কৃষক তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র পেয়ে যেত। কারিগরেরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামের মানুষের জীবনধারা প্রায় একই ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পাহাড় পর্বতের আড়াল থেকে জমি-সম্পত্তি দখলদারদের আক্রমণ, খরা বা বন্যার কবলে পড়ে কখনো কখনো অবস্থার পরিবর্তন ঘটত। গ্রামীণ সম্প্রদায়দের সংগঠন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকমের। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে বহুশতাব্দী কাল ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিবার, জাতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত ছিল। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভিত্তিক পরিবার, জাত ও গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে এবং শহরাঞ্চলে ব্যাবসাবাণিজ্য ভিত্তিক শ্রেণি, ও নিগমের কাছে দায়বন্ধ ছিল, গ্রামাঞ্চল, তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বাধিক মানুষের বসবাসের স্থান ছিল। K. S. Shelvankar এর কথায় "গ্রামীণ সংঘ জীবনে কুটিরশিল্প ও কৃষিকার্য প্রত্যক্ষভাবে একত্রে নির্বাহিত হবার দরুন যে আর্থিক ব্যবস্থা ছিল তারই জোড়ে গ্রামীণ জীবনে ভারসাম্য বজায় ছিল এবং গ্রামসংঘ সংহতি নাশক বিপত্তিসমূহ রোধ করতে পেরেছিল।" তাঁর কথায়, "উনবিংশ শতকে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা যন্ত্রশিল্পের বহুল উৎপাদন ক্ষমতার চাপ প্রতিরোধ

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্তনের পুঞ্জীভূত চাপ সহ্য করতে না পেরে সমাজব্যবস্থা অবশেষে ভেঙে পড়ল।"

গ্রামাঞ্চলের লোকজনদের মধ্যে শতাব্দীকালের সামাজিক জীবন ও চিন্তাধারা ছিল বন্ধ্যা, কুসংস্কারপরায়ণ, সংকীর্ণ এবং বাঁধাগতের দ্বারা নির্দিষ্ট।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবনে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে, কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে গ্রামকে মুক্ত করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ দেশ-বিদেশের বহু সংগঠন তাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের মতো বিশালায়তনের দেশে তৎকালীন গুণীজন ও কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে হবে। তাদের অন্যান্য সমস্ত উদ্যোগও ভাবনাচিন্তাকে সম্মিলিত করতে গেলে কয়েকটি ধাপে সেগুলি সাজানো যেতে পারে। যে তিনটি মূল ধাপ/পর্যায় দেখা যায় তা হল—

প্রথমত — প্রাক্ ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে পল্লি পুনর্গঠন।

দ্বিতীয়ত — ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের পল্লি পুনর্গঠন।

তৃতীয়ত — প্রাক্ স্বাধীনতার আমলে ভারতবর্ষে পল্লি পুনর্গঠন।

উপরি-উক্ত — তিনটি সময় কালের পল্লি পুনর্গঠন বা গ্রামাঞ্চলের সার্বিক বিকাশের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা নীচে বর্ণনা করা হল।

(ক) প্রাক্ ব্রিটিশ আমলে পল্লি পুনর্গঠন ঃ বলা বাহুল্য এই সময়কালে ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। যানবাহন ব্যবস্থা বলতে একমাত্র গোরুর গাড়ির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপনের কোনো সুযোগ ছিল না বললেই চলে। কেবলমাত্র গ্রামান্তরে মেলা, তীর্থযাত্রা বা বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্য ছাড়া গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাতায়াত করার ঘটনা খুব বেশি দেখা যেত না। গ্রামবাসীদের নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠান ছিল সাদাসিধে রকমের। যথা, বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে গ্রাম-গ্রামান্তরে নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন ঘুরে বেড়তেন, তাদের কথা শোনার জন্য গ্রামবাসীরা জড়ো হতেন। এর ফলে ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও তাদের বেশির ভাগের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রাম্যজীবনের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

অন্য দিকে সম্রাট অশোক, বিক্রমাদিত্য এবং অন্যান্য রাজসভায় তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রবিদদের সমাগম ঘটত। আগেকার সেটুকু ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই তাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চায় যুক্ত থাকার নিদর্শনই বেশি। ধর্মের সাথে শিল্পের মেলবন্ধনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময়ের ভারতবর্ষে পল্লিজীবনে যে ধরনের গঠনমূলক উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় তার কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

গ্রামের মানুষ তাদের কৃষিকাজ, কুটির শিল্পকর্ম ও অন্যান্য জীবন-জীবিকার বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সমবেত হতেন। পরস্পরের মতামত বিনিময় হত। সকলের মত এক হলে তবেই সংশ্লিষ্ট কাজে সকলে সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। অর্থাৎ সংবদ্ধতার নিয়ম মেনে চলার জন্য সকলে সচেষ্ট হতেন।

মোগল সম্রাটদের 'স্বশাসিত গ্রাম'-এর ধারণায় গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদের ওপরেই গ্রামের ভালোমন্দ দেখাশোনার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল তার ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও স্বনির্ভর গ্রাম গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

আর্থিক অগ্রগতির ফলে অর্থনৈতিকভাবে এবং কালক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এক-একটি জনগোষ্ঠী সুসংহত হয়ে ওঠে। উত্তরোত্তর এমন একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে যাতে সংগীতে ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানেরা সমবেতভাবে এক ধারণার অধিকারী হয় যে মানুষের অস্তিত্ব শুধুমাত্র

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

জড় জগতের এই জীবনে আবদ্ধ নয়, দৃশ্যমান জগতে যা রয়েছে তার সবই ক্ষণিক। পরমাত্মার উপলব্ধি ও পরমাত্মায় লীন হওয়াই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য। তাই সেই চেষ্টাই শ্রেয়।

স্পষ্টতই সচেতন সামাজিক শ্রেণি এবং আঞ্চলিক সত্তার মিলনে গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি বা সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ বা প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে ছিল না। এই সময়ে ভারতবর্ষে সামন্ত শ্রেণি, বিত্তশালী বণিকদের সুসমৃদ্ধ, জটিল এবং বিস্তারিত সংস্কৃতি এমনকি জনসাধারণের সংস্কৃতি বিশেষকরে লোকশিল্প, লোকগাথা, ধর্মীয় উৎসবাদি প্রভৃতি কোনোটিতেই জাতীয় চরিত্রের ছাপ লক্ষ করা যায় নি। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সমষ্টির সংহতি ভাবনার অঞ্চলকেন্দ্রিক আত্মপ্রকাশ ছিল উল্লেখ করার মত। এই সময়ে গ্রামীণ পুনর্গঠন কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে অনুশাসন ও সংস্কৃতির চর্চার প্রভাব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ভাবনার তেমন কোনো উদ্যোগ এই সময়ে গ্রহণ করা হয়নি যাতে পল্লিবাসীর চেতনা সমৃদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকা নিতে পারে।

(খ) ব্রিটিশ আমলে ভারতে পল্লি পুনর্গঠন ঃ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কৃষি জাতীয় কৃষির পর্যায়ে উঠেছিল কিন্তু তা সম্বৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষিকাজে যুক্ত জনসাধারণ উত্তরোত্তর দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ত, নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ ও তাদের কৃষি শ্রমিকে পরিণত হওয়ার নিদর্শন এই সময় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষিকাজে যুক্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে Roy & Commission on Agriculture গঠন করা হয়। এ ছাড়া এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

- Royal Commission on Education (1931)
- Health Survey (1941)
- Famine Enquiry Commission (1904)
- Cooperatives and Societies Act (1904)
- Rowlett (Sedition) Committee (1918)
- Indian Economic Enquiry Committee (1925)
- Royal Commission on Labour (1931)

প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের কিছু কিছু অংশে ঋণগ্রস্ততার কারণে কৃষকেরা ভূমিদাসে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। একে আর্থিক দাসত্ব হিসেবেও কেউ কেউ আখ্যা দিলেন। Royal Commission on Agriculture-এর প্রতিবেদনে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মহাজনের প্রবল ক্ষমতার কারণে আর্থিক দাসত্ব কতটা গভীরে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিহার ও ওড়িশায় কামিউতি নামে এক ধরনের প্রথা দেখা যায়। যা কিনা ভূমিদাসের দ্বারা চাষ করাবার ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। ঋণগ্রহণ করে সুদ দেওয়ার বদলে তারা যে-কোনো রকমের দাস সুলভ কাজ করবার দায়ে আবদ্ধ হত। এর ফলে কামিয়ারা কখনোই আসল শোধ করে মহাজনদের কাছে ঋণমুক্ত হতে পারত না। পরবর্তীকালে এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ভারতীয় কৃষি জাতীয় কৃষির স্তরে উন্নীত হওয়াতে কোনো একটা গ্রামের বা জেলার কৃষির অবস্থা বাকি গ্রামগুলিতে, জেলা এমনকি সমগ্র দেশকেও কখনও কখনও প্রভাবিত করত। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। সমস্যাগুলি জাতীয় স্তরে জনগণ ও তার নানান অংশকে একত্রিত করার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছিল। প্রতিটি দল একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিত এবং দলের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কৃষিকে পুনর্গঠন করার জন্য তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করতে। এইভাবে কৃষির অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পুনর্গঠনের বেশ কিছু উদ্যোগ বেশ সাফল্যলাভ করে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার একটি দিক যেমন কৃষিব্যবস্থা অন্য আরও একটি দিক তেমন গ্রামীণ কারিগরি শিল্প। ব্রিটিশ আমলে সস্তা ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ যন্ত্রে তৈরি জিনিসপত্রের অনুপ্রবেশ গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের অধঃপতন

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

ঘটানোর জন্য মূলত দায়ী ছিল। গ্রামের তাঁত শিল্প সস্তা যন্ত্রে তৈরি বস্ত্রের অনুপ্রবেশের ফলে প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে পড়ে। মহাত্মা গান্ধি ও তৎকালীন কিছু নেতার উদ্যোগে সর্বভারতীয় তন্তুবায় সমিতি (All India Spinners' Association) স্থাপনের ফলে গ্রামীণ তাঁত শিল্পের ক্রমশ পতনের ধারা রোধ করা সম্ভব হয়।

এ ছাড়া কামার, ছুতোর, কুমোর প্রভৃতি গ্রামীণ কারিগরদের একটি অংশ আর্থিক অনটন ও কলকারখানায় তৈরি সস্তা জিনিসের প্রতিযোগিতায় আসার সুযোগ না পাওয়ায় অনেকে নিজ ব্যাবসা বন্ধ করে দেয়। গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিল্প কারিগর প্রভৃতি জমিতে ভিড় করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জীবনধারণে ব্যর্থ হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর সবরকমের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তার প্রেরণাতেই সারা ভারত গ্রামীণ শিল্প সমিতি (All India Village Industries Association) স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রে তৈরি জিনিসের নির্ভরতা থেকে গ্রামকে মুক্ত করা ও গ্রামীণ শিল্প কারিগরদের পুনরুজ্জীবনের পথে উদ্‌বুধ করা। বিধ্বস্ত কারিগরদের যে বিশেষ অংশ নিজস্ব কারিগরি শিল্প ছেড়ে কৃষি জমি কিনে চাষাবাদে নিযুক্ত হয় তাদের মধ্যেও এক ভিন্ন ধরনের সচেতনতা গড়ে ওঠে। আর্থিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের সভ্য নয় তবুও এদের মধ্যে স্বার্থ ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সারা দেশজুড়ে বিশেষ ভাবে মিল লক্ষ করা যায়। এই ধরনের কৃষকও সারা ভারত কিষান সভা নামে (All India Kisan Sabha) সমিতি গড়ে তোলেন। এই ভাবে ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ কৃষি ও কারিগরি শিল্পের পুনর্গঠন, নানান ধরনের সভাসমিতি স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে সংঘবন্ধ ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগঠনে উদ্‌বুধ্ধকরণের নানান উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাম পুনর্গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

(গ) প্রাক্-স্বাধীনতার আমলে গ্রামীণ পুনর্গঠনের উদ্যোগ ঃ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার ও গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের মন্দাবস্থা থেকে কৃষক ও কারিগরদের পুনরুজ্জীবনের কাজে দেশের বহু নেতা ও মনীষীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কৃষি ও শিল্পের উত্তরোত্তর ধ্বংসের স্রোত প্রতিহত করার জন্য এমনকি তাদের পূর্ণশক্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগও তার মধ্যে নতুন পথের সূচনা করতে সহায়ক হয়েছিল। যাদের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পল্লি উন্নয়নের দিক দর্শনকারী কর্মপ্রচেষ্টা গৃহীত হয় তারা হলেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, স্পেনসর হেচ (Spencer Hetch), এফ. আই. ব্রারান (F. I. Briyane), ভি. টি. কৃষ্মমাচারী (V. T. Krishnamachari) আলবার্ট মেয়র (Albert Mayor) এবং বিনোবা ভাবে প্রমুখ।

পল্লি উন্নয়নে যেসব কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহীত হয় তা হল—

(ক) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প (১৯২২)।

(খ) মহাত্মা গান্ধির সেবাগ্রাম (১৯৪২) প্রকল্প।

(গ) V. T. Krishnamachari-র বরোদা প্রকল্প।

(ঘ) F. I. Briyane এর গুরগাঁও প্রকল্প।

(ঙ) Spencer Hetch-এর মার থান্‌ডম্ প্রকল্প।

(চ) Albert Mayor-এর নিলোখেরী ও এটাওয়া প্রকল্প।

(ছ) বিনোবা ভাবের ভূদান ও গ্রামদান প্রকল্প ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তথাপি একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রাক্ স্বাধীনতার আমলে গ্রামীণ সমষ্টি বিকাশের/পল্লি পুনর্গঠনের নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মহাত্মা গান্ধির কাছে জীবন ও জীবিকা, সাধারণ নীতি ও রাজনীতি পৃথক পৃথক ভাবে বিচার্য ছিল। তাঁর গ্রাম পুনর্গঠনের ভাবনা মূলত তলস্তয়ের The kingdom of god is within you 'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে' গ্রন্থটি থেকেই এসেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। দরিদ্র রুশি জনতার সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনায় তলস্তয় (Tolstoy) মস্কো মহানগরী থেকে স্বগ্রামে গিয়ে বাস করলেন। রুশি চাষিদের সেবা ও তাদের সরলজীবন আদর্শ গ্রহণ

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

করার জন্য সর্বত্যাগী হতে চাইলেন। তারা মোটা পোষাক পরলেন, ক্ষেতে গিয়ে লাঙল ধরলেন, আভিজাত্যের খোলস খুলে ফেললেন। তলস্তয়ের জীবন সাধনায় গান্ধিজি ও উদ্‌বুধ্ধ হলেন, শিক্ষা, স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য সেবাগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লি পুনর্গঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন।

অন্য দিকে Dr. Spencer Hetch-এর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে Y. M. C. A. (Young Men Christian Association)-এর উদ্যোগে মার্‌থান্‌ডন্‌ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীর কাছে তাদের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের নানান উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলির ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা বা প্রদর্শনের (demonstration) মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণে উদ্‌বুধ্ধ করা। তাঁর অভিজ্ঞতায় ডঃ হেচ দেখেছেন কেবলমাত্র বক্তৃতা ও মনোগ্রাহী আলোচনায় যতটা মানুষের উদ্‌বুধ্ধ করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি উৎসাহ গড়ে তোলা যায় বিভিন্ন সফল উদ্যোগের ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা বা প্রদর্শনের মাধ্যমে। এতে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণও বাড়ে।

এ ছাড়া অন্যান্যদের পল্লি পুনর্গঠনের উদ্যোগগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রীয় ভাবনায় স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মতো বিষয়গুলির গুরুত্ব সর্বাধিক। যেমন গুরগাঁও-এর পল্লিগঠনে আমরা দেখতে পাই মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গ্রামবাসীদের সচেতনতা বাড়ানো ও স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভূ-দান এবং গ্রামদানের ক্ষেত্রে মানুষের স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দানের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ানোর কাজে জোড় দেওয়া হয়েছিল। যেখানে সম্পদের সু-ব্যবহার ও গ্রামীণ সম্পদ সম্মৃধ্ধির বিষয়টি অন্তর্নিহিত ছিল।

একদিকে ব্রিটিশ শক্তির পরাজয় এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের পথে ভারতবাসীর অভ্যুত্থানের মুহূর্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পল্লি পুনর্গঠনের যে উদ্যোগ গৃহীত হয় তার ফলে পল্লিজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। হৃত-দরিদ্র কৃষক তাদের মহাজনদের কবল থেকে জমি উধ্ধারের কাজে সংঘবধ্ধ হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারিগরি শিল্পের কারিগর সমবেতভাবে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণের পথ খুঁজে পায় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তাদের জীবন-জীবিকার নানান দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃধ্বি ঘটে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে পল্লি পুনর্গঠন আসলে গ্রামীণ ভারতের পুনরুজ্জীবন বলেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজকর্মের পঠন-পাঠনে এই ধরনের গ্রামীণ সমষ্টির অংশগ্রহণে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সম্পদ বৃধ্বির দ্বারা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম গঠনের উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এখানে শ্রীনিকেতন, গুরগাঁও, ভূ-দান-গ্রামদান ও নীলোখেরী নামক পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার অবতারণা করা হল।

৩.২. শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প

দেশ বিদেশে অনেক বড়ো মাপের মানুষ জন্মেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই মানুষের কল্যাণের জন্য নানা তাত্ত্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশ করে গেছেন। কিন্তু তত্ত্বকে যারা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন, শ্রম দিয়ে, সাধনা দিয়ে এমনকি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার ব্যাক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা, মুক্ত সমাজ সৃষ্টির কথা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনে উন্নত কুটিরশিল্প কীভাবে এমন দুর্বল হয়, তার প্রেক্ষাপটে লেখা 'পণরক্ষা' গল্পের মুখ্য উপজীব্য। বাংলার কয়েক লক্ষ তাঁতি কীভাবে ইংরেজ শাসনে বেকার হয়ে গেল বিশেষকরে ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র আমদানির ফলে এ রচনায় তার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। শিলাইদহে স্থায়ীভাবে বাস করার সময়ই ভারতীয় গ্রাম-সমাজকে জাগ্রত করার কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। অসংগঠিত কৃষি নির্ভরতা, সমবায় ব্যবস্থার সুফল, সমস্ত জমিকে একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

সুবিধা তিনি কেবল উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের জমিদারিতে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার পর রবীন্দ্রনাথ সুরুলের কুঠি বাড়ি কিনে শিলাইদহের আরব্ধ কাজকে পরিণতি দিতে চেয়েছিলেন। পল্লি উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা, পূর্তকর্ম, ঋণদান ব্যবস্থা ও সালিশি বিচারব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই শ্রীনিকেতনে পল্লি পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কবিগুরু তাঁর নিজের সৃষ্টিশৈলীর জন্য যেমন বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি পল্লির উন্নয়নে তাঁর ধ্যানধারণা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির জন্য উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। চিন্তাবিদ ও গবেষকদের একটি অংশের মতে 'শ্রীনিকেতন' হল 'a micro institute with micro aspects' কবিগুরুর এই পল্লি পুনর্গঠনের উদ্যোগে যিনি বিশেষ সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির অধ্যাপনায় নিযুক্ত ডঃ এল. এল্‌মহার্স্ট (Dr. L. Elmharst)। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রী নিকেতন' গ্রাম কাজের সূচনা করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলেও কবিগুরু নিজের উপলব্ধির আলোকে গ্রামীণ সমষ্টির সমস্যা, দুঃখ দুর্দশার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমষ্টির মানুষকে এগিয়ে আসার এবং নিজেদের উদ্যোগে পল্লি উন্নয়নে পল্লিবাসীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠার পিছনে যে মূল বিষয় বা ধারণা যুক্ত ছিল তা খতিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব তাঁর প্রতিটি উদ্যোগে পল্লিবাসীর অংশগ্রহণকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পেছনে যে দুটো মূল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল—

প্রথমত— পল্লিবাসীর সমস্যা ও অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করা ও সেগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে পল্লিবাসীদের উদ্‌বুদ্ধ করা।

দ্বিতীয়ত— নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লিবাসীদের মধ্যে স্ব-সহায়তা ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে মজবুত করা।

আলোচিত অংশে যে বিষয়টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে তা হল পল্লিবাসীদের নিজেদের সমবেত হওয়া, সমষ্টি উদ্যোগ গ্রহণ করে পল্লিজীবনের সমস্যা চিহ্নিত করণ ও তার প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা স্থির করার জন্য সমষ্টিগতভাবে উদ্যোগী হওয়া। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে পল্লি পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

পল্লি উন্নয়নের কাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথে হাঁটতে চেয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি কৃষিকাজকে আরও উন্নত প্রথায় কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি জানতেন কৃষিকাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন হলে উৎপাদন বাড়বে ও গ্রামীণ অর্থনীতি আরও চাঙা হয়ে উঠবে। শ্রীনিকেতনের যে মূল বৈশিষ্ট্যগুল সবার নজরে আসে, সেগুলি অনুধাবন করলে পল্লি পুনর্গঠনে অভিনব ভাবনার অনেক দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে। যেমন—

(ক) সমষ্টির কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা বা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরাসরি সমষ্টির সমস্যাগুলি শ্রেণিকক্ষে আলোচনার উদ্যোগগ্রহণ।

(খ) শ্রেণিকক্ষে অর্জিত শিক্ষা বা জ্ঞানকে পল্লিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

(গ) পল্লিবাসীদের জন্য শৌচাগারের বন্দোবস্ত করা ও তাদের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি।

(ঘ) স্থানীয় সম্পদের সহজলভ্যতা ও পল্লিবাসীদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

(ঙ) এই পুনর্গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় চাষাবাদ ও গবাদি পশুপাখি পালনে পল্লিবাসীদের উদ্‌বুদ্ধ করা।

(চ) শিল্পকলা ও কারুকার্যের নানান বিষয় পল্লিবাসীদের শেখানোর বন্দোবস্ত করা।

(ছ) পল্লিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিবোধ, সহমর্মিতা ও স্বসহায়তার বোধ জাগ্রত করা যাতে সংঘবদ্ধ উদ্যোগে পল্লি উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

উপরি উক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠন উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করলেও এই উদ্যোগের মূল ক্ষেত্রগুলি (thrust area) পল্লি উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি বিষয়কে মাথায় রেখে ঠিক করা হয়েছিল। যেমন কৃষিকাজ, কুটিরশিল্প, সমবায় ব্যাংক, চিকিৎসা পরিসেবা, মহিলা উন্নয়ন, বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক ও সমষ্টিভিত্তিক সংগঠন স্থাপন প্রভৃতি। শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কবিগুরু শিক্ষাকে আবার নতুন রূপদানে ব্রতী হন। অগণিত 'শিক্ষাসত্র' নামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হল। যেখানে ছাত্রদের জীবনে 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা' গানের বাস্তবায়ন ঘটলো। এখানে ছাত্ররা Learn to earn an honest livelihood অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে সৎভাবে জীবিকার সংস্থান করতেও ছাত্ররা শিখবে।

শ্রীনিকেতন পল্লি পুনর্গঠনের উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির পথ প্রশস্ত করার কর্মকাণ্ড রূপায়ণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রাথ ঠাকুর কতগুলি নীতি মেনে চলতেন। সেগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

➠ **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গ্রামবাসীদের পরিচিত করানো ঃ** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন মানুষ তার নিজের আনন্দ উৎসব নিজের মতো করেই উপভোগ করবে। তাঁর ধারণা গ্রামবাসীরাই সাংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ফলে তাঁর উদ্যোগে শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী পল্লিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব ও সংস্কৃতি চর্চায় জোয়ার এসেছিল।

➠ **মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা ঃ** রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে আত্মবিশ্বাসই তার অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার। পল্লিবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার গ্লানিকে দূরীভূত করতে মনোবল প্রতিষ্ঠা করাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এগিয়ে চলার সাহস অর্জন করাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান উপায় বলে এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

➠ **স্ব-সহায়তা ও আত্মনির্ভরশীলতা ঃ** পল্লিবাসীদের একের প্রয়োজনে অন্যেরা ছুটে আসবে এবং নিজেদের পারস্পরিক সাহচর্যে সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনে সমবেত হবে, এই নীতির ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ পরমুখাপেক্ষীতার কবল থেকে পল্লিবাসীদের আত্মনির্ভরতার পথে বিশেষভাবে উদ্যোগী করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

➠ **প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ** শিক্ষালাভ ও স্বাবলম্বনকে স্বার্থক রূপদান করতে গিয়ে তিনি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। সে কারণে, তিনি সেলাই, বুনন, মৌমাছি পালন, উদ্যান পালন, কৃষিকাজ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেন।

➠ **গ্রামবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ঃ** সহমর্মিতা ও সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে গ্রামবাসীদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুভূতিশীল হতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। মানুষ হিসাবে সকলের যে আত্মমর্যাদা বোধ থাকা জরুরি সে বিষয়ে কবিগুরু সচেতন থেকে উপযুক্ত উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

➠ **সুসংহত কর্মপ্রচেষ্টা ঃ** প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের কর্মদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা মোকাবিলা করে সুসংহত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর গ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পরীক্ষামূলক গ্রাম পুনর্গঠনের উদ্যোগ সমষ্টিগত দর্শন প্রতিষ্ঠায় যেমন সাফল্য অর্জন করেছে তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সম্পদের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নের উদাহরণ স্থাপন করেছেন। যদিও মাত্র কয়েকটি জনপদের মধ্য এই উদ্যোগ সীমাবধ্ব ছিল এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরে একটি অংশের পল্লিবাসীদের অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনায় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল তবু রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় "our aim is to give these villagers complete freedom, education for all the winds of joy and happiness flowing accoss the villages-music and recreation going on as in the old days........ . I will say that these few villages are my India."

৩.৩. গুরগাঁও প্রকল্প

পল্লি পুনর্গঠন উদ্যোগ পল্লিবাসীকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃত হয়। আগেই বলা হয়েছে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রধান উপায়। প্রায় প্রতিটি পুনর্গঠন উদ্যোগে তাই কৃষিকাজে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রচলনে কৃষির উন্নতি কীভাবে ঘটানো যায় সেই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। গুরগাঁও প্রকল্প তৎকালীন কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নতুন দিক দর্শনের প্রকল্প হিসাবে কেউ কেউ দাবি করেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে গ্রামের মানুষের জীবন, তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এফ. আই. ব্রায়ান (F. I. Briyane) লক্ষ করেছেন। কীভাবে এই গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করা যায়, কীভাবে তাদের বিভিন্ন যৌথ প্রয়াসে উদ্যোগী করে তোলা যায় এবং সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনা যায় শুধু সেই ভাবনায় ব্রায়ান ক্ষান্ত থাকেননি। গুরগাঁও অঞ্চলে গ্রামীণ জীবন গভীরভাবে অনুধাবনে ও তাদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সম্ভাবনার পথ খুঁজে বার করতে তিনি উদ্যোগী হলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গুরুগাঁও পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্পের সুচনা করলেন উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, তাদের সঙ্গে বসে উন্নয়ন ভাবনার শরিক হওয়ার জন্য ব্রায়ান আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐ অঞ্চলের কৃষি ভাবনায়, 'স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ' ও পল্লিবাসীর অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

উদ্দেশ্য ঃ সামগ্রিকভাবে পল্লিবাসীর সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন,

কঠোর শ্রম, স্ব-সহায়তা, আত্ম-মর্যাদা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পল্লিবাসীদের সংগঠিত করা।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ছোট-খাটো সাফল্যযুক্ত উদ্যোগগুলির ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা/প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটানো।

পারস্পরিক সাহচর্যের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে পল্লিবাসীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

কৃষিব্যবস্থায় ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পে নতুন ভাবনার প্রয়োগ ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানো।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে পুনর্গঠন প্রকল্পের সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত করার জন্য ব্রায়ান কিছু নীতি মাথায় রেখেছিলেন। তিনি জানতেন প্রতিটি উদ্যোগের সফল রূপদানের জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু নীতি মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে। গুরগাঁও প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে সব নীতি মেনে চলার উদ্যোগী হয়েছিলেন সেগুলি হল—

(ক) পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা ঃ ব্রায়ান চেয়েছিলেন যে পল্লিবাসীদের মধ্যে বাইরের সম্পদ ও সামর্থ্যের প্রতি নির্ভরশীলতার পরিবর্তে তাদের নিজেদের মধ্যে যে শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদের ভাণ্ডার মজুত রয়েছে তা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতার মাধ্যমে গ্রাম সমৃদ্ধ হোক। এভাবে সামাজিক প্রগতি ছাড়াও পল্লিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ এবং সমষ্টিবোধ জাগ্রত করে নিজেদের সম্পর্কও মজবুত করে তোলা সম্ভব।

(খ) নেতৃত্বের বিকাশ ঃ গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্রায়ান চেয়েছিলেন নেতৃত্বের ভাবনায় পরিবর্তন ঘটানো দরকার তা শুধু জাতি ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে না বলে শোষণ ও অত্যাচারের হার কমবে, পল্লিবাসীদের সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। তাই গুরগাঁও প্রকল্পে পল্লিবাসীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে পল্লিবাসীদের কাছে তাদের বিপদ-আপদে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সমষ্টি থেকে উঠে আসা নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্ব পেল।

(গ) গণশিক্ষা ঃ গ্রামবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অবসান ঘটিয়ে ব্যাবহারিক শিক্ষায় সচেতন ও শিক্ষিত করার জন্য এই প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, মানুষের সুবিধামতো সময়ে একসাথে বিভিন্ন বয়সের ও বর্ণের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

(ঘ) পল্লি সংগঠন ঃ পল্লির মানুষের মধ্যে একাত্মতা বোধের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাদের সংঘবন্ধ করা এই প্রকল্পের অন্যতম নীতি হিসাবে পরিগণিত। পল্লির নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলে সেই সংগঠনের মাধ্যমে এক হয়ে চলা, মতামত বিনিময়, ভাব-ভালোবাসার মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।

উপরি-উক্ত নীতিগুলির কথা মাথায় রেখে পল্লিবাসীদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল তা হল—

— গ্রামীণ অর্থনীতির বিদ্যালয়।

— ঘরোয়া অর্থনীতির বিদ্যালয়।

— স্বাস্থ্য সংঘ।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিদ্যালয় ঃ মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নানান কাজকর্মের বাস্তবতা তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিত্য নতুন দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগের ব্যাপক প্রচার ও মানুষের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, ঘরোয়া অর্থনীতির বিদ্যালয় মূলত ঘরোয়া কাজে মহিলাদের যুক্ত করা ও তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা দানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ ও মহিলাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তা হল ঃ

ß মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পরিচর্যা

ß হস্তশিল্প

ß সেলাই ও সূচিশিল্প

ß শৌচালয় ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

ß মা ও শিশু শিক্ষা প্রভৃতি

স্বাস্থ্য সংঘের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতার দিকটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মানুষের কাছে পৌঁছোতে না পারে, নেতৃত্বের অবস্থায় আসা পল্লিবাসীদের মধ্যে শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতা এবং প্রচলিত ধ্যানধারণার গণ্ডি থেকে মানুষকে বার করে আনার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থার অভাব জাতীয় কয়েকটি সীমাবন্ধতা থাকলেও এই প্রকল্পে পল্লি পুনর্গঠনের মানুষের অংশগ্রহণ বিশেষকরে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করানোর অভিনব কয়েকটি উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক ও স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নেও এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.৪. ভূ-দান ও গ্রামদান আন্দোলন

ভারতবর্ষে ভূসম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থা এমনই যে বৃহৎ ভূস্বামী থেকে ভূমিহীন এরকম নানা শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। বিশেষত ষাট সত্তরের দশক পর্যন্ত এ ব্যবস্থা ছিল রীতিমত শক্তিশালী। জীবন-জীবিকার সংস্থান করতে বেশির ভাগ ভূমিহীন মানুষজন অন্যের জমিতে শ্রমদান করতে বাধ্য হয়। সামান্য সংখ্যক মানুষ বনাঞ্চলের সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকা পালনের চেষ্টা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এই রীতি ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সম্পদশালী, বিত্তবান ও জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটিয়েছে। দেশের বেশিরভাগ ভূসম্পত্তির মালিকানা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে থাকায় একটি বিরাট অংশের মানুষের ক্ষেত্রে অনাহার, অর্ধাহার হলো নিত্য সঙ্গী। অন্যের জমিতে শ্রমদান করারও সুযোগ থাকতো না সারাবছর।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর ভ্রমণকালে আচার্য্য বিনোবা ভাবে নিজের চোখে সম্পত্তিহীন কৃষকদের দুঃখ, দুর্দশা ও অনাহারে দিনাতিপাতের ঘটনা দেখে বিস্মিত হলেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তা তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করলো। এই শ্রেণির মানুষের জন্য বিশেষ করে ভূমিহীনদের অভাব অনটনের প্রতিকার সাধনের পথ খুঁজতে আমাদের দেশের নানান উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দান-ধ্যানের বিষয়টি তাঁর মাথায় আসে। তিনি দেখেছেন পবিত্র রমজান মাসে মানুষ কিছু দান করেন বিশেষকরে ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষকে অন্ন দান করা হয়। পবিত্র গীতায় বর্ণিত 'আত্মোপায়' ধারণাটি তাঁর মাথায় আসে। এই সব ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দেই তিনি বিত্তবান, মহাজন, জমিদার ও উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে আবেদন রাখলেন-তাদের যার যেমন সাধ্য ও সামর্থ্য সেই অনুযায়ী অসহায়, ভূমিহীন, দরিদ্র মানুষের সাহাযার্থে উদ্যোগী হওয়ার জন্য। তাঁর এই আহ্বান-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূসম্পত্তি হীন মানুষের জন্য কিছু সম্পত্তির ব্যবস্থা করা, এর ফলে ভূমিহীন, খেটে খাওয়া মানুষের নিজেদের শ্রমদান করে ফসল ফলিয়ে নিজেদের নিরন্ন অবস্থার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবনায় ভূমিহীনদের ভূমিদানের বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও সমষ্টিগত ভাবে গ্রামদানের জন্যও আচার্য্য ভাবে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

মূল কার্যাবলি ঃ বিত্তবান, মহাজন, জমিদার ও অগাধ সম্পত্তি মালিকদের স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দানের আহ্বান জানানোর আগে আচার্য্য ভাবে ভারতবর্ষে তৎকালীন ভূমিহীনদের অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর ধারণায় প্রায় ৫০ মিলিয়ন কৃষিজমিহীন কৃষকদের জন্য ৫০ মিলিয়ন একর জমির প্রয়োজন। তাহলে প্রত্যেক এক একর করে জমি পেতে পারেন। গান্ধিজির আদর্শে উজ্জীবিত বিনোবাজী সম্পত্তিবানেদের কাছে তাদের মোট সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{৬}$অংশ) ভূমিহীনদের জন্য দান করতে আহ্বান জানান। এই আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তিনি সারা ভারতবর্ষে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হলেন। যেখানে যেখানে সম্পত্তি দানের জন্য আবেদন আসবে, সেখানে সেই সম্পত্তি প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে সম্পত্তিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন মিলিয়ন একর জমি ভূ-দানের ভাণ্ডারে জমা পড়ে। ১৯৫৫ সালের মে মাস পর্যন্ত এই সংখ্যার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৭৫ মিলিয়ন একরে পৌঁছোয়। একটি আন্দোলনের সূচনা লগ্নের সাথে ঐ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান বিস্তার লাভের প্রায় প্রতিটি ধাপে নানান রকমের প্রতিবন্ধকতা আসে। সময়মতো, দক্ষতার সাথে সেগুলি মোকাবিলা করার দরকার হয়। ভূ-দান-এর ক্ষেত্রে উদ্ভূত নানান রকমের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গ্রামদানের ক্ষেত্রেও যেখানে পুরো গ্রাম জুড়ে সম্পত্তি খেতমজুরদের বসবাস, তাদের সকলের জন্য স্থানীয়ভাবে ভূ-দানের ভাণ্ডারে সম্পত্তি জমা পড়ার পরিমাণ আশানুরূপ ছিল না, সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি জমা পড়ে বিহারে। কিন্তু সেই সমস্ত সম্পত্তির বেশির ভাগ ছিল উঁচু, সেচের সুবিধাহীন এবং অনাবাদি। ফলে ঐ জমি যে সব ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে তারা কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি।

সীমাবদ্ধতা ঃ Daniel Thorner-এর মতে ভূ-দান ও গ্রামদান আন্দোলনের যে সীমাবদ্ধতার ছাপ ফুটে উঠেছে তা হল—

যারা শারীরিক, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই জমি চাষ করা এবং উৎপাদনের হার বাড়ানো অসম্ভব। কারণ যে ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে পতিত/অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তর করা যায় তা এই শ্রেণির মানুষের ছিল না।

অন্যদিকে এক একজন মানুষের সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ না করার ফলে উৎপাদনের হার বাড়ানোর জন্য বেশির ভাগ সম্পত্তির মালিকদের তেমন কোনো উৎসাহ বা উদ্যোগ দেখা যেত না। ফলে যে ধরনের সম্পত্তি দানের আবেদন করা হয়েছে তার পরিবর্তে সম্পত্তির সর্বোচ্চ ধারণ সীমা (ceiling) নির্ধারিত করা ও আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দিলে অতিরিক্ত জমি বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত।

এ ছাড়া সাধারণভাবে ভূ-দান গ্রামদানের আন্দোলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ সক্রিয় হলেও স্থানীয় ভাবে একশ্রেণির নেতৃত্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূ-দান ও গ্রামদানের আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

এসব সীমাবন্ধতা থাকলেও দেখা গেছে কেবলমাত্র দান-ধ্যানের সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোল এবং একশ্রেণির বিত্তবান, সম্পত্তিবান মানুষের কাছ থেকে ভূমিহীন, ক্ষেতমজুরের জন্য সহানুভূতি ও সাধ্যমতো দানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাড়ানোর ক্ষেত্রে এই আন্দোলন পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৫. নিলোখেরী পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প

প্রাক্ স্বাধীনতার আমলে ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র শিল্প সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। কোথাও কোথাও শিল্পকে কেন্দ্র করে বুহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছেন। আবার কোথাও কোথাও মানুষ শিল্পকেন্দ্রের পাশাপাশি অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে নগরায়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। এর ফলে একশ্রেণির মানুষ তাদের রুজি-রোজগারের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে শিল্প স্থাপনকে কেন্দ্র করে বহু মানুষকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। যারা স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি করে বসবাস করতে পেরেছেন তাদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও অনেক মানুষকে গৃহহীন হতে হয়েছে। এই সব গৃহহীনদের সংঘবন্ধ করা ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা মাথায় রেখে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিলোখেরী পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করেন আলবার্ট মেয়র (Albert Mayor)। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে কাজ শুরু করতে আরও ৪-৫ বছর সময় লাগে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু হয়। তাঁর অভিজ্ঞতায় মেয়র দেখেছেন যে, গৃহহীনদের মধ্যে শক্তি সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারলে তাদের নিজেদের উদ্যোগে সংঘবন্ধ ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কাজ অনেকটা সহজ হবে। পরমুখাপেক্ষীতা থাকবে না। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০-৫০ হাজার উদ্‌বাস্তুদের যুক্ত করা হয়। মুলত পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের কথা ভাবা হলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উদ্‌বাস্তুদের সংঘবন্ধ হতে সাহায্য করা যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নানান সমস্যা মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হন।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথে উদ্যোগী হতে সাহায্য করা।

শ্রমও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ সমৃদ্ধির কাজে উদ্‌বাস্তুদের বিশেষ ভাবে উদ্যোগী করে তোলা।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রকল্পের অধীনে একটি ছোট্ট টাউনশিপ (Township) গড়ে তোলা হয়। যেখানে পানীয় জল, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৫০০০ মানুষ এই Township-এ বসতির সুযোগ পেলেও পরে বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য অনুসারে Mayor এই Township-এর নামকরণ করেন মজদুর মনজিল (Mazdoor Manzil)

মূল কার্যাবলি ঃ উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলে ও মজদুর মনজিল স্থাপনের মাধ্যমে নানান রকমের সচেতনতা বৃদ্ধির ও স্বাবলম্বনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষি বা খেতখামারে চাষাবাদের প্রচলন এই শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। কারণ উদ্‌বাস্তু হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান করা প্রায় সকলের ক্ষেত্রে দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিতে গিয়ে যে ধরনের কাজগুলো করা হয় তা হল ঃ

ß বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং সমষ্টির মানুষের উদ্যোগে তা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়।

ß নিয়মিত সভা ও সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির নানান বিষয়ে উদ্‌বাস্তুদের ওয়াকিবহাল করা হয়।

ß অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা অভাব (Need) পুরণের মাধ্যমে জীবনযাপনের মানব উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য বিধির প্রচলন করা হয়।

ß নানান রকমের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরে মহিলাদের অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ß বিভিন্নভাবে উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এই প্রকল্পের তেমন উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটেনি। মজদুর মনজিলের মতো Township-এর প্রয়োজন ও চাহিদা বাড়লেও প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থের অভাবে এই প্রকল্পের কর্মধারা বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তার অন্যতম কয়েকটি কারণ হল—

ß উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে লেখাপড়ার মান খুবই কম এবং তাদের পারস্পরিক মেলবন্ধন মজবুত হয়ে ওঠেনি।

ß প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার আশায় বহু মানুষ অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে সমষ্টির কাজের প্রয়োজন এই সম্পদ অধরাই থেকে গেছে।

ß মজদুর মনজিলের মতো Township-এ বসতি স্থাপন করা মানুষের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে বসতিস্থাপনে বঞ্চিত মানুষের বিরোধ জনসমক্ষে উঠে আসে।

নানান রকমের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলেও উদ্‌বাস্তু মানুষদের জন্য কিছু করার যে উদ্যোগ আলবার্ট মেয়র গ্রহণ করেছিলেন তার সুদূর প্রসারী প্রভাব স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই উদ্যোগের বিস্তৃতি ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলেও উদ্যোগের ধ্যানধারণা সেই সীমা অতিক্রম করেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের বহু প্রান্তে ছোটো-খাটো উপনগরী গড়ে উঠেছে। উদ্‌বাস্তু মানুষের জন্য যা কিছু করা হয়েছে বা হচ্ছে তার ভিত গড়ে উঠেছে নিলোখেরী প্রকল্পের ধারণা থেকে। গ্রামোন্নয়নের নানান দিক নিয়ে ব্রিটিশ আমলে ও প্রাক্ স্বাধীনতাকালে প্রায় প্রত্যেকটি উদ্যোগের মতো নিলোখেরী পল্লি পুনর্গঠন প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই পর্বের আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো প্রকল্প পল্লিজীবনকে সংঘবদ্ধ করে নিজেদের উদ্যোগে তাদের নিজেদের উন্নয়ন ঘটানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো প্রকল্পে আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের প্রতিটি উদ্যোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা পল্লি পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক হবে। এই পর্বের উপস্থাপন বিস্তৃত না হলেও বিভিন্ন দিক দর্শনকারী পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের আলোচনার মাধ্যমে ধারণাগত ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.৬. গ্রন্থপঞ্জি

১। এ. আর. দেশাই	ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি
২। বিশ্বভারতী	Gandhi Centenary Volume
৩। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পঃ বঃ সরকার	পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা (১৪০৯)
৪। অসিত কুমার বসু	পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা
৫। Acharya Vinoba Bhave	Bhoodan and Gramdan Movements
৬। A. R. Desai	Rural Sociology in India.

৩.৭. প্রশ্নাবলি

১। ভারতের গ্রামীণ পুনর্গঠন উদ্যোগের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। গুরগাঁও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। ভূ-দান কি? এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, সাফল্য ও দুর্বলতা ব্যাখ্যা করুন।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

একক—৪ ❑ গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা এবং গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প

গঠন

৪.১. প্রস্তাবনা

৪.২. কেন্দ্রীয় স্তরে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর

৪.৩. রাজ্যস্তরের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর

৪.৪. সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা

৪.৫. জাতীয় গ্রামীণ কর্মীসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি (NREGS)

৪.৬. ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY)

৪.৭. জলবিভাজিকা উন্নয়ন (Water shed Development)

৪.৮. স্পেশাল কম্পোন্যান্ট প্ল্যান (SCP)

৪.৯. ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান (TSP)

৪.১০. খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (DPAP)

৪.১১. রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা (RSVY)

৪.১২. প্রকল্পের তদারকি ও মূল্যায়ন

৪.১৩. প্রশ্নাবলি

৪.১. প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজকর্ম করে আসছে। পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করা হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ, অবহেলা, রোগ, সুযোগের অসাম্য এবং উন্নতমানের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের কথা ভেবে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সাথে সাথে সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা বলা আছে। মুক্ত অর্থনীতির বাজারে গ্রাম উন্নয়নের গুরুত্ব অসীম। এর কারণ সারা বিশ্বে বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বিশ্ব জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের কর্মসংস্থান হয় কৃষিতে এবং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে। কলকারখানা হল আর একটি জায়গা যেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু তার যে কাঁচামাল তার জোগানও অনেকখানি কৃষি থেকে হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের পেশা হচ্ছে চাষ বা চাষ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে। তা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গ্রামের চেয়ে শহর অনেক এগিয়ে।

১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হয়, যেটি গ্রাম উন্নয়নের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অংশ হিসাবে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে। আগস্ট ১৯৭৯ সালে, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর গ্রাম পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয় এবং ঐ মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সালের ২৩শে জানুয়ারি

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই মন্ত্রণালয়ই গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ভিতর দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

৪.২. কেন্দ্রীয়স্তরের গ্রাম উন্নয়ন স্তর

গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয় তিনটি দপ্তর নিয়ে গঠিত।

১। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর

২। ভূমি সম্পদ দপ্তর

৩। পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর

১। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ঃ

গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর যে সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ করে সেগুলি হল—

স্বনির্ভরকরণ প্রকল্প, মজুরি ব্যবস্থা, আবাসন ও ক্ষুদ্রসেচ, অসহায় মানুষদের সামাজিক অনুদান এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরি, জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বেচ্ছাকার্যকারিতা উন্নয়ন ইত্যাদিতে সহায়তা করা। এই দপ্তরের মূল কর্মসূচিগুলি হল প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY), গ্রামীণ আবাসন (RH), সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY) এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) ইত্যাদি।

২। ভূমি সম্পদ দপ্তর ঃ

এই দপ্তরের মূল কাজ হল মরুভূমি এবং খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন (DPAP), সার্বিক পতিত জমি উন্নয়ন এবং ভূমিসংস্কার ইত্যাদি। তা ছাড়া এই বিভাগ - পতিত জমির উন্নয়নের মাধ্যমে বায়োমাস উৎপাদন, ভূমি সংস্কার, জমির খাজনা এবং নথি ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে সহায়তা করা ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণ করে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জল ও ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে পতিত জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মানুষের আয় বাড়ানো।

৩। পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর ঃ

গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যের সুযোগের সম্প্রসারণ করাই হল এই দপ্তরের কাজ। সজলধারা, গ্রামীণ জল সরবরাহ কর্মসূচি (ARWSP) এবং সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কমসূচি (TSP) ইত্যাদি এই দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

এ ছাড়া আরও তিনটি স্বশসিত সংস্থা এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। সেগুলি হল—

স্বশাসিত সংস্থা ঃ

কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তিনটি স্বশাসিত সংস্থা তৈরি করেছেন (ক) Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology (CAPART), (খ) জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও (গ) জাতীয় গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন সংস্থা।

(১) CAPART —

CAPART গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত টাকার একটা অংশ বেসরকারি সংস্থার (NGO) মাধ্যমে যে সকল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে সেই সমস্ত সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে গ্রাম উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এটি স্থাপিত হয় ১৯৮৬ সালে।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

উদ্দেশ্য —

(ক) স্বেচ্ছাকাজে উৎসাহ দান করা (গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে)।
(খ) গ্রাম উন্নয়নের জন্য নতুন উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রণয়নে স্বেচ্ছাসেবী কাজের উৎসাহ দান।
(গ) গ্রাম উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তির ও প্রচার করার জন্য জাতীয় স্তরে মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।
(ঘ) প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণ প্রকল্পে সহায়তা করা।
(ঙ) অন্তঃরাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় স্তরে একটা যোগাযোগ রাখা যাতে স্বেচ্ছাকর্মে উৎসাহিত বোধ করে।
(চ) গ্রামীণ সমষ্টি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যোগ্যতা বাড়িয়ে জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বেচ্ছাকর্মের মনোভাব বাড়ানো।
(ছ) পিছিয়ে পড়া এলাকা বিশেষ করে যেখানে উৎপাদনশীলতা কম, সেই সমস্ত এলাকায় বেশি করে নজর দেওয়া।
(জ) সাধারণ মানুষ যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে পারে তার যোগ্য করে তোলা।

(২) জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Institute for Rural Development) ঃ

জাতীয় স্তরে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এন. আই. আর. ডি. (N.I.R.D) গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ঃ

(ক) গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষের ধারাবাহিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে যে বিষয়গুলির অবদান আছে সেগুলি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা ও পরামর্শ দান।
(খ) গ্রাম উন্নয়নের সাথে যুক্ত কর্মীদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা।

পরিচালন ব্যবস্থা—

এই সংস্থার পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল রয়েছে যার সভাপতি হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী নিজেই। সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ১১ জনের একটি কমিটি রয়েছে।

(৩) জাতীয় গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন সংস্থা (NRRDA) ঃ

এটি হচ্ছে আর একটি স্বশাসিত সংস্থা, যার কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGRY) প্রকল্পের রূপায়ণে প্রযুক্তিগত ভাবে উপদেশ প্রকল্পের গুণবিচার, কাজের গুণবিচার করার জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ, তত্ত্বাবধান ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখা ও মন্ত্রণালয়কে সময়মত জানানো।

৪.৩. রাজ্যস্তরে গ্রাম উন্নয়ন পরিকাঠামো

রাজ্যস্তরে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর রয়েছে যারা গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণ করে। এ ছাড়া প্রতিটি জেলায় জেলায় গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে যারা জেলা স্তরে গ্রাম উন্নয়নের কাজ দেখাশুনা ও সম্পাদন করছেন।

(রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা)

১। State Institute for Panchayet & Rural Development (S.I.P.R.D.)

প্রতিটি রাজ্যে একটি করে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা রয়েছে। এটি স্বশাসিত সংস্থা এর পরিচালন

ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের আধিকারিক, পঞ্চায়েত আধিকারিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। প্রতিদিনের কাজ দেখার জন্য একজন অধিকর্তা এবং তার সাথে আরও কিছু আধিকারিক কাজ করছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল ঃ

(ক) ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আইনগত ও অন্যান্য সাহায্য করা।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা।

(গ) গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের জন্য যে যে জিনিষের প্রয়োজন তার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(ঘ) দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের জন্য শ্রমদিবস তৈরি করা ও স্বনির্ভর করা।

(ঙ) গ্রামের মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের সেবা করা।

(চ) প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

(ছ) সামাজিক ও বাহ্যিক পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো।

(জ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

(ঝ) সামাজিক অন্যান্য যে সকল সংগঠন আছে তার সাথে মেলবন্ধন ও সুসম্পর্ক স্থাপন।

২। জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (DRDA)

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সাথে সাথে জেলাস্তরে গ্রাম উন্নয়নের কাজ রূপায়ণ ও দেখাশুনা করার জন্য জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে। এই সংস্থাটি ২০০০ সালের এপ্রিল মাস থেকে জেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার কাজ ঃ

প্রাথমিকভাবে এই সংস্থা স্থানীয় কোনো বেসরকারি সংগঠনের সহযোগিতায় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য SHSY প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা নেয়। স্বেচ্ছায় কাজ করছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ, ঋণ কারিগরি সহায়তা ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া এই সংস্থা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের অন্তর্গত অর্থ পায় যেমন IAY, SGRY PMGRY, NREGA ইত্যাদি।

৪.৪. সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)

৪.৪.১. প্রস্তাবনা ঃ

ভারতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই হল খাদ্যে নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির তুলনামূলকভাবে ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে একটি পরিকল্পনা থেকে পাঁচ বছর পর অন্যটিতে যাবার মধ্যে বেকার ও আংশিক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

বর্তমান দারিদ্র্য, বেকার ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধীর গতির বিরুধে এবং খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে নীচের দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। প্রথমত গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুত করতে গ্রামস্তরে চাহিদা নির্ভর পরিকাঠামো তৈরি করা এবং দ্বিতীয়ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ই আগস্ট ২০০১, গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত মজুরিকৃত কর্মসংস্থান পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে কার্যকরি হয় একটি নূতন প্রকল্প যার নাম দেওয়া হয় "সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)" এই প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা চালু কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (ই. এ. এম.) থেকে যা,

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ MSW-10 \ MSW(10)2 P6.5 # Final Proof # 1-3-07

গ্রামাঞ্চলে একমাত্র মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (জে. জি. এম. ওয়াই.) যা গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এই দুইটি প্রকল্পের পর্যালোচনা করে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে।

৪.৪.২. উদ্দেশ্য ঃ

১.১ সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)-র উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

(ক) মুখ্য উদ্দেশ্য—
গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং খাদ্যের নিরাপত্তা দান করে পুষ্টি স্তরকে উন্নীত করা।

(খ) গৌণ উদ্দেশ্য—
সমষ্টিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো।

৪.৪.৩. প্রকল্পের অবস্থান

এই প্রকল্পটি অনুদান ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে রূপায়িত হয়। মোট অর্থের ৭৫ শতাংশ বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার বাকি ২৫ শতাংশ বহন করে রাজ্য সরকার। খাদ্যশস্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাশিত অঞ্চলে বিনা ব্যয়ে প্রদান করা হয়।

৪.৪.৪. অভিষ্ট দল

গ্রামের যে সকল দরিদ্র মানুষ তাদের অথবা গ্রামসংলগ্ন অঞ্চলে মজুরির বিনিময়ে কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কায়িক ও অদক্ষ কাজ করতে আগ্রহী, স্ব-অভিষ্ট এই প্রকল্প (এম. জি. আর. ওয়াই.) তাদের সকলের জন্য।

মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রদানের সময় কৃষিমজুর, অদক্ষ, অ-কৃষিমজুর, প্রান্তিক চাষি, মহিলা, তফশিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষজন এবং শিশুশ্রমিকদের পিতামাতা (যাদের বিপজ্জনক বৃত্তি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে), প্রতিবন্ধী শিশুদের পিতামাতা অথবা প্রতিবন্ধী পিতামাতার প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের (যারা মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে ইচ্ছুক) গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪.৪.৫. কর্মসূচি রূপায়ণের কৌশলগুলি হল ঃ

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য, নিয়মিত খরাপ্রবণ ও বন্যাপীড়িত অঞ্চলে প্রতিরোধ পদক্ষেপ নেবার জন্য সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনায় ৫ শতাংশ অর্থ ও খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক মজুত রাখে। যে সকল জেলা অধিকতর ভালো কাজ করবে তাদের উপরি-উক্ত ৫ শতাংশ অর্থ ও খাদ্যশস্য থেকে সঞ্চিত অংশ বণ্টন করা।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে জরুরিভিত্তিতে মোকাবিলার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মজুরিভিত্তিক প্রকল্পগুলির অধীন এস. জি. আর. ওয়াই.-এর বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করা।

(গ) এস. জি. আর. ওয়াই.-এর অবশিষ্ট অর্থ ও খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত দুটি ধারায় দেওয়া হয়—

(১) প্রথম ধারা — এই ধারাটি জেলা ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে রূপায়িত হয়। এই ধারায় বরাদ্দকৃত ৫০ শতাংশ অর্থ ও খাদ্যশস্য জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৪০.৬০ অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

(২) দ্বিতীয় ধারা — এই ধারা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রূপায়িত হয়। বরাদ্দকৃত ৫০ শতাংশ অর্থ ও খাদ্যশস্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে গ্রামপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

(ঘ) এই কর্মসূচিটি পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

৪.৪.৬. মজুরি ও খাদ্যশস্যের বণ্টন ঃ

(১) এই প্রকল্পে মজুরির অংশ হিসেবে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়।

প্রতি শ্রমদিবসের জন্য ৫ কিলোগ্রাম হারে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। যদি কোনো রাজ্য প্রতি শ্রমদিবসের জন্য ৫ কিলোগ্রামের বেশি খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন সেটা রাজ্য বরাদ্দ থেকেই করতে পারেন। তবে শর্ত হল মোট মজুরির ন্যূনতম ২৫ শতাংশ নগদ দিলেই হবে। মজুরির অবশিষ্টাংশ শ্রমিকদের নগদ অর্থ এমন ভাবে দেওয়া হয় যাতে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা যায়। শ্রমদিবসের অধিকতর ব্যবহার এবং খাদ্যশস্যের অধিকতর দাম নির্ধারণের ফলে নগদ অর্থের সাশ্রয় হয় যা সমষ্টিগত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য উপকরণের খরচ মেটাতে ব্যবহার করা যায়।

ন্যূনতম মজুরি—

— রাজ্য সরকার এই কর্মসূচির অধীন পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণির শ্রমিককেই একই হারে মজুরি দেয়।

৪.৪.৭. সম্পদ ব্যবহারের মাপকাঠি —

৪.৪.৭.১. এস. জি. আর. ওয়াই. আওতাভুক্ত সম্পদের কোনো আংশিক নির্দিষ্টকরণ করা যায় না। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে বার্ষিক বণ্টনের ২২.৫% দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা তফশিলি জাতি/আদিবাসিদের জন্য ব্যক্তিগত সুবিধা প্রকল্পে ব্যয় করতে হয়। তফশিলি জাতি/আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত অর্থ তহবিল অন্য ব্যয় অনুমোদন করা যাবে না।

৪.৪.৭.২. তপশিলি জাতি/আদিবাসীদের জন্য ব্যক্তি উপভোক্তা বিষয়ক প্রকল্প —

তপশিলি জাতি / আদিবাসীদের জন্য সুবিধা কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত কর্মসূচি সম্পদের ২২.৫% ব্যক্তিগত কর্মে ব্যবহৃত হয়। তপশিলি জাতি/আদিবাসী শ্রেণিভুক্ত চিহ্নিত ব্যক্তিদের সুবিধাদানের জন্য যে সকল কর্ম প্রকল্প নেওয়া হয়—

(ক) পাট্টা দেওয়া সরকারি জমির উন্নয়ন।

(খ) তপশিলি জাতি/আদিবাসী শ্রেণিভুক্ত পরিবারের ব্যক্তিগত জমিতে জ্বালানি কাঠ ও গবাদিপশুর খাদ্য চাষ।

(গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা তপশিলি জাতি/আদিবাসী শ্রেণিভুক্ত মুনাযের ব্যক্তিগত জমিতে কৃষি উদ্যান, পুষ্প উদ্যান তৈরি ও পালন।

(ঘ) যে-কোনো স্বনিযুক্তি কর্মসূচির ক্ষেত্রে কারখানা কিংবা পরিকাঠামো।

(ঙ) সেচের জন্য উন্নত সেচ কূপ বা ছিদ্র কূপ তৈরি।

(চ) মৎস্যচাষের জন্য প্রাথমিক সহায়তা নিয়ে পুকুর খনন/পুনঃখনন।

(ছ) অন্যান্য টিকিয়ে রাখা উপার্জনক্ষমসম্পত্তি তৈরি।

(জ) বাসগৃহ তৈরি।

(ঝ) স্যানিটারি পায়খানা ও ধোঁয়াহীন চুল্লি (বিশেষ পরিস্থিতিতে) তৈরি।

কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্পদের সুবিধা দেওয়ার সময়, কর্ম প্রকল্পে তার অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা জরুরি।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

৪.৫. জাতীয় গ্রমীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি ২০০৬ (NREGS) (National Rural Employment Gurentee Scheme)

৪.৫.১. প্রস্তাবনা ঃ

২০০৫-এর ৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন ২০০৫ প্রকল্প চালু করেন। চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের অদক্ষ শ্রমিকের কাজ দেওয়ার গ্যারান্টির উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রথম কোনো কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজ দেওয়ার ও কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এই আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী আইনের বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রত্যেক রাজ্য ৬মাসের মধ্যে একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প তৈরি করবে।

৪.৫.২. উদ্দেশ্য ঃ

যেসব গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক, সেইরকম প্রত্যেক পরিবারকে প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী বছরে অন্তত ১০০ দিনের কাজ দেওয়া।

গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা এবং

গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ভিত্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

৪.৫.৩. কীভাবে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে?

প্রকল্প শনাক্তকরণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম সংসদ ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা।

প্রধানত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়িত করা এবং প্রয়োজনে সরকারি দপ্তর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলিকে রূপায়ণকারী সংস্থার দায়িত্ব দেওয়া ও প্রয়োজন হলে স্বনির্ভর দলের বা স্বনির্ভর দলগুলির জোটের সাহায্য নেওয়া।

প্রকল্পটি যথাযথ রূপায়ণের চূড়ান্ত দায়ভার জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (জেলা শাসক) ও প্রোগ্রাম অফিসারের (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক) ওপর ন্যস্ত।

সাধারণভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে বেনিফিশারি কমিটি হিসেবে ব্যবহার করা এবং ঐ সমিতিকে তদারকি ও সামাজিক নিরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া।

তৃণমূলস্তর পর্যন্ত সবাইকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করা।

৪.৫.৪. কী ধরনের কাজ করা যাবে?

(ক) জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়—

পুকুর খনন ও সংস্কার।

চেক বাঁধ তৈরি করে জল সংরক্ষণ করা।

ভূগর্ভস্থ বাঁধ নির্মাণ

তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমিতে, নথিভূক্ত বর্গাদারের জমিতে, ইন্দিরা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের জমিতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমিতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

(খ) খরা প্রতিরেধ—

জলবিভাজিকা উন্নয়ন।

বনসৃজন ও বৃক্ষরোপণ।

নার্সারি তৈরি ও সমস্ত ব্যবস্থা।

(গ) ক্ষুদ্র ও ছোটোখাটো সেচের কাজসহ খাল—

কৃষিজমিতে জল পৌঁছোনোর জন্য শাখা খাল (Feeder Cannel) ও মাঠের খাল (Field Cannel) খনন।

সেচসেবিত এলাকা বাড়ানো।

সেচের জন্য অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা।

(ঘ) তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমিতে, নথিভূক্ত বর্গাদারের জমিতে, ইন্দিরা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের জমিতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা।

(ঙ) পানীয় জলের উৎস সংস্কার—

জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের উৎস, যথা— পাতকুয়া ও অন্যান্য চিরাচরিত জলাধারগুলির সংস্কার।

ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সংস্কার (যদি মালিকপক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে বাড়তি জল জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দিতে রাজি থাকেন) এ বিষয়ে এস. জি. আর. ওয়াই. এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা অনুসরণ করা।

(চ) ভূমি উন্নয়ন—

তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমি, নথিভুক্ত বর্গাদারের জমি, ইন্দিরা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের জমি এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমি উন্নয়ন যাতে তা চাষের জন্য বেশি উপযুক্ত হয়।

গ্রামীণ আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের জমি।

গ্রামীণ হাট বাজারের জমি।

খেলার মাঠ উন্নয়ন ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ।

(ছ) জলমগ্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থাসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কাজ।

(জ) সব ঋতুর উপযোগী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা P.M.G.S.Y. প্রকল্পে রাস্তায় মাটির কাজ।

(ঝ) রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য কাজ।

এই প্রকল্প পরিচালনার জন্য অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবে এভাবে—

উপকরণ ও অদক্ষ শ্রমিকের সম্পূর্ণ মজুরি।

উপকরণ ও দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হিসাবে মোট যা ব্যয় হবে তার ৭৫% এবং নির্ধারিত প্রশাসনিক ব্যয়।

দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হিসাবে মোট যা ব্যয় হবে তার ২৫% এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দেয়।

রাজ্য সরকার সময়মত কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা।

রাজ্য কর্মসংস্থান গ্যারান্টি পরিষদের প্রশাসনিক ব্যয়।

নাম নথিভুক্তকরণের নিয়ম হল এরকম—

নির্ধারিত ফর্মে (১৮ বছর বা তার উপরে) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী এমন পরিবারের কর্তা বা যে-কোনো সদস্য আবেদন করতে পারে।

৪.৬. ইন্দিরা আবাস যোজনা (Indira Awaas Yojona or I.A.Y.)

১৯৮৫-৮৬ সালে এই প্রকল্প আর. এল. জি. পি.-র উপপ্রকল্প হিসেবে চালু করা হয় এবং ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে ৩১.১২.১৯৯৫ পর্যন্ত জে. আর. ওয়াই.-এর উপপ্রকল্প হিসাবেই চালু ছিল। ১.১.১৯৯৬ থেকে উপপ্রকল্পটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য ঃ

ইন্দিরা আবাস যোজনার (আই. এ. ওয়াই.) প্রাথমিক লক্ষ্য হল, অনুদান বাড়িয়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তফশিলিজাতি/উপজাতি, দাসত্বমুক্ত শ্রমিক এবং তফশিলিজাতি/উপজাতি (S.C./S.T.) নয় এমন গ্রামীণ দরিদ্রের জন্য নতুন বাসগৃহ নির্মাণ এবং সেইসঙ্গে বসবাস অযোগ্য কাঁচা ঘরকে পাকা/আধাপাকা ঘরে রূপান্তরিত করা।

সুযোগ ঃ

১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে কেবলমাত্র দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত তফশিলি জাতি ও আদিবাসীভুক্ত এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসশ্রমিকদের পরিবারগুলির জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা যেত। ১৯৯৩ থেকে এস. সি. এস. টি. পরিবার, বিধবা/অবিবাহিতা মহিলার অধীনে থাকা পরিবার এবং ১৯৯৫-৯৬ থেকে এই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় যুদ্ধে নিহত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ১৯৯৯-এর ১লা এপ্রিল থেকে বসবাস অযোগ্য কাঁচাবাড়িকে পাকা/আধাপাকা বাসগৃহের রূপান্তরের বিষয়টিকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তহবিল ঃ

ইন্দিরা আবাস যোজনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানপুষ্ট প্রকল্প। ভারত সরকার ও রাজ্যের মধ্যে ৭৫ ঃ ২৫ অনুপাতে ব্যয় ভাগাভাগি হয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পুরো অর্থই ভারত সরকার দিয়ে থাকে।

কর্মপন্থা ঃ

বাড়ি নির্মাণের জন্য সমতলে ইউনিটপিছু ২০,০০০ টাকা এবং পার্বত্য ও দুর্গম অঞ্চলে ২২,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। কাঁচাবাড়িগুলিকে পাকা/আধাপাকা গৃহে রূপান্তরের জন্য ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। পাকা শৌচাগার এবং ধূমহীন চুল্লি বা উনুন বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাড়ি নির্মাণ বা উন্নয়নের ব্যয় সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি, সামগ্রী, নকশাকে উৎসাহিত করা হয়। সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে বাড়িটি অনুমোদিত হয়। বিকল্প হিসেবে স্বামী আর স্ত্রী যৌথভাবে বাড়ির মালিকানা পেতে পারে।

এই প্রকল্পের অধীনে সাহায্য পেতে ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রামস্তরের কর্মী বা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৪.৭. জলবিভাজিকা উন্নয়ন

৪.৭.১. জলবিভাজিকা বলতে কী বোঝায়?

ওয়াটার শেড (Water shed) শব্দটির নিকটতম প্রতিশব্দ ওয়াটার ডিভাইড (Water divide)। এগুলির আক্ষরিক অর্থ হল জলবিভাজিকা বা জল বিভাজন রেখা। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ওপর সংকীর্ণ ও দীর্ঘায়িত উঁচু জমি যার ওপর বৃষ্টির জল পরে দু-দিকে ভাগ হয়ে যায় এবং নিকাশি ধারায় নিচু অঞ্চলের দিকে গড়িয়ে যায়। জলবিভাজিকা হল ঐ নিকাশি পথযুক্ত একটি ভৌগোলিক এলাকা। গড়পড়তা ৫০০ হেক্টর বা কিছু বেশি এলাকা নিয়ে একটি জলবিভাজিকা।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

৪.৭.২. জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প কী?

জলবিভাজিকা উন্নয়ন বলতে বোঝায় জলবিভাজিকা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, পুনঃসৃষ্টি ও যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়। বনভূমি ধ্বংস হলে মাটি উন্মুক্ত হয়, ভূমিক্ষয় ঘটে, বৃষ্টিপাতকে ধরে রাখতে পারে না, ও ভূগর্ভস্থ জলকে পুনর্ব্যবহার করা যায় না। ক্রমে জায়গাটির পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও নীচু হয়ে যায়। জীবিকা অবলম্বনের অভাবে মানুষজন সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। একারণেই মূলগতভাবে জলবিভাজিকা উন্নয়ন বলতে বৃষ্টির জল ধরে রাখাকে বোঝায়। জল থাকলেই মাটির আর্দ্রতা ফিরে আসবে, ফিরে আসবে মাটির ওপর সবুজের আচ্ছাদন, সেখানে বনসৃজন করা যাবে এবং এভাবে উর্বর মাটির স্তর তৈরি হবে এবং তাকে ধরে রাখা যাবে। কৃষি, মৎস্যচাষ, পশুপালন, রেশমচাষ ও বিভিন্ন কুটিরশিল্প ইত্যাদির ন্যায় কাজকর্মের মাধ্যমে জনগণের দারিদ্র্য মোচন ঘটবে এবং একটা সমৃদ্ধ জনজীবন তৈরি হবে। তবে একাজে সকলকে সহভাগী হতে হবে আর প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ। সংরক্ষণ হবে একাজের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

৪.৭.৩. জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য

হরিয়ালী আওতায় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ বৃষ্টির জলের প্রতিটি বিন্দুকে সেচ, উদ্যানপালন এবং ফুলচাষসহ কৃষিকাজ, চারণ ভূমির উন্নয়ন, ভেড়ি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা, যাতে করে গ্রামীণ জনগণের আয়ের স্থায়ী উৎস এবং সেই সঙ্গে পানীয় জলের স্থায়ী উৎস গড়ে তোলা যায় এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও পরিচালন থেকে পঞ্চায়েতের নিয়মিত আয়ের উৎস গড়ে ওঠে।

(খ) মাটির ওপরের স্তরে জল ধরে রাখার মাধ্যমে, জলবিভাজিকা অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। এর ফলে মাটির আদ্রতা বাড়বে এবং বনসৃজন এবং উদ্যানপালনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ হবে। এ ছাড়া জলবিভাজিকা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য আসবে।

(গ) গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে জলবিভাজিকা অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(ঘ) মানুষ, গবাদিপশু ও চাষবাসের ওপর খরাজনিত চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা।

(ঙ) অর্জিত সম্পদের ব্যবহার ও তত্ত্বাবধান ও জলবিভাজিকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধতর করে তোলার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মোদ্যমের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের উৎসাহী করে তোলা।

(চ) জলবিভাজিকা অঞ্চলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং ব্যবহারকারী গোষ্ঠী গঠনের ব্যাপারে মদত দেওয়া।

(ছ) স্থানীয় কারিগরি প্রযুক্তি ও সামগ্রীর সাহায্যে জলবিভাজিকা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যধারার মধ্যে সহজ ও কম খরচের প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

(জ) এটি নিশ্চিত করা যাতে পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মধারার পরিকল্পনা রূপায়ণ ও সৃষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ করা হয়। যাতে সেখানে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই বা যাঁরা ঐ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল ভোগ করেন তারা প্রকল্পটিকে নিজেদের বলে মনে করেন এবং তাকে স্থায়িত্বদান করতে অকুণ্ঠ সমর্থন জোগান।

৪.৭.৪. জলবিভাজিকাগুলির নির্বাচনের মাপকাঠি

(ক) সেই সব জলবিভাজিকা যেগুলির উন্নয়নের শ্রম, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং সৃষ্টি সম্পদের পরিচালন ও তদারকিতে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত থাকে।

(খ) যেসব জলবিভাজিকা অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে।

(গ) যেসব জলবিভাজিকার ওপর বিরাট সংখ্যক তফশিলি জাতি ও আদিবাসী জনগণ নির্ভরশীল।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

(ঘ) যেসব জলবিভাজিকায় অরণ্যহীন পতিত জমি/নিকৃষ্ট জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

(ঙ) যেসব জলবিভাজিকায় সর্বসাধারণের জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি।

(চ) যেসব জলবিভাজিকায় প্রকৃত সর্বনিম্ন মজুরি অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম।

(ছ) যেসব জল বিভাজিকার পার্শ্ববর্তী অন্য জলবিভাজিকার ইতিমধ্যেই সংস্কার হয়েছে।

(জ) গড় আয়তন হতে পারে ৫০০ হেক্টর।

৪.৭.৫. জলবিভাজিকা উন্নয়ন যজ্ঞের কাজকর্ম

(ক) স্বল্প ব্যয়ের খামার, পুকুর, নালা, বাঁধ, নিঃসরণ জলাধার এবং অন্যান্য ভূগর্ভস্থ জলের পুনসঞ্চারণ প্রক্রিয়ার মত ক্ষুদ্র জলসংস্করণ ও উত্তোলন কাঠামোর উন্নয়ন।

(খ) জলসম্পদের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার, পানীয় জল, সেচ, মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ জলাশয়গুলির পলি কাটা (DESILTATION)।

(গ) গ্রামের পুকুর, জলাশয়, কৃষিখামারের পুকুর ইত্যাদিতে মৎস্যচাষের উন্নয়ন।

(ঘ) ব্লক স্তরে বাগান, কৃষি-বন, উদ্যান পালন ও উন্নয়ন, ছায়াঘেরা বনায়ন তৈরি, বালিয়াড়ি শক্ত করা সহ সামগ্রিক বনসৃজন করা।

(ঙ) বাগান, খেতখামার, আবাদের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেই পশুচারণভূমির উন্নয়ন।

(চ) ইন-সিটু সয়েল (in-situ soil) অর্থাৎ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা ও বনায়নের সাহায্যে বাঁধ বরাবর পার্বত্য ভূখণ্ডের স্তরে বৃক্ষরোপণ, পশুখাদ্য, গৃহনির্মাণের কাঠ, জ্বালানি কাঠ, উদ্যান পালন এবং গৃহনির্মানের অনুপযোগী কাঠ ও অন্যান্য বনজ উৎপাদনের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন।

(ছ) যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ ও কারিগরি কাঠামোর মাধ্যমে (জল) নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষণ।

(জ) সর্বোচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী লাভ অর্জনের লক্ষ্যে জলবিভাজিকার বর্তমান সাধারণ সম্পদ ও কাঠামোর মেরামতি, পুনরুদ্ধার ও উন্নতিকরণ।

(ঝ) নতুন নতুন শস্য বৈচিত্র্য অথবা উদ্ভাবনী পরিচালন পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য শস্য প্রদর্শনের আয়োজন করা।

(ঞ) অচিরাচরিত শক্তি ধরে রাখার যন্ত্রপাতি, শক্তি সংরক্ষণের পদ্ধতি জৈব জ্বালানির উদ্দেশ্যে বনায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় উন্নতি এবং প্রচার।

পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করার সময়ে জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংস্কারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজে শুধুমাত্র স্বল্প ব্যয়ের, সরল, স্থানীয় এলাকায় সহজলভ্য প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি যা সহজে চালানো ও রক্ষা করা যায় তাই-ই ব্যবহৃত হয়। সজীব সবুজায়নের ওপরই জোর দিতে হবে। ব্যয়বহুল সিমেন্টের কাঠামো এবং জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা যাবে না।

৪.৭.৬. অর্থসংস্থানের পদ্ধতি

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর মধ্যে তহবিল প্রদানের অনুপাত হচ্ছে আই. ডব্লু. ডি. পি. এর ক্ষেত্রে ১১ ঃ ১ এবং ডি. পি. এ. পি.-এর ক্ষেত্রে ৭৫ ঃ ২৫। বর্তমানে হেক্টর পিছুনির্ধারিত ব্যয় ৬০০০ টাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লিখিত শতাংশের ঊর্ধসীমার শর্তে নিচের প্রকল্প উপাদানগুলির মধ্যে ওই পরিমাণ অর্থ ভাগ করে দেওয়া হবে।

১। জলবিভাজিকা সংস্কার/উন্নয়নমূলক/কর্মকাণ্ড	৮৫%
২। গোষ্ঠীগত চালনা ও প্রশিক্ষণ	০৫%

৩। প্রশাসনিক ব্যয়	১০%
সর্বমোট	১০০%

৪.৮. স্পেশাল কম্পোন্যান্ট প্ল্যান (Special component plan)

৪.৮.১. প্রস্তাবনা

তপশিলি জাতির উন্নয়নের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সমাজের অন্যান্য জাতির মতো এরাও যাতে সমস্ত সুযোগের সদব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

৪.৮.২. রূপায়ণ

এই প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে নিম্নলিখিত উপভোক্তাদের জন্য।

(ক) দারিদ্র্য সীমার নীচে সববাসকারী, তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য।

(খ) পরিবারের বার্ষিক আয় ১৯৬৫৪ টাকা (গ্রামাঞ্চলে) এবং ২৭২৪৭ টাকার (শহরাঞ্চলে) মধ্যে হতে হবে।

(গ) এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পভিত্তিক প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) কোনো ব্যাংক বা সমবায় সমিতির ঋণ খেলাপি হওয়া চলবে না।

৪.৮.৩. সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঋণদান করা হয়

(ক) কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প,

(খ) পশুপালন প্রকল্প,

(গ) মৎস্যচাষ প্রকল্প,

(ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রকল্প,

(ঙ) ব্যাবসা প্রকল্প,

(চ) পরিবহন ও অন্যান্য প্রকল্প।

এস. সি. পি. বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল নিগম তার শেয়ার মূলধন থেকে নামমাত্র সুদে বার্ষিক ৪% প্রান্তিক ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকল্পে তিনভাগে এই অর্থ প্রদান করা হয়—

(ক) ভরতুকি

(খ) প্রান্তিক ঋণ

(গ) ব্যাংক ঋণ

বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের ব্যয়

বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের জন্য সর্বাধিক প্রকল্প ব্যয় ৩৫০০০ টাকা। কিন্তু ১২০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ২% সর্বাধিক ২০০০ টাকা প্রান্তিক ঋণ হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়ের ৫০% সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা অনুদান বা ভরতুকিরূপে পাওয়া যায়। প্রকল্পের বাকি অংশ স্থানীয় ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়।

৪.৮.৪. বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের জন্য তহবিল মূলত চারটি জায়গা থেকে আসে

(ক) রাজ্য পরিকল্পনা থেকে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে।

(গ) কেন্দ্রের বিশেষ সহায়তা।

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল।

৪.৯. ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান (TSP)

৪.৯.১. প্রস্তাবনা

আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান নামে এক ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী যে সমস্ত ব্লকে ৫০% এর বেশি আদিবাসী বাস করে সেই এলাকাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। কয়েকটি ব্লককে নিয়ে একটি এলাকা গঠন করা হয় এবং সেই এলাকাকে একটি সার্বিক আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের (Integreted Tribal Development Project) আওতায় আনা হয়। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং বিহারের মত আদিবাসীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই সব রাজ্যে ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান খুবই কার্যকরী হয়। অন্যান্য যে সব রাজ্যে আদিবাসীর সংখ্যা তুলনায় কম, সেখানে কম এলাকা এর আওতায় আসে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসামে ২০,০০০ জনসংখ্যা আছে এমন এলাকাকে উন্নয়নের একক হিসেবে ধরা হয়। তামিলনাড়ু কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশে ১০,০০০ জনসংখ্যাপিছু এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে আদিবাসী অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়।

১৯৭৬ সালের শেষের দিকেই ১৭টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কর্মসূচি চালু হয়। ২৬টি জেলা সম্পূর্ণভাবে এবং ৯৭টি জেলা আংশিকভাবে এর আওতাভুক্ত হয়। মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলি, লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি স্থানে অধিকাংশ মানুষ আদিবাসী হওয়ায় আলাদা ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান-এর প্রয়োজন হয়নি, কারণ সেখানে আদিবাসী জনগণের কথা মাথায় রেখেই সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৪.৯.২. ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান-এর রীতি

(ক) ITDP সেখানেই হবে যে সমস্ত জেলার কোনো তালুকে ৫০% এর বেশি সংখ্যায় তপশিলি উপজাতি রয়েছে।

(খ) বিশেষ বিশেষ এলাকা যেখানে ১০,০০০ জনসংখ্যার ৫০% বা তার বেশি তপশিলি উপজাতি রয়েছে।

(গ) আদিম জনজাতির জন্য বিশেষ প্রকল্প।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তপশিলি উপজাতির মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচির ভিতর দিয়ে ৫০% তপশিলি উপজাতিকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় সকল এলাকায় ৫০০০ জনসংখ্যা এবং তার কমপক্ষে ৫০% তপশিলি উপজাতি সেখানে এই কর্মসূচি কার্যকরী হয়।

৪.৯.৩. উদ্দেশ্য

(ক) পারিবারিক উপভোক্তা কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেমন— চাষবাস, উদ্যান, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন।

(খ) শোষণ, বঞ্চনা, জমি হস্তান্তর, ঋণ ইত্যাদি থেকে আদিবাসীদের মুক্ত করা।

(গ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো।

(ঘ) আদিবাসী এলাকায় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি।

এই কর্মসূচি পরিচালনার জন্যও অর্থের জোগান হয়—

(ক) রাজ্য পরিকল্পনা থেকে।

(খ) কেন্দ্রের বিশেষ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে।

(গ) প্রতিষ্ঠানিক তহবিল থেকে।

৪.১০. খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prove Area Programme)

প্রস্তাবনা ঃ

ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশ চাষযোগ্য জমি হচ্ছে সেচের আওতায়। ভারতের বেশিরভাগ এলাকায় খরা নিত্য ঘটনা। যদিও এই এলাকাতেই খাদ্যশস্য, ডাল, শস্য, তৈলবীজ এবং তুলা উৎপন্ন হয়। জল, ভূমিক্ষয় ও উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে এই সব এলাকায় ফলনশীলতা খুবই কম।

ভারতবর্ষে খরা হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যখন একটি বৎসরে সাধারণ বৃষ্টিপাতের থেকে ৭৫% কম হয় সেই অবস্থা। যদিও অনেক সময় ২৫-৫০% কম বৃষ্টিপাত হলেও সেই এলাকাকে খরা ঘোষণা করা হয়।

প্রকল্পের সূচনা ঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ও ডি. পি. এ. পি. প্রকল্প রূপায়ণের আগে রাস্তা মেরামত, ড্রাই ফার্মিং ও রুরাল ওয়ার্কস এই প্রকল্পগুলি চালু ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে সার্বিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Area Development Programme) রূপে ডি. পি. এ. পি. শুরু হয়।

এই প্রকল্পের মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি হল ঃ

(ক) মোট জনসংখ্যার ১২% ও মোট এলাকার ১৯% এর আওতায় আসে।

(খ) খরার কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য লক্ষ করা যায়। কম ফলন ও বেকারত্বের জন্য এই সব এলাকার মানুষ অন্য জায়গায় তাদের পশুপক্ষী সঙ্গে নিয়ে কাজে যেতে বাধ্য হয়।

(গ) জাতীয় অর্থনীতিতে এইসব এলাকা সব সময় চিন্তায় রাখে।

পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে পিছিয়ে পড়া এলাকা উন্নয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটিও সুপারিশ করেন যে জলবিভাজিকা উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু উন্নয়ন পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

(ক) জমির মাটি, জল ও আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে শস্যপর্যায় ঠিক করা।

(খ) জল ও মাটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও ভূমি ব্যবহারের সঠিক ব্যবস্থা করা।

(গ) বনসৃজন ও কৃষিবন তৈরি করা।

(ঘ) প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন - গোচারণ ভূমি ও গোখাদ্যের ব্যবস্থা ও উন্নয়ন করা।

(ঙ) আরও পারিপার্শ্বিক কিছু কাজ যেমন— ফল ও সবজি চাষ, তসর চাষ ও মাছ চাষ ইত্যাদি।

তিনটি মূল বিষয়ের ওপর ডি. পি. এ. পি. কাজ করে। সেগুলি হল—

(ক) জল ও মাটি সংরক্ষণ এবং ভূমি সমতলীকরণ।

(খ) বনসৃজন ও গোচারণ ভূমির উন্নয়ন।

(গ) জল সম্পদের উন্নয়ন।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

এই প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচিগুলি হল ঃ

(ক) জল সম্পদের উন্নয়ন ঃ

যেহেতু খরা এলাকায় জলই সমস্যা সে জন্য জল ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ছোট জলাধার অথবা কুয়া খুঁড়ে মাটির নীচের জল ব্যবহার।

(খ) জল ও মাটি সংরক্ষণ ঃ

মাটির জলধারণের ক্ষমতা ও বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে যাওয়ার সময় যে ভূমিক্ষয় হয় সেটা রোধ করা। যে কাজগুলি হয় সেগুলি হল কন্টুর বাইন্ডিং, গালি কন্ট্রোল এবং ছোটো কৃষিপুকুর তৈরি করা।

(গ) পশুপালন ঃ

এই কর্মসূচিতে পশুপক্ষী সরবরাহ ছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন সমবায় তৈরি এবং পশুখাদ্য উন্নয়ন।

(ঘ) বনসৃজন ঃ

বনসৃজনের মাধ্যমে কৃষিবন, পুকুরের পাড়ে ক্যানেল, রাস্তার ধারে ও যে সমস্ত এলাকায় জঙ্গল নষ্ট হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় গাছ লাগানো।

(ঙ) গোখাদ্য ও গোচারণ ভূমির উন্নয়ন ঃ

যেহেতু গ্রামের দিকে বিশেষ করে খরা এলাকায় গোচারণভূমি ও গোখাদ্য একটি বিশেষ সমস্যা সেজন্য এই সমস্ত এলাকায় যেখানে চাষ আবাদ সম্ভব নয় সেখানে গোচারণভূমি ও গোখাদ্যের উন্নয়ন ঘটানো।

(চ) শস্যপর্যায় ঃ

জল ও মাটির অবস্থা অনুযায়ী শস্যপর্যায় নির্বাচন করে চাষের ব্যবস্থা করা।

৪.১১. রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা

প্রস্তাবনা ঃ

ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া জেলার উন্নয়নের লক্ষ্যে ''রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা'' নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সব এলাকায় দারিদ্র্যের হার খুব বেশি, উন্নয়ন কম এবং অপ্রতুল পরিচালন ব্যবস্থা সেখানে উন্নয়নের যে বাধাগুলি আছে সেগুলি দূর করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং অসাম্য দূর করা।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

(ক) কৃষির উৎপাদনে যে বাধা আছে তা দূর করা।

(খ) বেকারত্ব দূর করা।

(গ) সামাজিক ও বাহ্যিক পরিকাঠামোর যেখানে অভাব আছে তা পূরণ করা।

এই প্রকল্পের জন্য যে পরিমাণ তহবিল পাওয়া যায় তা হল ঃ

প্রতিটি জেলা বছরে ১৫ কোটি টাকা এবং তিন বছরে মোট ৪৫ কোটি টাকা পাবে। এই টাকার ১০০% কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে।

রাজ্য সরকার এই টাকা জেলা গ্রাম উন্নয়ন এজেন্সিকে দেবে।

প্রাথমিকভাবে পিছিয়ে পড়া জেলার তালিকা থেকে ১০০টি জেলাকে এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে জেলাগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

(ক) প্রতিটি কৃষি শ্রমিকের কাজের মূল্য।

(খ) কৃষিতে মজুরির হার।

(গ) জেলাতে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির শতকরা হার। এ ছাড়া
(ঘ) যে সমস্ত এলাকা উগ্রপন্থীর শিকার।

৪.১২. প্রকল্পের তদারকি ও মূল্যায়ন

জাতীয় স্তর মনিটর ঃ

প্রকল্প রূপায়ণে স্বচ্ছতা ও কাজের গুনাগুণ ঠিক রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্তরে তদারকিদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন সেখানে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ সরকারি কর্মচারীরা প্রকল্প কীভাবে তৃণমূলস্তরে রূপায়ণ হচ্ছে তা দেখেন। প্রকল্প রূপায়ণ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে সেগুলি দেখার জন্যও এই সকল তদারকিদের কাজে লাগানো হয়।

জেলাস্তরের তদারকি ঃ

পরীক্ষামূলক ভাবে সারা দেশের ২৬টি রাজ্যের মধ্যে ১২৮টি জেলায় স্থানীয়ভাবে স্বাধীন কোনো সংস্থাকে দিয়ে গ্রাম উন্নয়ন কাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে।

মূল্যায়ন কাঠামো ঃ

গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ফলে গ্রাম এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তার কী প্রভাব হচ্ছে তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ কোনো স্বাধীন সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে মূল্যায়ন করানোর ব্যবস্থা আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূলস্তরে কর্মসূচি কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে তা দেখা ও মধ্যবর্তী কোনো সমস্যা থাকলে তার সংশোধন করা।

৪.১৩. প্রশ্নাবলি

১। কেন্দ্রীয় স্তরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
২। ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যানের উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন।
৩। জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প কী এবং কেন? এতে কী উপকার হতে পারে?
৪। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

M - 3 # D:\ Jobs \ Netaji 07 \ **MSW-10 \ MSW(10)2** P6.5 # Final Proof # 1-3-07

একক—৫ ❑ পঞ্চায়েতি রাজ

গঠন

৫.১. প্রস্তাবনা

৫.২. ধারণা

৫.৩. ঐতিহাসিক বিকাশ

৫.৪. গঠন

৫.৫. স্বাভাবিক কার্যাবলি

৫.৬. বিধান সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত

৫.৭. জনগণের অংশভাগীতার প্রয়োজনীয়তা

৫.৮. পঞ্চায়েতের প্রভাব

৫.৯. সমস্যা

৫.১০. গ্রন্থপঞ্জি

৫.১১. প্রশ্নাবলি

৫.১. প্রস্তাবনা

পঞ্চায়েতি রাজ্য ব্যবস্থাটি ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকরী এক ব্যবস্থা। সকল শ্রেণির মানুষই এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বের সপ্রশংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং সাফল্যের সঙ্গে তা পরিচালনা করা তার মধ্যে অন্যতম। এত বৃহৎ এক গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা যথেষ্ট কঠিন কাজ, বিশেষত যখন এ দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর এবং বহু গ্রাম মরুভূমি, দ্বীপ, জঙ্গল ও পাহাড়ে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ সমস্যার শিকার। এত অসুবিধাকে কাটিয়ে উঠে সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থা কার্যকরী রাখতে পারার জন্যই পঞ্চায়েতি রাজ বর্তমানে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

৫.২. ধারণা

পঞ্চায়েত হল গ্রামভিত্তিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যা ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত। এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মানুষের অংশভাগীতার মধ্য দিয়ে এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ করে তা দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। পঞ্চায়েতকে তাই বলা যেতে পারে নাগরিকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

৫.৩. ঐতিহাসিক বিকাশ

পঞ্চায়েতের ভাবগত সূত্রপাত কখন হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, সেগুলির সমাধান সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া, কোনো সামাজিক অন্যায়ের বিচার করার ক্ষেত্রে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভূমিকা নিতেন। গ্রামের পাঁচজন মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতেন তাই মেনে চলতে হত সকলকে। এভাবে

হয়তো অনেকগুলি শতাব্দী কেটে গেছে। বিধিহীন এক গ্রামীণ কাঠামো গ্রামজীবনে শৃঙ্খলারক্ষা এবং সমষ্টিজীবনের পরিমণ্ডল বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষকে সুস্থিতি দিত।

আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় পাঁচের দশকের শেষের দিকে। সমষ্টির সকল সদস্যের উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন ছিল তার লক্ষ্য। অবশ্য এই ব্যবস্থা তখনো সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নিয়ে প্রচলিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলিরও যথেষ্ট সদিচ্ছা ছিল এমন লক্ষণও স্পষ্ট ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে নিয়মমত নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন ও পরিচালনা করার বিধি তখনো চালু করা যায়নি। সরকার অর্থের জোগানও দিত না, কাজের দায়িত্বও নয়।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন যে জরুরি সে বিষয়ে দেশীয় নেতৃবৃন্দ অবহিত ছিলেন। সেজন্য নানা কমিশন গঠিত হয় মূলত সরকারকে এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাবিত পঞ্চায়েতের গঠন কী রকম হবে, ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কী রকম হবে, মেয়াদ, নির্বাচন পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থা, কর্মসূচি, পঞ্চায়েতের এলাকা কী হবে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ৯৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালা রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়। কয়েক বৎসর পর সিংভি কমিটির পরামর্শ অনুসারে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর স্বভাবতই এই প্রতিষ্ঠানটি তৃতীয় স্তরের সরকার হিসেবে গড়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত অনেক বিষয়ে সরকারের মতোই দায়দায়িত্বের অধিকারী হয়েছে। এখন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত ফসল হিসেবে পঞ্চায়েত সারা দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে দেশের সব রাজ্যে একই সময়ে তা গঠিত হয়নি এবং সব রাজ্যে সমানভাবে তা কার্যকরীও নয়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা এবং সাধারণ মানুষের চেতনা ও আগ্রহের পার্থক্যেই এই ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৫.৪. গঠন

পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর। প্রথম বা সর্বনিম্ন স্তরটি হল গ্রাম পঞ্চায়েত। কয়েকটি মৌজা বা গ্রামকে নিয়ে গঠিত হয় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত। জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা দশ থেকে ষোলো জনের মধ্যে থাকতে পারে। বিশেষ প্রেক্ষিতে এই সংখ্যা সামান্য কম বেশি হতে পারে।

পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরটি হল ব্লক পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি। একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে সেগুলিকে নিয়েই একটি পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যেরা ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

পঞ্চায়েতের শেষ বা উচ্চতর স্তরটির নাম জেলা পরিষদ। জেলা স্তরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হল জেলা পরিষদ। জেলা থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যেরা ছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতিরাও পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য।

৫.৫. স্বাভাবিক কার্যাবলি

পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কী হবে, পঞ্চায়েত কতটা ক্ষমতা ভোগ করবে তা মূলত নির্ভর করে রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনের ওপর। সংবিধানে শুধুমাত্র এ ধরনের একটি রূপরেখা দেওয়া আছে।

* অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা রচনা করবে।
* সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রূপায়ণ করবে।

প্রকল্পগুলি কী ধরনের হতে পারে সে বিষয়ে অবশ্য সংবিধানের ১১ নম্বর তফশিলে একটি রূপরেখা দেওয়া আছে। মোট ২৯টি বিষয় তাতে স্থান পেয়েছে। সেগুলিকে মোট সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন,

(১) কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয়
- (ক) কৃষি ও সম্প্রসারণ
- (খ) ভূমি উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ
- (গ) ক্ষুদ্র সেচ
- (ঘ) পশুপালন, মুরগিপালন, ইত্যাদি
- (ঙ) মৎস্যচাষ

(২) বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়
- (ক) সামাজিক বনসৃজন ও খামারবন
- (খ) জ্বালানি ও পশুখাদ্য
- (গ) বন থেকে উৎপাদিত শস্য
- (ঘ) অচিরাচরিত শক্তির উৎস

(৩) শিল্পসংক্রান্ত বিষয়
- (ক) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য ছোটো শিল্প
- (খ) খাদি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প

(৪) পরিকাঠামো, ন্যূনতম চাহিদা, সমাজসেবা সম্পর্কিত
- (ক) রাস্তা, কালভার্ট, ছোটো ব্রীজ ও ফেরিঘাট
- (খ) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ
- (গ) পানীয় জল
- (ঘ) গ্রামীণ বাড়ি তৈরি
- (ঙ) শিক্ষা
- (চ) বৃত্তিমূলক ও প্রকৌশলগত শিক্ষা
- (ছ) বয়স্ক ও বিধিমুক্ত শিক্ষা
- (জ) স্বাস্থ্য ও শৌচাগার নির্মাণ ইত্যাদি
- (ঝ) পাঠাগার নির্মাণ ও পরিচালনা
- (ঞ) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও উৎসব
- (ট) পরিবার কল্যাণ
- (ঠ) গণবণ্টন ব্যবস্থা
- (ড) হাট ও বাজার পরিচালনা

(৫) সমাজকল্যাণ
- (ক) নারী ও শিশুকল্যাণ
- (খ) মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ সমেত সব ধরনের সমাজ কল্যাণ
- (গ) অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি কল্যাণ

(৬) দারিদ্র্য দূরীকরণ

(৭) সমষ্টিসম্পদ রক্ষা করা

এই সাত ধরনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পঞ্চায়েতকে যে সব বিষয়ে নজর দিতে হয় তার মধ্যে ১০৮টি জেলা পরিসদের দায়িত্ব, ৮৭টি পঞ্চায়েত সমিতির এবং বাকি ৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে পঞ্চায়েত নানা প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে। তার মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল ঃ

(ক) জহর রোজগার যোজনা (জে. আর. ওয়াই.) ঃ

এন. আর. ই. পি., আর. এল. ই. জি. পি. এবং বিনিময়ে কাজ এই প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করে উপরি-উক্ত যোজনাটি চালু করা হয়েছে ১৯৮৯ সালে। এই যোজনার উদ্দেশ্য হল—

- গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাড়তি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- গ্রামে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষেরা ধারাবাহিকভাবে কাজের সুযোগ পায়।
- গ্রামীণ মানুষের জীবনের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

এই প্রকল্পের কাজ মূলত তিন ধরনের।

- ভূমি সংরক্ষণ, জমি সমতলীকরণ, সেচের উদ্দেশ্যে ছোটো ছোটো বাঁধ তৈরি, খাল খনন বা সংস্কার, পুকুর ও কূপ খনন বা সংস্কার।
- দরিদ্র পরিবারের জন্য বাড়ি তৈরি করা।
- গ্রামীণ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা-বিদ্যালয়-শৌচাগার-হলঘর-খেলার মাঠ তৈরি করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাক্ষরতা কর্মসূচি, বনসৃজন, নার্সারি, ফলের বাগান ইত্যাদি করা।

এর মধ্যে প্রথম দুটি কর্মসূচি তফশিলি জাতি এবং আদিবাসী সহ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের জন্য এবং তৃতীয় কর্মসূচিটি সকল গ্রামবাসীর জন্য। এই কর্মসূচিতে কাজও পাবে শুধু দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষেরা। এতে আর একটি বিশেষ বিধি আছে। সেটি হল মোট শ্রমদিবসের অন্তত তিরিশ শতাংশ মহিলা শ্রমজীবীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বরাদ্দকৃত অর্থের অন্তত ষাট শতাংশ মজুরি বাবদ খরচ করা বাধ্যতামূলক। বাকি অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা যেতে পারে। এই প্রকল্পের অধীন যে সব কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ন করা হবে তা সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর অংশভাগীতার মধ্য দিয়ে স্থিরীকৃত করাও আবশ্যক।

(খ) কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (ই. এ. এস.) ঃ

গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ সাধারণত বৎসরের সব দিন কাজের সুযোগ পায় না। স্বভাবতই চরম দারিদ্র্যের শিকার হতে হয় তাদের। সাধারণভাবে বৎসরের যে সময় কাজের সুযোগ তেমন থাকে না তখনও যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচির দ্বিতীয় লক্ষ হলো গ্রামে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি। এখনো পর্যন্ত রাজ্যের ব্লকে এই প্রকল্প চালু করা সম্ভব না হলেও যেখানে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের পরিমাণ বেশি, সেখানে তা চালু করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের বিধিগুলি হল ঃ

- দারিদ্রসীমার নীচে থাকা প্রতিটি পরিবারের দু'জন পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষকে কর্মহীন মরসুমে অন্ততপক্ষে ১৫০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে এজন্য পঞ্চায়েতে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। নথিভুক্ত পরিবারগুলিকে পারিবারিক কার্ড দেওয়া হয়, যাতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

এই প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচিগুলি হল ঃ

- বনসৃজন ও উদ্যানপালন
- রাস্তাঘাট নির্মাণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের বাড়ি তৈরি
- ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা

এক্ষেত্রেও মোট আর্থিক বরাদ্দের কমপক্ষে ষাট শতাংশ মজুরি বাবদ খরচ করতে হবে। মজুরির ৫০ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

(গ) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (আই. আর. ডি. পি.) ঃ

১৯৮০ সাল থেকে এই প্রকল্প দেশের সমস্ত ব্লকে রূপায়িত হয়ে চলেছে। তিন ধরনের কাজ এই কর্মসূচির অন্তর্গত। সেগুলি হল ঃ

- চাষের কাজ, পশুপালন, সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি
- কুটিরশিল্প স্থাপন
- ব্যাবসা ও পরিসেবামূলক

উপকৃতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আগ্রহ, দক্ষতা, কাঁচামালের প্রাপ্তি যোগ্যতা, বিক্রয় সম্ভাবনা— এসব বিবেচনা করে স্কিম নির্বাচন করা হয়। উদ্যোগীর বয়স হতে হবে ৯৮ থেকে ৬০-এর মধ্যে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীরাই এই প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। তবে এই শ্রেণির পরিবারগুলিকেও আয়ের ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগগুলি হল ক, খ, গ এবং ঘ। ক শ্রেণির পরিবারগুলি আর্থিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল তাই উদ্যোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিকতা দেওয়া হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে খ, গ এবং ঘ শ্রেণির পরিবারগুলি থেকে উদ্যোগী নির্বাচন করা হয়।

(ঘ) ট্রাইসেম ঃ

আই. আর. ডি. পি. তে যারা উদ্যোগী হিসাবে নির্বাচিত হয় তাদের মধ্যে কারো কারো দক্ষতা সৃষ্টি এবং দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ট্রাইসেম প্রকল্পটি হল সেই সমস্ত উদ্যোগীদের প্রশিক্ষণ দানের প্রকল্প। পলিটেকনিক কলেজ, আই. টি. আই, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, জন শিক্ষণ সংস্থান, উপযুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত দক্ষ কোনো ব্যক্তির সহযোগিতায় এই প্রকল্প রূপায়িত হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের উদ্যোগীদের এই ধরণের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে এই বয়ঃসীমা শিথিল করে ১৬ থেকে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধারণভাবে ছয়মাস হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আরও দীর্ঘসময় ধরে পরিচালিত হতে পারে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা ভাতা পেয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠান অনুসারে এবং আবাসিক-অনাবাসিক অনুসারে এবং সময়ের ব্যবধানে ভাতার পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়। প্রশিক্ষকের সাম্মানিক, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্যও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করে যে অর্থাগম ঘটবে তার অর্ধেক শিক্ষার্থীরা পাবে।

(ঙ) ল্যাম্পস্ ঃ

বৃহদায়তন সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি বা ল্যাম্পস্ তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের দ্বারা পরিচালিত সমবায়। এর মাধ্যমে সেচ ও চাষের জন্য ঋণ, বনজসম্পদ আহরণ ও বিপণনের ব্যবস্থা, ন্যায্যদামে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, স্বনিযুক্তির জন্য ঋণদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১০০-র বেশি ল্যাম্পস্ কাজ করে চলেছে। সব কয়টি ল্যাম্পসই নিবন্ধীকৃত।

(চ) সেস্‌রু ঃ

কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নিবন্ধীকৃত ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের বেকারদের স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে চলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিসেবা ও ব্যাবসার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং শিল্প স্থাপনের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। পরিবারের কেউ অতীতে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করলে এই ঋণ পাওয়া যায় না। প্রকল্পটি চালু করতে যত অর্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ দেওয়া হয় ঋণ হিসেবে এবং বাকি ২৫ শতাংশ অনুদান হিসাবে। অনুদানের অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। ঋণের অর্থ পরিশোধ হলে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ সুদসহ পাওয়া যায়।

(ছ) প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (পি. এম. আর. ওয়াই.) ঃ

শিক্ষিত বেকারদের স্বনিযুক্তির উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্পটি চালু করা হয় ১৯৯৪-৯৫ সালে। ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের শিল্পোদ্যোগীরা এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারে। পুরুষেরা প্রায় দেড়শো এবং মহিলারা প্রায় একশো ধরনের স্কিম থেকে যে-কোনো একটি বেছে নিতে পারেন। এ বিষয়ে ব্লক শিল্প আধিকারিক এবং জেলা শিল্প কেন্দ্র সাহায্য করতে পারে।

স্কিম চালু করার জন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। উদ্যোগীকে ৫ শতাংশ খরচ বহন করতে হবে, বাকি ৯৫ শতাংশ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে। এর জন্য কোনো গ্যারান্টির প্রয়োজন নেই। স্কিমের মাধ্যমে তৈরি সম্পদ ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ পেতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়।

(১) মাধ্যমিক পাশ বা ফেল হতে হবে।

(২) আই. টি. আই. পাশ বা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানে অন্তত ছয়মাসের প্রশিক্ষণ থাকবে।

(৩) যে অঞ্চলে উদ্যোগ চালু করা হবে প্রার্থীকে অন্তত তিন বছর সে অঞ্চলে বসবাস করতে হবে।

(৪) তার বার্ষিক আয় সব মিলিয়ে চব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে।

(৫) কোনো খেলাপি ঋণ থাকা চলবে না।

এ রাজ্যে প্রতিবৎসর অন্তত ২৫০০০ উদ্যোগীকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনিযুক্তিতে সাহায্য করা হয়।

(জ) তফশিলি জাতির জন্য বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আদিবাসী উপপরিকল্পনা ঃ

এই কর্মসূচির দুটি ধারা আছে— পরিবারভিত্তিক প্রকল্প ও গুচ্ছভিত্তিক প্রকল্প। পরিবারভিত্তিক কর্মসূচিগুলি হল আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ঋণ-অনুদানভিত্তিক পারিবারিক প্রকল্প। দ্বিতীয় ধরনের কর্মসূচি হল মিনিকিট, চারাগাছ, যন্ত্রপাতি বিতরণ, পশুখাদ্য উৎপাদন ও মৎস্যচাষ, বনসৃজন ও ভূমিসংরক্ষণ, রাস্তাঘাট তৈরি, গ্রামীণ জল সরবরাহ, কুটিরশিল্প প্রকল্প, যুবকল্যাণ প্রকল্প ইত্যাদি।

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত উদ্যোগীরা এই সাহায্য পেতে পারে। এই প্রকল্পে প্রতি উদ্যোগীকে দেওয়া অর্থের ৫০ শতাংশ হল অনুদান। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য রয়েছেন জেলাভিত্তিক বিশেষ আধিকারিক, নিগমের জেলা ম্যানেজার, ব্লক স্তরে পরিদর্শক, ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে সভাধিপতির নেতৃত্বে জেলাস্তরে এবং সভাপতির নেতৃত্বে ব্লকস্তরে মঙ্গল কমিটি। এই প্রকল্পে এক একটি স্কিমে সর্বোচ্চ দশ লাখ টাকা পাওয়া যেতে পারে এবং ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারও তুলনায় কম।

(ঝ) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কর্মসূচি ঃ

নানারকম ছোটো-বড়ো উদ্যোগে মানুষকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। চর্মশিল্প, বেত-বাঁশের কাজ, মৌমাছি পালন, তাল

ও খেজুর গুড় তৈরি, হাতে তৈরি কাগজ, মুড়ি-চিঁড়ে তৈরি, কামার-কুমোর-ছুতোরের কাজ, দড়ি শিল্প, আগরবাতি, পশম দ্রব্য, এবং খাদি দ্রব্য ইত্যাদি প্রকল্প পরিচালনায় উদ্যোগীদের উৎসাহিত করা হয়। এই উদ্যোগে নব সাক্ষরদের যুক্ত করার বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(১) প্রকল্প পরিচালার জন্য গৃহীত অর্থের সবটাই ঋণ হিসেবে পাওয়া— এতে অনুদানের ব্যবস্থা নেই।

(২) এই প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণের ওপর সুদের হার মাত্র চার শতাংশ।

(৩) উদ্যোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং খাদি দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে সহায়তা দেওয়া হয়।

খাদি কর্মসূচি রূপায়ণের কাঠামোটি এরকম ঃ

খাদি কমিশন
(কেন্দ্রীয় স্তরে)
↓
খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ
(রাজ্য স্তরে)
↓
জেলা খাদি কার্যালয়
(জেলা স্তরে)

গ্রাম পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ— পঞ্চায়েতের সব কয়টি স্তরই এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

(ঞ) কৃষি উন্নয়ন ঃ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত চাষিদের মিনিকিট, বীজ রাখার পাত্র, সহায়ক মূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। চাষিরা যাতে চাষের কাজে উন্নত প্রথা, উন্নত প্রজাতি, উদ্যানপালন ইত্যাদি ঠিক ভাবে করতে পারে সেজন্য ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। বিভিন্ন চাষের সময় পাট্টাদার, বর্গাদার এবং দরিদ্র চাষিদের ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষি শ্রমিকদের পেনশনও দেওয়া হয়। এসব কাজ দেখার জন্য জেলা স্তরে মুখ্য কৃষি আধিকারিক, ব্লক স্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক রয়েছেন। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে একজন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক যুক্ত থাকার কথা, যিনি অন্য আরো কিছু কাজের সঙ্গে এই দায়িত্বও পালন করবেন।

(ট) প্রাণীসম্পদ বিকাশ কর্মসূচি ঃ

এটি আর একটি প্রকল্প যা গ্রামীণ মানুষের মানুষের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। এই কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণেও পঞ্চায়েত সরাসরি যুক্ত। এই পরিসেবার মধ্যে রয়েছে ঃ

- হাঁস, মুরগি, ছাগল ও গোপালনের প্রশিক্ষণ
- সংকর জাতের পুরুষ ছাগল ও ভেড়া বিতরণ
- কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত পরিসেবা
- পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা ও টিকাদান।

এইসব পরিসেবা ছাড়া ১৮ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের নিয়ে দুগ্ধ সমবায় সমিতি গড়ারও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে।

(ঠ) মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ঃ

মৎস্যজীবীদের জীবনের মনোন্নয়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে নানা ধরনের স্কিম আছে যেমন ঃ

- চাষযোগ্য পুকুরের মাছ চাষ
- মজে যাওয়া পুকুরে পাঁক তুলে মাছ চাষ
- নোনা জলে মাছ চাষ
- নতুন পুকুর কেটে মাছ চাষ
- ধানের ক্ষেতে মাছ চাষ
- চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, পারশের মিশ্র চাষ
- নদীতে মাছের পোনা ছাড়ার স্কিম
- দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাছের পোনা ও সারের মিনিকিট বিতরণ।

এই সমস্ত সুযোগসুবিধা পেতে পারেন আর্থিকভাবে দুর্বল মৎস্যজীবীরা, ক্লাব, সমবায় সমিতি, ব্যক্তিগত পুকুরের মালিক এবং লিজের মাধ্যমে পুকুরের অধিকার পাওয়া মৎস্যজীবী। দশ থেকে কুড়ি জনকে নিয়ে মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী তৈরি করলে সেই সব গোষ্ঠীকে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়ার বিধি রয়েছে। ব্লকস্তরে এ সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যেমন, ঝিনুক চাষ, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ, নোনা জলে মাছের চার সংগ্রহ, মাছ ধরা জাল তৈরি ইত্যাদি। এ ছাড়া যারা গভীর সমুদ্রে, সমুদ্র উপকূলে এবং নদীতে মাছ ধরতে যায় তাদের সমবায় ভিত্তিতে ট্রলার, নৌকো, জাল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়। নৌচালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের মাসিক ১০০ টাকা হারে বার্ধক্যভাতা দেওয়া হয়। তা ছাড়া গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনবীমা, মৎস্যজীবীদের বসবাসের এলাকায় পানীয় জল, রাস্তাঘাট বা অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়। মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়। এইসব পরিসেবা বা সুযোগসুবিধাদানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়।

(ড) বন দপ্তরের প্রকল্প ঃ

রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে সমাজ-ভিত্তিক বনসৃজন, ভূমি সংরক্ষণ, বিকেন্দ্রীত নার্সারি, সুসংহত ওয়াটারশেড উন্নয়ন ইত্যাদি স্কিম রয়েছে। এই সমস্ত স্কিমে যাতে গ্রামীণ মানুষরা যুক্ত হয় সেজন্য জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির 'বন ও ভূমি সংস্কার' স্থায়ী সমিতিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নার্সারি স্কিমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চারা তৈরির বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে বীজ, সার, পলিথিন টিউব, খড়, বাঁশ, জলের ঝারি সরবরাহ করা হয়। তা ছাড়া বন যেখানে রয়েছে সে সব অঞ্চলে 'বন রক্ষা সমিতি' গঠন করে তাদের মাধ্যমে বনরক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বনসৃষ্টি, উন্নয়ন ও রক্ষায় এভাবে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার উদ্যোগে পঞ্চায়েতের ভূমিকা রয়েছে। বন রক্ষা সমিতির সদস্য নির্বাচন এবং তা পরিচালনার ব্যাপারে পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঢ) রেশম শিল্প ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ঃ

রেশম দ্রব্য সব সময়েই মূল্যবান। আমাদের দেশে তুঁত, তসর, এন্ডি এবং মুগা— এই চার ধরনের রেশম সুতা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে তুঁতের রেশম সুতা মূলত তৈরি হয় বীরভূম, মালদহ ও মুরশিদাবাদে। আবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরে তৈরি হয় তসরজাত রেশম। এই তসর উৎপাদন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বা তার কোনো অংশের জন্য পরিবার ভিত্তিক স্কিম করা যায়। সেজন্য রেশম শিল্প দপ্তর থেকে অনুদান এবং

ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায়। কমপক্ষে আটজনকে নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করলে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। গোষ্ঠী বড়ো হলে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যায়। এ ধরনের গোষ্ঠী গঠনে পঞ্চায়েত উদ্যোগ নেয়। রেশম শিল্পীদের আরো দক্ষ করে তুলতে তিন সপ্তাহ থেকে দুই মাস মেয়াদি পর্যন্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের সময় মাসে ২০০ টাকা ভাতাও দেওয়া হয়।

(ণ) অচিরাচরিত শক্তি ঃ

এই প্রকল্পকে জনপ্রিয় করে তুলতে গোবর গ্যাস প্রকল্প, সৌর লণ্ঠন, ইত্যাদি অনুদানভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ছোটো-বড়ো-মাঝারি বিভিন্ন আয়তনের গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি হয়। জেলা শিল্প কেন্দ্র এ বিষয়ে সাহায্য করে। ব্লকে রয়েছেন শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক। যেসব অঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়নি সেই সব এলাকায় সৌর লণ্ঠন স্থাপন, সৌরশক্তিতে রান্নার যন্ত্র, বায়ুচালিত যন্ত্রের মাধ্যমে জল তোলা এই প্রকল্প গ্রামীণ মানুষেরা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে।

(ত) বহুমুখী স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি ঃ

জেলাস্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিসেবা দানের জন্য নানারকমের পরিকাঠামো রয়েছে। জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, প্রশিক্ষিত দাই, কমিউনিটি হেলথ গাইড ইত্যাদিও রয়েছেন। শিশুমৃত্যু রোধ, নিরাপদ মাতৃত্ব, টিকাকরণ, পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত পরিসেবা নানাভাবে পরিচালিত হয়। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে এমন ভূমিকা পালন করে যাতে এলাকার মানুষ এই সব পরিসেবা ঠিকভাবে পায়। নাগরিকদের এ বিষয়ে সচেতন ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তারা ভূমিকা নেয়।

নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিও সারা রাজ্যব্যাপী রূপায়িত হচ্ছে। কম খরচে পাকা শৌচালয়, শোষক গর্ত এবং ধুমহীন চুলা নির্মাণে মানুষকে উৎসাহী করা হয়। পঞ্চায়েত এ ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারগুলিকে পায়খানা প্রতি ২০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেটটিই বিবেচ্য বিষয়। পানীয় জল সরবরাহের জন্য তারা পাম্প বসানোর ক্ষেত্রেও স্থান নির্বাচন, সাত জন গ্রামবাসীকে নিয়ে কমিটি তৈরি সব কিছুতেই পঞ্চায়েত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মেদিনীপুর জেলায় এই প্রকল্প জেলা প্রশাসন, ইউনিসেফ, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ এবং জেলার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় যে সাফল্য অর্জন করেছে তা এককথায় সারা দেশের কাছে উদাহরণযোগ্য।

(থ) সাক্ষরতা সংক্রান্ত কর্মসূচি ঃ

সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর এবং ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সর্বশিক্ষা অভিযান, প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণেও পঞ্চায়েতকে যুক্ত থাকতে হয়। সাক্ষরতা বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কোথা থেকে পরিচালিত হবে তা স্থির করা, কারা উপভোক্তা হবেন তা নির্ধারণ করা, কেন্দ্র পরিচালক বা শিক্ষা সহায়ক কে হবেন তা নিশ্চিত করা, পাঠ্যবস্তুর এবং অন্যান্য উপকরণের জোগান দেওয়া এসব ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(দ) বৃদ্ধ, বিধবা, প্রতিবন্ধী কল্যাণ ঃ

দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসহায় বিধবারা প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে সহায়তা পান। পঞ্চায়েৎ সমিতি ঐ পরিমাণ টাকা ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করে দেয় এ ধরনের মানুষের তালিকা। যাঁরা প্রতিবন্ধী তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং নানা ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করে থাকে।

৫.৬. বিধান সন্ধনীয় বন্দোবস্ত

পঞ্চায়েতের দায়দায়িত্ব নানাবিধ। পঞ্চায়েতের কাছে মানুষের প্রত্যাশাও অনেক। স্থানীয় স্তরের গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে পঞ্চায়েতকে তার দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে। তাকে সংবিধান ও আইনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সম্পর্কিত আইন তৈরির। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সেই আইন মেনে পরিচালিত হওয়া। আইনের অনুশাসন অনুসারেই পঞ্চায়েত তার দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এই আইন অনুসারে—

(ক) একটি বৃহৎ মৌজা বা পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি মৌজা বা মৌজার অংশবিশেষকে নিয়ে একটি 'গ্রাম' তৈরি হবে। এবং এরকম একটি গ্রামের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠিত হবে।

(খ) এলাকার ভোটার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫ থেকে ২৫ জন পর্যন্ত নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা থাকবে। সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ করতে গিয়ে যদি দেখা যায় ৫০০ জনের কম আরও কিছু ভোটার থাকেন তাহলে একজন অতিরিক্ত সদস্য/সদস্যা থাকবেন। যেমন একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যদি ৮৩১৫ জন ভোটার থাকেন সেক্ষেত্রে ৮০০০/৫০০ = ১৬ জন সদস্য/সদস্যা তো থাকবেনই কিন্তু সেই সঙ্গে বাকি ৩১৫ জনের জন্য আরো ১ জন অর্থাৎ মোট ১৭ জন সদস্য/সদস্যা নির্বাচিত হবেন। মোট সদস্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা। তফশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখা হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হবেন। নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাদের মধ্য থেকে একজন প্রধান এবং একজন উপপ্রধান নির্বাচিত হবেন।

(ঘ) নির্বাচনের দিন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো মৌজায় কখন কী কাজ করবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মিটিং-এ আলোচনা করে। প্রতি মাসেই একটি করে মিটিং হবে। একের তিন ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। কোরাম না হলে মিটিং স্থগিত থাকবে। মিটিং-এর নোটিশ দিতে হবে অন্তত সাতদিন আগে। কোনো সদস্য নোটিশ না পেলে মিটিং করা যাবে না। বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে জরুরি মিটিং তিন দিনের নোটিশ ডাকা যাবে। মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সচিব মিটিং বইতে লিখে রাখবেন। এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে তলবি সভা ডাকতে হয় ১৫ দিনের মধ্যে।

(চ) আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলিও লিপিবদ্ধ করা আছে। কাজগুলি মূলত উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কথা বিবেচনায় রেখে স্থির করা হয়েছে।

❑ যৌথ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কাজ

- জনস্বাস্থ্য, জলনিকাশি
- ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধমূলক কাজ
- পানীয় জল সরবরাহ, পানীয় জলে দূষণরোধ
- রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরাবত করা
- বেআইনিভাবে রাস্তা দখল রোধ করা
- সাধারণের ব্যবহার্য্য পুকুর, শ্মশানঘাট, কবরখানা, গোচারণভূমি সংরক্ষণ করা
- বৃক্ষরোপণ করা

- জনগণনা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করা
- কুয়ো, পুকুর খনন করা
- সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি রক্ষা করা
- কর, অভিকর ধার্য্য ও আদায় করা
- রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা

❑ উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ

- সমবায় প্রথায় চাষ, শিল্প এবং অন্য কাজের ব্যবস্থা করা
- হাটবাজার তৈরি ও সংরক্ষণ করা
- মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা
- কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা
- গোপালন, গোচিকিৎসা, গোপ্রজনন, মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প তৈরি ও রূপদান করা
- পাঠাগার তৈরি ও পরিচালনা করা
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটানো
- খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ
- সেচব্যবস্থা উন্নত করা
- পতিত জমি উদ্ধার ও উন্নয়ন
- ভূমিসংস্কার করা
- সমবায় প্রথায় ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার
- গ্রামীণ আবাসন তৈরি
- অচিরাচরিত শক্তি
- সামাজিক বনসৃজন
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ
- পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- বয়স্ক ও প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা পরিচালনা করা
- তফশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ
- গ্রামীণ ডিসপেনসারি স্থাপন ও পরিচালনা
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ

(ছ) **সদস্যদের দায়িত্ব ঃ**

জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে যথাক্রমে সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি অনেক ক্ষমতা ভোগ এবং দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু কাজের দায়ভার ভাগ করে দেওয়া হয় অন্য সদস্যদের ওপরেও। জেলা এবং ব্লকস্তরের পঞ্চায়েত উভয় ক্ষেত্রেই দশটি করে স্থায়ী সমিতি থাকে যার সভাপতি হলেন কর্ম্মাধ্যক্ষ। গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণত প্রধান এবং উপপ্রধানই দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু

সেখানেও কাজের চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটায় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে দৃঢ়মূল করার স্বার্থে অন্য নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও দায়িত্ব বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চায়েতের সংশোধিত আইনে। তবে সংশোধিত আইনেও বলা হয়েছে যে প্রধান এবং উপপ্রধানকে যে দায়দায়িত্ব দেওয়া আছে বা যে ক্ষমতা অর্পণ করা আছে তার পরিবর্তন হবে না। ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা কর্মসূচি রূপায়ণে সাহায্য করবেন মাত্র, আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন না।

(জ) যানবাহনের লাইসেন্স, ফি, টোল ধার্য করা ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, টায়ার লাগানো গোরুর গাড়ি, অন্যান্য গাড়ির জন্য লাইসেন্স প্রদান করতে পারে। জলকর, মেলা বা হাটের জন্য ফি, ব্রীজ এবং ফেরি সার্ভিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে টোল বসানোর ক্ষমতা পঞ্চায়েতকে দেওয়া আছে পঞ্চায়েত আইনে।

(ঝ) বাজেট ঃ

পঞ্চায়েতগুলি প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দেখিয়ে একটি বাজেট তৈরি করবেন এবং তা অনুমোদন করাবেন। এই প্রক্রিয়াটি যেহেতু দীর্ঘ তাই অক্টোবরের প্রথমেই তা শুরু হয়ে মার্চের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হয়। নির্দিষ্ট ফর্মে বাজেট তৈরি করার সময় অডিট রিপোর্টের সাহায্য নিতে হয়।

(ঞ) হিসাব সংরক্ষণ ঃ

পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র রাখতে হবে বাঁধানো খাতায়। আলগা কাগজে হিসাব রাখা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। ইংরেজি, বাংলা এবং দার্জিলিং-এর ক্ষেত্রে নেপালি ভাষায় হিসাবের খাতাপত্র লিখতে হবে। কোন্ খাতায় কত পাতা আছে খাতার প্রথম পাতায় তা লিখে প্রধান সই করবেন। ছোটো খাটো ব্যয় নির্বাহের জন্য সামান্য অর্থ হাতে রাখা ছাড়া সমস্ত অর্থ ডাকঘর বা ব্যাংকে রাখতে হবে। প্রধান বা উপপ্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে তা তোলা যাবে। তাঁরা উভয়েই চেকে সই করবেন। পাশ বই, চেক বই ইত্যাদি জমা থাকবে সচিবের জিম্মায়। আয়ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য একটি ক্যাশবই থাকবে যেটি লিখবেন পঞ্চায়েতের সচিব। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রয় প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার জন্য একটি কমিটি গঠিত হবে প্রধান, উপপ্রধান, সচিব এবং একজন সদস্যকে নিয়ে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সমস্ত ক্রয় হবে এই কমিটির মাধ্যমে। একমাত্র জরুরি ক্ষেত্রে প্রধান একক সিদ্ধান্তেই জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারেন।

বিধিবদ্ধ অডিট ঃ

পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসাব বৎসরে অন্তত একবার পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক পরীক্ষা করবেন। সমস্ত হিসাব নিয়মমত অডিট করা হবে এবং অডিট রিপোর্ট দু'মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান এবং জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হয়। অডিট রিপোর্টটি পঞ্চায়েত মিটিং-এ পেশ করে অনিয়মের উল্লেখ থাকলে দু'মাসের মধ্যে তা সংশোধন করতে হয়। সংশোধন করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও অডিটরকে জানাতে হবে। গুরুতর অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অডিটর সারচার্য ধার্য করতে পারেন অথবা বিষয়টি মহকুমা শাসকের নজরে আনতে পারেন।

গ্রামসভা ঃ

পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে এক একটি গ্রামসভা বলা হয়। এলাকার সমস্ত ভোটারই গ্রামসভার সদস্য। প্রতিটি গ্রামসভায় নভেম্বর মাসে ষান্মাসিক এবং মে মাসে বার্ষিক সভার আয়োজন করতে হয়। সভার ঘোষিত দিনের অন্তত সাতদিন আগে সভা সম্পর্কে নানা পন্থায় মানুষকে অবহিত করতে হবে। ষান্মাসিক সভায় মূলত পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট পেশ করতে হয়। বার্ষিক সভায় বিগত বছরের কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা এবং চলতি বছরের বাজেট ও প্রস্তাবিত কাজকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ হয়। এই সব সভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব

প্রধানের। কোনো কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে উপপ্রধান অথবা কোনো বরিষ্ঠ সদস্য সেই দায়িত্ব পালন করবেন।

সদস্যের অপসারণ বা পদত্যাগ ঃ

মহকুমা শাসকের নির্দেশে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো সদস্যকে অপসারণ করা যেতে পারে।

(১) নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত হলে ছয় মাসের বেশি কারাদণ্ড ভোগ করলে,

(২) নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারে কোনো ঘাটতি পরবর্তীকালে প্রকাশ পেলে,

(৩) অনুমতি ছাড়া পরপর তিনটি মিটিং-এ যদি অনুপস্থিত থাকেন,

(৪) পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী কোনো বকেয়া কর ইত্যাদি থাকলে,

(৫) যদি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্য হন,

(৬) যদি তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোনো সদস্য নানা কারণে পদত্যাগ করতে পারেন। যেদিন বি. ডি. ও. তা গ্রহণ করবেন সেদিন থেকেই তা কার্যকরী হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ অনুসারে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত আইন অনুসারে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির পরামর্শমত যথাসময়ে কাজ করছে না তবে সেই কাজ জেলা পরিষদ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারবে। দ্বিতীয়ত যদি দেখা যায় কোনো পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কর, টোল ইত্যাদি ধার্য না করে তবে তা ধার্য করার জন্য জেলা পরিষদ নির্দেশ দিতে পারে। এবং তৃতীয়ত নিয়মমত গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং যদি না হয় জেলা পরিষদ তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। তা ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো কোনো সিদ্ধান্তও রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করতে পারে যদি কোনও সিদ্ধান্ত আইনানুসারে গৃহীত হয়নি বলে মনে হয় এবং কোনো গৃহীত সিদ্ধান্তে পঞ্চায়েত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত বাতিলের মত কঠোর ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার নিতে পারে যদি কর্তব্য পালনে অযোগ্যতা দেখায়, ক্রমাগত ত্রুটি ঘটায়, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, ইত্যাদি। তবে এ ধরনের আদেশ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়।

মানুষের অংশভাগীতার প্রয়োজনীয়তা ঃ

পঞ্চায়েতের কাজকর্মে মানুষের অংশভাগীতা অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গেলে সংশ্লিষ্ট মানুষকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হতে হয়। সমস্ত নির্বাচকের কর্তব্য হল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে পছন্দের ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা। দ্বিতীয়ত গ্রামসভার ষান্মাসিক এবং বার্ষিক সভাগুলিতে উপস্থিত থেকে পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়ন করা, ভবিষ্যৎ কর্মের ক্ষেত্রে দিক্‌দর্শন করা, হিসাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই সব দায়িত্ব পালন করলে পঞ্চায়েত স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ পায় না, বিভিন্ন এলাকার প্রকৃত সমস্যাগুলি মাথায় রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়।

আর একটি ক্ষেত্রেও মানুষের অংশভাগীতা অত্যন্ত জরুরি। সেটি হল প্রকল্প রূপায়ণে সরাসরি অংশভাগীতা। পঞ্চায়েতের আর্থিক সম্পদ অবশ্যই সীমিত। মানুষের চাহিদার তুলনায় তার পরিমাণ কম। সাধ্য কম হওয়ার জন্য যত পরিমাণে উন্নয়ন ও কল্যাণধর্মী কাজ করা দরকার তা যুক্ত হয়, যদি তাদের মধ্যেও কিছু পরিমাণে স্বেচ্ছাশ্রম

দেওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, যদি দেখা যায় তাহলে একই পরিমাণ অর্থে কাজের পরিধি ও গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

জনগণের অংশভাগীতার আর একটি বড়ো দিক হল যে এর ভিতর দিয়ে সমষ্টির সামগ্রিক পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটে। জীবনকে সৃষ্টিধর্মী করতে হলে, আনন্দময় করে তুলতে হলে পরিবেশগত উন্নয়ন এক কাম্য অবস্থা।

৫.৮. পঞ্চায়েতের প্রভাব

যদিও পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা সারা দেশেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তবু সব রাজ্যে একই সঙ্গে এবং একই রকম আগ্রহ নিয়ে তা চালু করা সম্ভব হয়নি। কর্ণাটক, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গে যত তাড়াতাড়ি তা করা হয়েছে বিহার, ওড়িশায় তেমনিই তা অনেকটা দেরি করে চালু হয়েছে। এগুলিকে যথেষ্ট কার্যকরী রাখার ক্ষেত্রেও উদ্যোগের মাত্রা সব রাজ্যে একই রকম নয়। এর ফলে পঞ্চায়েতের প্রভাব সর্ব্বত্র একইভাবে অনুভূত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রভাব পড়েছে তা হল ঃ

(ক) স্থানীয় ভিত্তিতে সমস্যা বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় মানুষের প্রকৃত চাহিদাগুলি মিটবার সুযোগ হয়েছে।

(খ) পানীয় জল, সেচের জল, সাক্ষরতা ও শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য চেতনা ও পরিসেবা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সদর্থক পরিবর্তন ঘটেছে।

(গ) কৃষি, কুটিরশিল্প, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আয়বৃদ্ধির কর্মসূচি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বা উন্নত হয়েছে।

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বসাহায্যকারী দলগঠন ও পরিচালনার ভিতর দিয়ে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে।

(ঞ) মানুষের সাধারণ চেতনার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে।

(চ) উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীত হওয়ায় প্রায় বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিও সবধরনের সুযোগসুবিধা এবং পরিসেবা পাচ্ছে।

(ছ) সরকারি প্রকল্প অনেক দূরের ব্যাপার এবং সরকার সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে এ-ধরনের ভাবনা মানুষের মন থেকে অস্তমিত হয়েছে বলা যায়।

৫.৯. সমস্যা

একটি দেশব্যাপী গড়ে ওঠা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নানা ধরনের সমস্যা তাকে জড়িয়ে থাকবে এটিই স্বাভাবিক। সেগুলি মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ধীরে ধীরে সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যায়। কিছু কিছু সমস্যা যা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায় সেগুলি হল ঃ

(ক) নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাদের একটি অংশ নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষর। এদের পক্ষে পঞ্চায়েতের বিধিব্যবস্থা বা দায়দায়িত্ব এবং মাঝে মাঝে পাঠানো নির্দেশাবলি, হিসাবের খাতা, নোটিশ কোনো কিছুই পড়ে বোঝার সুযোগ নেই। গ্রামসভার মিটিং-এ যেসব আলোচনা হয় তা লিপিবদ্ধ করে নেওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে উপরি-উক্ত বিষয়গুলিতে দুর্বলতা না থাকা কাম্য।

(খ) অনেক সদস্য/সদস্যাই নিজের ইচ্ছায় নয়, পরিবারের বা রাজনৈতিক দলের চাপে পড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সদস্য/সদস্যা হয়েছেন। মনের দিক থেকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য তারা তেমন তৈরি থাকে না।

(গ) কিছু কিছু মহিলা সদস্যা নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। স্বামী, শ্বশুর ইত্যাদিরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঘ) নির্বাচিত হওয়ার পর পরই প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত৷ কিন্তু দেখা যায়, অনেক সদস্য/সদস্যা নির্বাচিত হবার এক বছরের মধ্যেও প্রশিক্ষণের সুযোগ পান না।

(ঙ) গ্রামসভার মিটিং সব ক্ষেত্রে আয়োজিত হয় না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ মানুষও তাতে অংশগ্রহণ করেন না।

(চ) রাজনৈতিক দলাদলির জন্য কোনো কোনো পঞ্চায়েতের কাজের পরিবেশ যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়।

(ছ) কোনো কোনো পঞ্চায়েতে আর্থিক স্বচ্ছতার ব্যাপারটি রক্ষিত হয় না।

(জ) কোনো কোনো পঞ্চায়েতে কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ।

(ঝ) অনেক মহিলা সদস্যা সন্তানসহ প্রশিক্ষণে আসায় প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি বিঘ্নিত হয়।

৫.১০. গ্রন্থপঞ্জি

১। ইমার্জিং ট্রেন্ডস্ ইন পঞ্চায়েতি রাজ ইন ইন্ডিয়া-এস. পি. জৈন এবং থোমাস হোকেসাঙ্গ

২। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচায়িকা — পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩। আইডিয়া অব ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন — ইকবাল নারায়ন

৪। দ্য নিউ ডিসিসেন মেকিং সেন্টারস্ — এল. সি. জৈন

৫.১১. প্রশ্নাবলি

১। পঞ্চায়ত বলতে কী বোঝ? তার বিকাশ ও গঠন সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করুন।

২। পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব বা কাজকর্ম কী?

৩। পঞ্চায়েত পরিচালনায় প্রধানের ভূমিকা কী?

৪। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে মূল বিধানগুলি কী কী? কখন একজন সদস্যকে অপসারণ করা যায়?

৫। পঞ্চায়েতের মূল সমস্যাগুলি কী এবং তা দূরীকরণে কী করণীয়?

একক—৬ ❑ গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও কেন্দ্রীয়করণের ধারণা এবং গ্রামোন্নয়নে ব্যাংক সমবায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

গঠন

৬.১. সমন্বয়

৬.২. কেন্দ্রীয়করণ

৬.৩. গ্রাম উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

৬.৪. সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

৬.৫. শিল্প ও কৃষির ভূমিকা

৬.৬. প্রশ্নাবলি

৬.১. সমন্বয়

প্রস্তাবনা ঃ

ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণের ইতিহাস অনেক দিনের পুরানো যদিও এর বৃহৎ আয়তন এবং সম্পদের অপ্রতুলতার ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সমাজকল্যাণের কাজ করা সম্ভব হয়নি। সমাজকল্যাণের একটা বড়ো অংশ করে থাকেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন সব জায়গায় সমান হয়নি, তার কারণ সব জায়গায় সমান ভাবে কাজ করা হয়নি বা সম্পদ সমানভাবে পৌঁছায়নি সহযোগিতা ও সমন্বয় একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যাপার, সেই জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় কিছুটা সহজ কিন্তু বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় খুবই কঠিন।

সমন্বয়ের সংজ্ঞা ঃ

এটি একটি জৈবিক ও যুক্তিগত পদ্ধতি। এর অর্থ বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটা কিছু করা। এটা অনেক সময় মানবশরীরেও হয়, যদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসাথে কাজ না করে। উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে একটা সমষ্টি ঠিক মত কাজ করতে পারে না কারণ সমাজে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমন্বয় হল গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করা ও জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রেখে কাজ করা।

সমন্বয়ের প্রয়োজন এই জন্যই যে যখন কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের একটা ঝোঁক নিজের মত করে বিভিন্ন দিকে কাজ করে তখন একটা ভুলবোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

ভুলবোঝাবুঝির মুখ্য কারণগুলি হল ঃ

১। একে অপরের কাজের খবর না রাখা ফলে একই কাজ অনেকে করে।

২। অনেক সময় একটা ঝোঁক দেখা যায় যে, কোনো কর্মী তার নিজের কাজের ক্ষেত্রে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলে যে, অন্যের যে কী প্রয়োজন সেটা ভুলে যায়।

এই সব ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যায়।

গ্রাম উন্নয়ন সমন্বয়ের গুরুত্ব ঃ

যে-কোনো দেশের পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও রূপায়ণ উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বয় প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমহারে সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য বহুমুখী (Multipurpose) প্রকল্প গ্রহণ করা হয় আর সেই জন্য সমন্বয়ের গুরুত্ব অসীম। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে স্থানীয় ভাবে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলি স্থানীয় ভাবেই সমন্বয়ের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন যেটা পরবর্তীকালে ক্ষেত্রীয় ও কেন্দ্রীয় স্তরে সমন্বয় করা যায়। ঠিক একই ভাবে বেসরকারি সংস্থা যে সকল পরিকল্পনা বা প্রকল্প গ্রহণ করে তা সঠিক রূপায়ণের জন্য সরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় দরকার।

সমন্বয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যদি সমন্বয় না থাকে তাহলে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকল্পের অধিকর্তা থেকে শুরু করে প্রকল্পটি রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত কর্মীটি পর্যন্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবে যাতে করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমহারে অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা যায়।

সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কয়েকটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঃ

১। কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আছে তা দূর করতে সাহায্য করা।

২। স্বেচ্ছাসেবী ও বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয়।

৩। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও আর্থিক সাশ্রয় হয়।

৪। তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা।

৫। সমন্বয়ের ফলে দক্ষ কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি করা।

৬। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ও সামাজিক আইনকে হাতিয়ার করে একই ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও যৌথভাবে সমাধানের চেষ্টা করা।

৭। সংক্ষেপে সমন্বয় একটি সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উৎকর্ষতা বাড়িয়ে দেয়।

৬.১.৫. সমন্বয়ের কিছু নীতি

১। প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের সমস্যা ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে সেই ব্যাপারে একটা চুক্তি মেনে কাজ করবে।

২। সমস্ত গোষ্ঠী নীতি মেনে চলার জন্য একই ধারণা নিয়ে চলবে।

৩। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য একই পদ্ধতি মেনে চলবে।

৪। প্রতিটি এককে দায়িত্ব, কর্তব্য, কাজের ধরন ঠিক করা থাকবে।

৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় মত কাজ শেষ করার জন্য একটি সময়সারণি থাকবে।

৬। প্রতিটি গোষ্ঠী যাতে করে অন্য গোষ্ঠীর কাজ কর্ম ও অগ্রগতীর খবর জানতে পারবে তার ব্যবস্থা করা।

৭। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠী বা কর্মীর মধ্যে একটি কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া প্রতিটি কর্মীর দলগত মনোবল থাকবে এবং প্রশাসনের সাথে সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে।

সমন্বয় দুভাবে সম্ভব হতে পারে ঃ

১। স্বতঃস্ফূর্তভাবে—

কোনো ছোটো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যখন প্রশাসন সমস্ত বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং ব্যক্তিগত ভাবে সমস্ত কর্মসূচি ও কর্মীকে চেনেন সেখানে। কিন্তু এইভাবে কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় সম্ভব নয় এক্ষেত্রে পরিকল্পিত ভাবেই ব্যবস্থা করতে হয়।

২। ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিত—

ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিত সমন্বয় আবার দু-ধরনের ঃ

(ক) **আবশ্যিক** — আবশ্যিক সমন্বয় একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের hierarchy-র মাধ্যমে সম্ভব। যদি কেবল দুটি বিভাগের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হয় তখন সেটি এই দুই বিভাগের যিনি সাধারণ সমন্বয়কারী তার কাছে পাঠানো হয় এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে এই দুই বিভাগের কর্মী।

(খ) **স্বেচ্ছাসমন্বয়** — সম্ভব হয় সমঝোতা ও বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে, যে সকল পদ্ধতি প্রকরণের ভিতর দিয়ে স্বেচ্ছাসমন্বয় সম্ভব সেগুলি হল—

১। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সদস্য বা কর্মীদের সাথে আলোচনা করে তাদের প্রাথমিক মতামত জেনে নেওয়া।

২। বিভাগীয় কর্মী এবং অন্য বিভাগের সাথে সম্মেলন করা, যদি—

ক. বিষয়টির সাথে অনেকে যুক্ত থাকেন।

খ. কোনো বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অনেকগুলি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রয়োজন হয়।

গ. যখন নতুন কোনো পদ্ধতি বা নীতি গ্রহণ করা হয়।

৩। প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের বিভাগীয় কমিটি, সমন্বয়কারী অফিসার, পরিকল্পনা কমিটি এবং কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

৪। ফলাফল দেখা ও তুলনা করার জন্য সমস্ত পদ্ধতির মান ঠিক রাখা।

৫। কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকরণ।

৬। চিন্তাধারা এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন।

সমন্বয়ের উপকরণ ঃ

সমন্বয়ের জন্য কোনো একজন ব্যক্তি (সভাপতি/অধিকর্তা) বা একটি ছোটো গোষ্ঠীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া কাজ। একটি গোষ্ঠীর দ্বারা সমন্বয় সম্ভব যেখানে কাজটি সম্প্রসারণ ধরনের এবং অনেকে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যুক্ত। সমন্বয়ের কাজই হচ্ছে প্রতিনিয়ত নজর রাখা এবং একটি প্রশাসনিক কাজ।

সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

১। যোগাযোগ — গ্রাম উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কারণ সমন্বয় উভয় দিক থেকেই প্রচেষ্টার একটা পদ্ধতি এবং এক অপরের ওপর নির্ভরশীলতার নীতিতে গড়ে ওঠে।

২। দায়িত্ব ও কর্তব্য — দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। যেখানে কেবল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে সেখানে সমন্বয় সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিসমাপ্তি — বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরি করে ক্রমে গ্রাম উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা। গ্রাম উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সমস্ত প্রকল্প বা দপ্তরকে সেই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিসমাপ্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। অন্য প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/সংগঠন একসাথে বসে যাতে আলোচনা করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই পদ্ধতি সমন্বয়ের অভাবে যে সমস্যাগুলি হয় সেটি দূর করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

৪। কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা চেতনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা — যেহেতু গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ গ্রাম উন্নয়নের কাজটি দেখে সেজন্য যেসকল কর্মী এর সাথে যুক্ত তাদের প্রশিক্ষণ বা সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যাতে করে ঠিক ঠিক উপায় গ্রহণ করা যায় সেজন্য সম্মেলন, বক্তৃতা, গণমাধ্যম, প্রদর্শনী, Audio Visual Aid, সামাজিক নাটক ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যায়।

৬.১.৯. সমন্বয় সহায়ক বিষয় ঃ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার নিজস্বতা, উদ্দেশ্য, স্বাভাবিক কর্ম এবং সাথে সাথে কর্তব্য ধরে রাখে। অনেক সময় কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার জন্য কিছুটা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতে হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংযোজকের কাজ হচ্ছে সাধারণভাবে সংগঠনের প্রচেষ্টাকে ধরে রাখা।

দলগত কাজ তখনই সফল হবে যখন সমন্বয় ঠিক থাকবে। দলের মধ্যে ঐক্য থাকলেই যৌথভাবে কোনো কাজ করা সম্ভব হবে। কোনো একটি দলগত খেলার সময়ও নিজেদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া হচ্ছে সমন্বয়ের ফল। দলনেতা যৌথ সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্বাস রাখবেন তিনি সেই রকম ব্যক্তি হবেন যিনি ভালো খেলার জন্য নিজেই কৃতিত্ব নেবেন না— সে কৃতিত্ব সকলেরই এই ধারণা পোষণ করবেন। সর্বোপরি অন্য সদস্যেরা দলনেতাকে মনিব হিসেবে না দেখে যাতে বড়ো ভাই হিসেবে দেখে সেরকম পরিবেশ তেরি করা। এ ছাড়া দলের সদস্যরা যাতে কাজটি উপভোগ করে সেই ব্যবস্থা করবেন। যদিও ব্যক্তিগত ব্যাপার অনেক সময় বাস্তব অবস্থার সাথে মিলতে চায় না, কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে যেগুলি সমন্বয়ের মাধ্যমে দলগত কাজকে উৎসাহ দেয় যেমন—

(ক) পদমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদায় কাছাকাছি থাকা।

(খ) ব্যক্তিগত চিন্তা ও ভাবনার চেয়ে যৌথ চিন্তা এবং যৌথ ভাবে আলাচনায় যে ভালো ফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে, বিশেষ করে যেখানে সমষ্টির উন্নয়নই লক্ষ্য সেখানে।

(গ) একই ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা তৈরি করা।

(ঘ) ব্যক্তিগত এবং অসংলগ্ন কাজ করলে সেই কাজের চেয়ে যৌথভাবে এবং সমন্বয় রেখে কাজ করলে সেই কাজ খুব বেশি ফলপ্রসু ও স্থায়ী হবে, এই ধারণা তৈরি করা।

৬.২. অভিসৃতি বা কেন্দ্রীয়করণ (Convergence)

প্রস্তাবনা—

অভিসৃতি কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতির আলোচনায় এর অর্থ বিভিন্ন ধনী ও দরিদ্র্য দেশের দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে প্রায় একই হারে উন্নয়ন।

এশিয়ার উন্নতিশীল দেশের ক্ষেত্রে বর্তমান অভিসৃতি নীতিটি উন্নয়নের বিশেষকরে পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অভিসৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষুদ্র তফাত আছে। সমন্বয় মানে হল বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সহ-যোজন। অপরদিকে অভিসৃতি হল একই বিন্দুর অভিমুখীন হওয়া বা করা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগগুলি আলাদা ভাবে কাজ করলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বা বিশেষ কমিটির ছত্রছায়ায় আনা। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সুষ্ঠু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অভিসৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষ্য এবং অন্যান্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারে মাধ্যমে শ্রম, সময় অর্থের অপচয় রোধ করে যে-কোনো কর্মদ্যোগকে সাফল্য দিতে গেলে সমন্বয় এবং অভিসৃতি এই দুই পন্থা গ্রহণই অত্যন্ত কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়।

৬.৩. গ্রাম উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

গ্রামীণ জনসংখ্যার বিশেষত গরীব গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার উন্নতির উদ্যোগই হল গ্রাম উন্নয়ন। গ্রাম উন্নয়ন কার্যাবলি নানা ভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে পরে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বাণিজ্য, বিদ্যুতের জোগান ইত্যাদি। গ্রামের দরিদ্র্য জনসাধারণের কাছে নানা উন্নয়নমূলক কাজের সুবিধাটুকু পৌঁছে দেওয়া হল গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্য। এই দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভাগ চাষি, জমিহীন কৃষক শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর, মহিলা, বেকার যুবক সম্প্রদায় প্রভৃতি।

এদেশে গ্রাম উন্নয়নের প্রাথমিক লক্ষ্য হল দারিদ্র দূরীকরণ এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে যে সমস্ত আর্থ-সামাজিক ত্রুটিগুলি জড়িয়ে আছে তা দূর করা। প্রতিষ্ঠানগত সুবিধার উন্নতি ঘঠলে একদিকে যেমন উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি অপরদিকে বণ্টন, ভোগ ও কল্যাণেরও প্রসার ঘটবে। কেবল কৃষি উৎপাদনশীলতা বা গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রগতির হার বাড়ালেই চলবে না সেই সঙ্গে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কাছে এই উন্নয়নের সুফল যাতে গিয়ে পৌঁছোয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হল

ক. গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

খ. আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

গ. উন্নয়ন ও শ্রমবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো এবং

ঘ. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকতর অংশগ্রহণের সুবন্দোবস্ত করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে গেলে দরকার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা ও প্রসার ঘটানো কেননা এর ফলে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি মসৃণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামোর পরিসর বিশাল। এটা শুধু ব্যাংক, সমবায়, পঞ্চায়েত প্রভৃতির ভূমিকার মধ্যেই সীমিত আছে বলে ভাবা ঠিক হবে না।

গ্রামীণ পরিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত গ্রামীণ ঋণ, সমবায় ও গ্রাম উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে। প্রথমেই আমরা গ্রামের আর্থিক পরিকাঠামো বা গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা করতে পারি।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Reserve Bank of India) স্বাধীনতার পরেই গ্রামাঞ্চলে আর্থিক পরিকাঠামো পর্যালোচনার জন্য যে সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি গঠন করে তার রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য (দশ শতাংশেরও কম) অথচ পেশাদার ও অপেশাদার মহাজনেরা মোট ঋণের ৭৫ ভাগেরও বেশি জোগান দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই মহাজনের অত্যধিক সুদের হার ও শোষণ গ্রামীণ জনসংখ্যার দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠানগত ঋণের সুযোগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য স্বাধীনতার পরে সরকারিভাবে এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠানগত ঋণের উৎস প্রধানত তিনটি—

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক, খ. সমবায় সমিতি ও গ. সরকারি ঋণ। প্রথমে আমরা ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ঋণসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি আলোচনা করতে পারি।

(ক) রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Reserve Bank)

রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের প্রথম থেকেই কৃষিঋণের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। রিজার্ভ ব্যাংক পরোক্ষভাবে

অর্থাৎ রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করে। ১৯৮২ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক (National Bank for Agriculture and Rural Development or NABARD) স্থাপিত হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে NABARD নামক একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই কৃষির উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা প্রমাণ করে। NABARD কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যাপারে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকেও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির জন্য ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যাতে পরিকল্পনা রূপায়ণে অংশগ্রহণ করে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে পারে তার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেয়।

(খ) **বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Commercial Bank)**

ভারতে ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হল, গ্রামাঞ্চলে এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ঘটেনি। স্বাধীনতার সময় বা তার পরবর্তী কালে সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অধিকাংশই শহরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে তা অনেকখানি সম্প্রসারিত হয় গ্রামাঞ্চলকেও পরিসেবা দান করেছে। মূলত কৃষিঋণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে সরকার ১৪টি ও পরবর্তী কালে আরও কিছু ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ হয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা উৎপাদন ঋণ, উন্নয়ন ঋণ ও আনুষঙ্গিক ঋণ। এ ছাড়া ব্যাংক পরোক্ষভাবে সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সংস্থা, শস্য বিপণন সংস্থা, মজুত সংস্থা, রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদ ইত্যাদি সংস্থাকে কৃষি এবং কৃষির আনুপাতিক কর্মের জন্য গৃহীত প্রকল্পে ঋণদান করে থাকে। ব্যাংকের ঋণদানের আলোচনায় অনিবার্যভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের ধারণাটি এসে পড়ে কেননা ব্যাংক জাতীয়করণের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল এই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের ধারণাটি এসে পড়ে কেননা ব্যাঙ্ক জাতীয়করনের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল এই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। গ্রাম উন্নয়নে এদের ভূমিকা অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রের জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের শাখাবিস্তার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি সমবায় ঋণদান সমিতির প্রসারে উৎসাহ প্রদান, নির্বাচিত প্রকল্প সমূহে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া। গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ঋণ প্রদান, লিড ব্যাংক স্কিম, গ্রামীণ সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে উন্নয়নের কাজে লাগানো। গ্রামীণ উন্নয়নে সুসংহত প্রকল্পে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ প্রভৃতি হল জাতীয়করণের পরে ব্যাংকগুলির অন্যতম প্রধান অবদান।

শাখাবিস্তার এবং গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গেলেও গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে সেরকম উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ঋণদানে অত্যধিক দেরি, কৃষকের কাছে ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা, বন্ধকি বস্তুর অভাব, রাজনীতির অনুপ্রবেশ, ব্যাংককর্মীদের সহযোগিতার অভাব এবং বকেয়া ঋণের সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কর্মের ক্ষেত্রে ঋণদান বৃদ্ধি পেলেও তা আশানুরূপ নয়।

(গ) **আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Regional Rural Bank)**

গ্রামাঞ্চলে কৃষক, কুটীরশিল্পী, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির লোকেদের ব্যাংক ঋণের সুবিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক জাতীয়করণের পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে স্থাপন করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট মূলধনের ৫০% দেন কেন্দ্রীয় সরকার, ১৫% দেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং ৩৫% পোষক ব্যাঙ্ক। সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচির সঙ্গে আঞ্চলিক ব্যাংকের কার্যাবলী জড়িয়ে আছে এদের প্রদত্ত

স্বল্পমেয়াদি এবং মেয়াদি ঋণের প্রায় ৯০% পেয়েছে দুর্বলতর শ্রেণির মানুষেরা।

(ঘ) **জমি উন্নয়ন ব্যাংক-এর ভূমিকা (Role of Land Development Bank)**

ভারতে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রধান উৎস হল জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank or LMB) ১৯২৯ সালে দেশ জুড়ে প্রথম জমি বন্ধকি ব্যাংক চালু হয়। তার আগে পাঞ্জাবের ঝিন্দে প্রথম জমিবন্ধকি ব্যাংক চালু হয়েছিল। LDB তার সদস্যদের জমি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। ঋণের মেয়াদ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর (কোনো কোনো রাজ্যে) রাখা হয়। সুদের হার তুলনামূলক ভাবে খুবই কম হয়। LDBগুলি কিন্তু চাষিদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারে না। তা ছাড়া ক্রমবর্ধমান অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ জমি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেছে।

(ঙ) **কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ভূমিকা (Role of NABARD)**

কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক হিসেবে NABARD দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

১। কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং

২। পুনঃঅর্থ সরবরাহের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান

NABARD এর প্রধান কাজ—

১। কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, গ্রামীণ কারিগর, হস্তচালিত ও গ্রামীণ শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজের জন্য এই ব্যাংক পুনঃঅর্থসংস্থান করে। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য ঋণের পুনঃসংস্থান করে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়নের অংশ নেয়।

২। রাজ্য সমবায় ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, জমি উন্নয়ন ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক সংস্থাকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে।

৩। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির শেয়ার মূলধনে রাজ্য সরকারগুলি যাতে অংশগ্রহণ করে সেজন্য ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে।

৪। ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত যে-কোন সংস্থাকে NABARD দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করতে পারে। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের সাথে জড়িত যে-কোনো সংস্থার শেয়ার মূলধন গ্রহণে অংশগ্রহণ বা তাদের সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৫। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের সঙ্গে ভারত সরকারের ও পরিকল্পনা কমিশনের কাজের সমন্বয় করে।

৬। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ও অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকগুলির কাজকর্ম তদারকি করে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে তাদের উদার ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং পরিবেশে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে সেই জন্য Credit Monitoring চালু করেছে।

৭। কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে গবেষনা।

৮। গ্রামীণ ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

৯। কৃষকদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮-৯৯ সালে কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করা।

১০। স্বয়ং সাহায্যকারী গোষ্ঠী (SHG) গড়ে তোলা ও ব্যাংকের সাথে যোগাযোগে NABARD-এর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে।

৬.৪. সমবায় প্রতিষ্ঠান (Co-operative Society)

ধারণা—

সমবায়ের ধারণাটি বিভিন্ন চিন্তাবিদদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে বা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন রবার্ট আওয়েন একে উল্লেখযোগ্য বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাত্মা গান্ধি সমবায়কে গ্রামীণ সমাজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থনীতিবিদরা ধনতান্ত্রিক সমাজে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানব সমাজের মুক্তির উপায় হিসেবে সমবায়কে দেখেছেন।

সমবায় ভিত্তিক সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি বলা হয়।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন তারা সমবায় সমিতি গঠন করেছে বলা হয়।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা সমবায়ের কয়েকটি বৈশিষ্টের সন্ধান পাই ঃ

১। সমবায় সমিতি হল মূলত দরিদ্রের সংগঠন। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিজের চেষ্টায় অনেক কাজ করতে পারে না। সেজন্য তারা সমবায় সমিতিতে সংঘবধ্দ হয়ে অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে।

২। সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হল সাম্যের সম্পর্ক। এখানে প্রত্যেক সদস্যই সমান সুযোগের অধিকারী।

৩। এই সমিতিতে সদস্যরা স্বেচ্ছায় যোগ দেয় আবার স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করতে পারে।

৪। এই সমিতির উদ্দেশ্য হল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার সাধন করা।

৫। এই সমিতির সদস্যরা পরস্পরের সাথে পরিচিত এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকে।

সমবায়ের বৈশিষ্ট্য থেকেই পরিষ্কার যে ভারতের মত দেশে কৃষিক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য। কারণ এদের কৃষকরা অধিকাংশই হল নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। এই অবস্থায় সমবায় হল গ্রামোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। সমাজসেবক রাই ফ্রিজেনের নেতৃত্বে জার্মান কৃষকেরা সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভারতবর্ষে সমবায় সমিতিকে নানাভাবে ভাগ করা যায় যেমন—

(ক) ঋণদান ও অনুদান সমিতি, (খ) এক উদ্দেশ্য সাধক ও বহু উদ্দেশ্য সাধক সমিতি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯০৪ সালে। মূলত কৃষি ঋণের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গড়ে উঠলেও পরবর্তী কালে কৃষি বিপণন, ক্রেতা স্বার্থ রক্ষা, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃধ্দি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেও সমবায়ের প্রসার লক্ষ করা যায়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সমবায় প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় সমিতির জন্য অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৫২-৫২ সালে মোট কৃষি ঋণের মাত্র ৩.১ শতাংশ জোগান দিত সমবায় সমিতিগুলি। বর্তমানে সমবায় ঋণের পরিমাণ বহুগুণ বৃধ্দি পেয়েছে। ভারতের প্রায় ৯৪ শতাংশ গ্রামে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি লক্ষ করা যায়। এই সমিতিগুলি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর ইত্যাদিদের ঋণদানের মাধ্যমে মহাজনের শোষণের হাত থেকে একদিকে যেমন এদের বাঁচিয়েছে অপরদিকে এদের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম করেছে। প্রাথমিক জমি উন্নয়ন ব্যাংকগুলি কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বন্দোবস্ত করেছে। সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমবায় সমিতিগুলির যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় দরিদ্র গ্রামীণ সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

উপরি-উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণদান ছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেও এর যে অগ্রগতি ঘটেছে তা বোঝা যায় ক্রমবর্ধমান তন্তুবায় সমিতি ও সুতাকল সমিতির সংখ্যা দেখে। বিপণনের ক্ষেত্রেও জাতীয় কৃষি সমবায় বাজার ফেডারেশনের সহায়তায় বিভিন্ন দ্রব্য বিপণনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিনি কলগুলি দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০% জোগান দেয়। ভারতীয় কৃষকদের সার সমবায় সমিতির (IFFCO) মাধ্যমে মোট উৎপন্ন সারের একটা মোটা অংশ কৃষকদের বিতরণ করা হয়। বিগত ১০০ বছরে সমবায় সমিতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্বাধীনোত্তোর ভারতে সমবায় সমিতির বেশ কিছু সাফল্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল।

১। সমবায় সমিতিগুলির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে এবং এর আওতায় সারা ভারতের প্রায় সমস্ত গ্রামকেই আনা সম্ভব হয়েছে।

২। সমবায় সমিতি মহাজনেদের শোষণের হাত থেকে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মুক্ত করতে বহুলাংশে সফল হয়েছে।

৩। প্রত্যক্ষ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং NABARD-র সহায়তায় সমবায় সমিতিগুলির মূলধন বেড়েছে, ফলে ঋণদানের ক্ষমতাও বেড়েছে।

৪। তামিলনাড়ু প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে গ্রামে গণবণ্টন ব্যবস্থার মূল ব্যবস্থাপক হিসাবে সমবায় সমিতিগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

৫। চিনি উৎপাদনের ৫০% এবং সার বিতরণের ৬০% যেমন সমবায় সমিতির আওতায় রয়েছে, তেমনি দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমূল (Anand Milk Union Ltd. AMUL) দেশে শ্বেত বিপ্লব (White revolution) ঘটিয়েছে।

৬। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাধীন ভারতের সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু **প্রতিবন্ধকতা** লক্ষ করা যায়। যেমন—

১. সমবায় সমিতিগুলির নিজস্ব তহবিলের অপ্রতুলতা।

২. অনাদায়ি ঋণের আধিক্য।

৩. সমবায় সমিতিগুলির সরকারের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা।

৪. স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দ্বারা সমবায় সমিতির অপব্যবহার।

৫. অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ সমবায় সমিতির সদস্যদের সমিতির কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে অক্ষমতা ও অনিচ্ছা।

৬. সমিতি পরিচালকদের পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের অভাব।

৭. সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব।

৮. ঋণদান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠন করার কম প্রবণতা।

৯. সমিতির কার্যাবলিতে রাজনৈতিক দলাদলি ও রাজনৈতিক নেতাদের অনিশ্চিত হস্তক্ষেপ।

৬.৫. গ্রাম উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা

শিল্পের সংজ্ঞা—

যেসব উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষিজ কাঁচামাল বা অন্যান্য দ্রব্যকে ছোটো বা বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে অন্য কোনো দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয় তাকেই শিল্প বলে। শিল্প ক্ষেত্রে মানুষের প্রচেষ্টায় যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যের প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, লোহার পিণ্ড থেকে ইস্পাত, কাঁচা তুলো থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় উৎপাদন। শিল্পগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় শিল্প সম্মত উপায়ে কাঁচামাল থেকে দ্রব্য প্রস্তুত (Manufacture) এবং নির্মাণকাজ (Construction)। যখন কৃষিজ কাঁচামাল থেকে শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় বা অকৃষিজ উপকরণের সাহায্যে কোনো দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তখন তাকে দ্রব্য উৎপাদন (Manufacture) বলে। অন্যদিকে ঘর-বাড়ি, সেতু-সড়ক, সেচ ও পরিবহন ইত্যাদি গড়ে তোলা হল নির্মাণ শিল্প।

শ্রমের বাজারের ভিত্তিতে শিল্পগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— পারিবারিক শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং ভাড়া করা শ্রমের দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ কারখানা শিল্প।

শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কর্মে পুঁজির প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তির জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, এর ফলে আয় বাড়ে। এজন্যেও শিল্পায়নকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও ব্যবস্থা দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

কৃষি ও শিল্পায়ন—

কৃষি ও শিল্পায়ন এই দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কহীন বা পরস্পরের বিরোধী নয়। এরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। শিল্পায়নের জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। আবার কৃষির আধুনিকিকরণ না হলে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহে শিল্পায়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। কারণ সেক্ষেত্রে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায় না। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রসার না হলে কৃষিরও খুব বেশি উন্নতি করা সম্ভব হয় না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করতে হলে কৃষিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। উপরন্তু আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করার জন্যও শিল্পায়নের প্রসার একটি অপরিহার্য শর্ত। স্বল্পকালীন দৃষ্টিতে কৃষি শিল্পকে পরস্পরের প্রতিদন্দ্বী বলে মনে হয়। কারণ রাষ্ট্রীয় সাহায্য একটিকে দিলে অপরটিকে হয়তো বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচারে তারা পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পোন্নত বহু দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষির উন্নয়ন ঐ দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কৃষি ও শিল্প আসলে পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের দিক থেকে কোনো দেশ যত উন্নতই হোক না কেন, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন না করে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটি সম্পর্ক কয়েকটি শিল্পের বিশেষ করে লক্ষ করা যায়, সেগুলি সম্পূর্ণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যেমন চিনি শিল্প, পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি কৃষিজ কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে।

কৃষি থেকে উৎপাদিত খাদ্য-সামগ্রী সামগ্রিক ভাবে সমস্ত জনসাধারণ ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে যার মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীও থাকেন। উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী না হলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে যা আবার শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

এমন কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ঐ সমস্ত শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সার শিল্প, ট্র্যাক্টর শিল্প, কীটনাশক ঔষধ, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী আছে বলে কৃষিজ খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প দ্রব্যাদি যত বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হবে কৃষক তত বেশি ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে।

দেখা যাচ্ছে শিল্পোন্নয়ন নানাভাবে কৃষি উন্নয়নকে সাহায্য করে, যেমন—

১। কৃষি উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক চাষবাসের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ভাবে চাষ বাস করতে গেলে সেই অনুযায়ী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সে সকল যন্ত্রপাতির সরবরাহ শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্যও শিল্পোন্নয়ন সহায়তা করে। কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কলকারখানা দেশে বেশি গড়ে উঠলেই এইগুলির জোগান বৃদ্ধি পাবে।

২। কাঁচামালের ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন এবং কাঁচামালকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে কিছু শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে নিয়ে শিল্পে নিযুক্ত করা যায়, যার ফলে কৃষিক্ষেত্রকে আরো সুদৃঢ় করা যায়।
সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, শিল্পের উন্নয়নের সাথে কৃষির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। উল্লেখিত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, জমি বাজারের (Land Market) প্রভাব শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রের প্রযোজ্য। উৎপাদন বাজারের (Product Market) প্রভাব শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শ্রমবাজারের (Labour Market) প্রভাব কৃষি শিল্প ততটা সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রও শিল্পকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে যেমন ঃ

১। নগরাঞ্চলে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করে।

২। কৃষকের হাতে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপযোগী বাজারের সৃষ্টি হয়।

৩। বিদেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪। কৃষিজ দ্রব্যের ব্যাবসা বাণিজ্যের দ্বারা অর্জিত অর্থ মূলধন সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যায়। আবার সাথে সাথে কৃষির উন্নতি সাধিত না হলে দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্‌বৃত্ত জনিত সমস্যা, মুদ্রাস্ফিতি, অতিরিক্ত নগরীকরণ এবং প্রচলিত সামাজিক ধাঁচের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব।

ভারতের অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বৃহদায়তন শিল্পায়নের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। যেমন ইংল্যান্ডের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ উৎপাদন করে এবং মোট নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ২৯ ভাগকে নিয়োগ করে। জাপানে শতকরা ৮০ ভাগে শিল্প প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট। ভারতে পরিকল্পনাগুলিতেও এই ধরনের শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্বের কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে কর্মসংস্থান।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি শ্রমনিবিড়, তাই এইগুলিতে নিয়োগ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বিগত পাঁচ দশক ধরে ভারতে যে শিল্পায়ন ঘটেছে তা নানান দিক থেকে অভিনব ও চমকপ্রদ হয়েও তাতে দ্রুত বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিশেষ বাড়েনি। এর কারণ হল এগুলি মূল ও ভারী শিল্পের অন্তর্গত, এগুলি অতি মাত্রায় মূলধন নিবিড় ও এখানে নিয়োগ সম্ভাবনা কম। ভারতে কৃষিজীবীদের অধিকাংশই অলাভজনক ও ক্ষুদ্রায়তন জোতে চাষ করে। কৃষি এদের প্রধান জীবিকা হলেও কৃষি থেকে সারাবছরের অন্নসংস্থান হয় না। যখন মাঠের কাজ থাকে না তখন পার্শ উপজীবিকা হিসেবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পই এদের প্রধান ভরসা ও আশ্রয়স্থল। সে কারণেই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পও গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৬. প্রশ্নাবলি

১। সমন্বয় বলতে কী বোঝেন? এর উপকারিতা কী?

২। সমন্বয়ের ধরন, উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। গ্রাম উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা কী?

৪। নবার্ড-এর প্রধান দায়িত্বগুলি বিস্তারিতভাবে লিখুন।

৫। শিল্প ও কৃষি কেন পারস্পরিক নির্ভরশীল? গ্রাম উন্নয়নে তাদের ভূমিকা কী?

একক—৭ ❑ আদিবাসী উন্নয়ন — ধারণা, গুরুত্ব ও পর্যালোচনা

গঠন

৭.১. প্রস্তাবনা

৭.২. আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তৃতি

৭.৩. অর্থনৈতিক অবস্থা

৭.৪. আদিবাসীদের সমস্যা

৭.৫. সংবিধান ও আদিবাসী উন্নয়ন

৭.৬. আদিবাসী উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটি

৭.৭. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আদিবাসী উন্নয়ন

৭.৮. আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প

৭.৯. গ্রন্থপঞ্জি

৭.১০. প্রশ্নাবলি

৭.১. প্রস্তাবনা

ভারতের জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ মানুষ আদিবাসী। আদিবাসী জনসংখ্যার বিচারে আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান। আদিবাসীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সমাজব্যবস্থা ও জীবনধারা রয়েছে। অন্যান্য জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তারা বসবাস করে। আদিবাসীদের নিজস্বতা বরাবরই সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নের সমস্যা নৃতত্ত্বের গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারা পর্যালোচনা করার পূর্বে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনা করা প্রয়োজন।

'আদিবাসী' কথার অর্থ 'আদি-বাসিন্দা'। 'উপজাতি' বা 'তপশিলি উপজাতি' শব্দটি 'আদিবাসী' শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আদিবাসী হল এক ধরনের জনগোষ্ঠী যারা সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে, নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, সম-মনোভাবাপন্ন এবং নিজস্ব সামাজিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তাদের গোষ্ঠী চেতনা সুদৃঢ়। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এদের বসবাস। তাই এদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানি, ওঙ্গে, জারওয়া এবং ঝাড়খণ্ডের বীরহোড় ইত্যাদি জনগোষ্ঠী খুবই পশ্চাৎপদ। তারা মূলত পশুপাখি শিকার, ফলমূল সংগ্রহ ও মৎস্য শিকার করে জীবন ধারণ করে। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি ও গারো উপজাতি আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই স্বচ্ছল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজ, রাজস্থানের মীনা উপজাতির মানুষদের অন্যান্য প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা কঠিন।

তবে, আদিবাসীরা সাধারণত তাদের পৃথক সত্তা বজায় রেখে জীবনধারণ করে। তারা যে-কোনো ধর্মের মানুষ হতে পারে।

সংবিধানের ৩৪২ নং ধারায় যারা নথিভুক্ত তারাই 'তপশিলি উপজাতি' হিসেবে পরিচিত। এটি একটি প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক ধারণা। সংবিধানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনো একটি আদিবাসী সম্প্রদায় বা ঐ গোষ্ঠীর বিশেষ একটি অংশকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দিতে পারেন। আদিবাসী ভিন্ন অন্য জনগোষ্ঠী নথিভুক্ত হতে পারে না। আদিবাসীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯৩১ সালে Primitive Tribes, ১৯৩৫ সালে Backward Tribes এবং ১৯৫০ সালে Scheduled Tribes ইত্যাদি ধারণা উল্লেখযোগ্য।

৭.২. আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তৃতি

আদিবাসীদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন—

১। উঁচু-নীচু ভেদাভেদহীন জনগোষ্ঠী, কোনো সামাজিক স্তর বিন্যাস নেই।

২। সহজ সরল প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে।

৩। উদ্‌বৃত্ত বা লাভ করতে পারে না।

৪। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে, নিজস্ব ভাষায় কথা বলে।

৫। নিজেদের মধ্যে বিনিময় প্রথা রয়েছে, অন্য জনগোষ্ঠীর ওপর তেমন নির্ভর করে না।

৬। নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

ভারতবর্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪২৮। জনসংখ্যার দিক দিয়ে গণ্ড প্রথম, ভিল দ্বিতীয় এবং সাঁওতাল তৃতীয়। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ১২.৩৩ শতাংশ, মধ্য ভারতে ৫৫ শতাংশ, দক্ষিণ ভারতে ৬.৪৯ শতাংশ, আন্দামান ও নিকোবরে ০.১৩ শতাংশ ও পশ্চিম ভারতে ২৬.০১ শতাংশ আদিবাসী বাস করে।

৭.৩. অর্থনৈতিক অবস্থা

জীবিকা অনুসারে আদিবাসীদের নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ

১। শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ

কেরালার কাদার, তামিলনাড়ুর কুরুম্বা ও পালিয়ান, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গে, জারওয়া, সেন্ধি টনালিজ, ঝাড়খণ্ডের বীরহোড় এবং মধ্য ভারতের করেয়া, খেড়িয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মানুষ জঙ্গলে শিকার করে, ফলমূল সংগ্রহ করে এবং মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। এইভাবে জীবিকা সংগ্রহে অনিশ্চয়তা অনেক বেশি। তাই এদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ।

২। স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ (Shifting Cultivation)

প্রায় ১২ শতাংশ আদিবাসী স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ করে। এদের অধিকাংশই উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতের পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা। আদিবাসীরা জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে আগুন জ্বালিয়ে জমি পরিষ্কার করে। পরবর্তীকালে সেই ছাইতে বীজ ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে চাষ করার ফলে ভূমিক্ষয় ও জঙ্গল ধবংস হয়। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। উৎপাদনেও অনিশ্চয়তা থাকে।

৩। পশুপালন

নীলগিরি পর্বতে বসবাসকারী টোডা, হিমাচলপ্রদেশের গাদ্দি, ক্রয়াল, মধ্যপ্রদেশের নাগাশিয়া, গুজরাটের মালধন ইত্যাদি আদিবাসী পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাণীজ দ্রব্য বিক্রির জন্য তাদের সঙ্গে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষের যোগাযোগ থাকে। সাধারণত বিনিময় প্রথা দেখা যায়।

৪। চাষবাস

অধিকাংশ আদিবাসী মানুষের পেশা চাষবাস। সমতলভূমির অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তারা চাষবাস রপ্ত করেছে। এরা সাধারণত বলদ, লাঙল ব্যবহার করে। তাদের জমি সেচ সেবিত নয়। ফলস্বরূপ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেকের জমি না থাকায় তারা কৃষিশ্রমিক হিসেবে অন্যের জমিতে চাষ করে।

৫। অন্যান্য পেশা

বেশ কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভর করে। অনেকে নাচগান করে, সাপ খেলিয়ে, শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করে। চাকুরিতে আসন সংরক্ষণের ফলে অনেকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে। বেসরকারি সংগঠন, পৌরসভা এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও অনেকে কাজ করে।

৭.৪. আদিবাসীদের সমস্যা

প্রবহমান কাল ধরে আদিবাসীরা পাহাড়ি জঙ্গল এলাকায় বসবাস করে আসছে। তাদের সঙ্গে সমতলের মানুষের যোগাযোগ খুবই কম। ব্রিটিশ শাসনের সময় তাদের আলাদা করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে আদিবাসীদের জাতীয় স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে এখনো দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা রয়ে গেছে। অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে ঋণগ্রস্ত অবস্থা, জমি হস্তান্তর, স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ, বংশপরম্পরায় শ্রমদান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, শিল্পায়নের ফলে উচ্ছেদ, বন আইন, যোগাযোগ সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) ঋণগ্রস্ত অবস্থা

আদিবাসীদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল তাদের ঋণজর্জর অবস্থা। তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। দুবেলা দু-মুঠো আহারের সংস্থান করতে পারে না। ফলে সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় ২৫-৬০ শতাংশ হারে সুদ দিতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায় মহাজনদের টাকা শোধ না করতে পারায় বংশপরম্পরায় তাদের শ্রম দিতে হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) জমি হস্তান্তর

সুদখোর মহাজনদের ঋণ শোধ না করতে পারায় আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর হয়ে যায়। ফলে তারা ভূমিহীন হয়ে পড়ে। মধ্যপ্রদেশের করয়া (Korwa), উত্তরপ্রদেশের থারু (Tharu) এবং বক্সা (Boksa) আদিবাসীদের মধ্যে এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের কারণে তারা ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং জমি হাতছাড়া করে সর্বসান্ত হয়। কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, রাজস্থান ইত্যাদি জায়গায় আইন প্রণয়ন করে জমি হস্তান্তর বন্ধ করা হয়েছে। সরকার থেকে নেওয়া ব্যবস্থাগুলির মধ্যে (ক) স্ত্রীর নামে জমি রাখা, (খ) জমি মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত, (গ) মহাজনদের শাস্তি, (ঘ) শোষণ প্রতিরোধ, (ঙ) আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(গ) বংশ পরম্পরায় শ্রমদান

যেহেতু আদিবাসীরা ঋণগ্রস্ত থাকে, ঐ অর্থ শোধ করতে না পারলে বংশ পরম্পরায় তাদের শ্রমদান করতে হয়। তপশিলি জাতি ও উপজাতি মানুষদের মধ্যে এই ধরনের প্রথা বেশি দেখা যায়। করয়া, ভুইয়া, কন্দ, কোল্টা, থারু এবং বক্সা উপজাতির মানুষ চিরাচরিতভাবে বংশ পরম্পরায় শ্রমদান করে। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। জমি হাতছাড়া হয়। এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকার বঁধূয়া শ্রমিক আইন ১৯৭৬ এবং শিশু শ্রমিক আইন ১৯৮৭ জারি করে। ১৯৭৬ সালের আইন অনুসারে ব্লক অধিকর্তা এই ধরনের আদিবাসীদের শনাক্ত করবে। আই. আর. ডি. পি., এন. আর. ই. পি. এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাও করা হয়।

(ঘ) শিক্ষার অভাব

আদিবাসীদের মধ্যে বরাবরই শিক্ষার হার খুবই কম। ফলে সরকারি চাকুরিতে তাদের সংখ্যাও কম। আদিবাসীরা মূলত পাহাড়ে, জঙ্গলে বাস করে। সব জায়গায় শিক্ষার সুযোগ পৌঁছোয়নি। অনেক সময় দেখা গেছে অন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক আদিবাসীদের মাতৃভাষায় কথা বলতে না পারায় পড়ুয়াদের কাছে শিক্ষকের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগও কম। বর্তমানে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলছে। অনেক জায়গায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অভাবও চোখে পড়ে।

(ঙ) শিল্পায়ন

সাধারণত আদিবাসীদের বসতি এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু তারা এর সুবিধা নিতে পারে না। শিল্পায়ন এবং বিভিন্ন নদীতে বড় বড় বাঁধ নির্মাণের ফলে অনেক আদিবাসী সম্পত্তি ও জীবিকা হারিয়েছে। তারা গভীর জঙ্গলে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। শিল্পায়নের ফলে ঐ এলাকায় অন্যান্য মানুষ এসে বসবাস করতে শুরু করে। এর ফলে আদিবাসীদের শোষণ বঞ্চনা আরো বাড়ে, তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাড়ে, সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসে। দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে আদিবাসীরা শিল্পে কাজের সুযোগ পায় না। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এইভাবে তারা একদিকে নিজস্ব জগৎ হারায় আবার শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগও নিতে পারে না।

(চ) জঙ্গলের অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা

জঙ্গলের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে বন আইনের (Forest Policy 1952) মাধ্যমে জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। অনেক সময় বনকর্তা, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার তাদের শোষণ করেছে। তাদের সংগৃহীত বনজ সম্পদ স্বল্প দামে কিনছে। রাস্তাঘাট, সরকারি গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে কর্মরত আদিবাসীদের কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে।

(ছ) স্বাস্থ্য সমস্যা

সাধারণত আদিবাসীদের শরীর স্বাস্থ্য সুঠাম হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা জলবাহিত রোগ, ম্যালেরিয়া ইত্যাদিতে ভোগে। এখনো অনেক জায়গায় তারা নদী বা ঝরনার জল পান করে। ফলে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। আবার জঙ্গলে বাস করে বলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অনেকে আবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় বলে প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। মা ও শিশুর মধ্যে অপুষ্টির হার খুব বেশি দেখা যায়। তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব একটা সচেতন নয়। দারিদ্র্যের সমস্যা রয়েছে। আদিবাসী এলাকায় স্বাস্থ্য পরিসেবাও সঠিকভাবে পৌঁছোয় না।

(জ) যোগাযোগ

আদিবাসী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। তারা যেহেতু প্রত্যন্ত এবং পাহাড়ি এলাকায় বাস করে তাই সব জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া, অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসাকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া, উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার।

(ঝ) প্রচলিত জীবনধারার মনস্তত্ত্ব

আদিবাসীরা প্রচলিত জীবনধারা অনুসরণ করে। পরিবর্তনের মানসিকতা দেখা যায় না। চিরাচরিত প্রথায় চাষবাস, পশুপালন, জঙ্গল থেকে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করেই তাদের দিন গুজরান হয়। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কিংবা নতুন দক্ষতা অর্জনের মানসিকতা খুব কম। ফলস্বরূপ, আদিবাসীদের জন্য রূপায়িত অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। নতুনকে গ্রহণ করার অনীহা চিরকালের। ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা কম। অনেক সময় অন্যদের বিশ্বাসও করে না।

৭.৫. সংবিধান ও আদিবাসী উন্নয়ন

ভারতীয় সংবিধানের ২৪টি ধারায় তপশিলি জাতি (Scheduled Caste) ও তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু দিক নির্দেশ করা হয়েছে। নিম্নে ধারাগুলি বিশদ আলোচনা করা হল ঃ

২৪টি ধারার মধ্যে ৮টি ধারা সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত বিষয়। এইগুলি হল— ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৯ এবং ৩৫ নং ধারা।

১৫ নং ধারা — ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না এবং সবাই মন্দির, দোকান, হোটেল, স্কুল এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য যে-কোনো স্থান যেমন কুয়ো, পুকুর, রাস্তা ইত্যাদিতে অবাধে ব্যবহার করতে পারবে।

১৬ নং ধারা — সরকারি চাকুরিতে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৭ নং ধারা — অস্পৃশ্যতা অপরাধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯ নং ধারা — কথা বলার স্বাধীনতা, দেশের যে-কোনো জায়গায় যাতায়াত, বসবাস এবং সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে।

২৩ নং ধারা — বাধ্যতামূলক শ্রমদান রোধ করা, Prohibiton of traffic in human beings.

২৫ নং ধারা — Freedom of conscience, পেশা ও ধর্মাচারণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

২৯ নং ধারা — সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত অধিকার দান করা হয়েছে।

৩৫ নং ধারা — সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকার পাওয়ার আইনগত ব্যাপারে বলা হয়েছে।

এছাড়া আরো কয়েকটি ধারার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩৮ নং ধারা — সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

৪৬ নং ধারা — তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।

১৬৪ নং ধারায় বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশে আলাদা আদিবাসী মন্ত্রক গঠনের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রক এই কাজ দেখবে।

২৪৪ নং ধারা — তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার প্রশাসন সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৪৪ (১) নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি মনে করলে যেখানে তপশিলি জাতি ও উপজাতি মানুষ বাস করে এমন এলাকাকে তপশিলি এলাকা (Scheduled Area) বলে ঘোষণা করতে পারেন। রাজ্যপাল উক্ত এলাকার প্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন।

২৭৫ নং ধারা — সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায়ের তপশিলি এলাকার (Scheduled Area) উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের চতুর্দশ অধ্যায়ে **৩২০ নং ধারায়** পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চাকুরিতে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ষোড়শ অধ্যায়ের **৩৩০ নং ধারায়** তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

৩৩২ নং ধারা — বিধানসভায় আসন সংরক্ষণসংক্রান্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩৩৪ নং ধারা — আসন সংরক্ষণের মেয়াদ এবং বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

৩৩৫ নং ধারা — চাকুরিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতির দাবিসংক্রান্ত বিষয়ে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।

৩৩৮ নং ধারা — তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ অফিসার নিয়োগ এবং তার দায়িত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৩৩৯ নং ধারা — তপশিলি এলাকার প্রশাসনে ও কল্যাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে।

৩৪২ নং ধারা — বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতি হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন।

৩৬৬ নং ধারায় তপশিলি জাতি ও উপজাতির অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

এইভাবে, সংবিধানের সাহায্যে (১) লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভায় তপশিলি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব, (২) কয়েকটি রাজ্যে আলাদা মন্ত্রণালয়, (৩) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরির সুযোগ, (৪) অস্পৃশ্যতা রোধ, (৫) শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ, (৬) আলাদা তপশিল এলাকা গঠন ও তার উন্নয়ন ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় আইন বা নির্দেশ জারি করে আদিবাসীদের জমি সুরক্ষা, নিজ নিজ প্রথা অনুসারে বিবাহ, জমির উত্তরসূরি নির্বাচন ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে জনসংখ্যা অনুপাতে তপশিলি উপজাতির প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া 'ট্রাইব্‌স অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল', 'কমিশনার ফর এস. সি. অ্যান্ড এস. টি' এবং 'পার্লামেন্টারী কমিটি ফর এস. সি. অ্যান্ড এস. টি' ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে তপশিলি উপজাতির উন্নয়ন ও তার পর্যালোচনা করা হয়।

ট্রাইব্‌স অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ঃ

সংবিধানের পঞ্চম তপশিলে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে **ট্রাইব্‌স অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল** গঠনের কথা বলা হয়েছে। তপশিল এলাকা থাক বা না থাক তপশিলি জাতির মানুষ থাকলেই এই কাউন্সিল গড়তে হবে। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা অনধিক কুড়ি জন হবে এবং তার তিনের চার অংশ সদস্য হবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বিধানসভার সদস্য। এই কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নের ব্যাপারে উপদেশ দেবে।

কমিশনার ফর এস. সি. অ্যান্ড এস. টি. ঃ

সংবিধানের ৩৩৮ নং ধারা অনুসারে সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশনার (Commissioner for SC & ST) নিয়োগ করবেন। কমিশনারের অফিসের দায়িত্ব হল— আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ঠিক করা। তারা সংবিধান অনুসারে কাজ করবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, সরকার ও লোকসভাকে আদিবাসীদের জন্য প্রকল্প, উন্নয়নের প্রগতি, সুরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিবেদন দেবে। কমিশনারের দায়িত্ব হচ্ছে আদিবাসীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তদন্ত ও বিশ্লেষণ করা এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন প্রদান করা। ঐ প্রতিবেদন রাজ্যসভা ও লোকসভাতে পেশ করা হয়।

পার্লামেন্টারী কমিটি ফর এস. সি. অ্যান্ড এস. টি. ঃ

লোকসভার স্পীকার লোকসভা ও রাজ্যসভার কয়েকজন প্রতিনিধি ঠিক করে এই কমিটি গঠন করেন এবং একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। এই কমিটি তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংবিধানে উল্লিখিত সুযোগসুবিধা প্রদান বা তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। কমিটি সারা দেশে আদিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্মেরও মূল্যায়ন করে।

৭.৬. আদিবাসী উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিভিন্ন রকম। ব্রিটিশ শাসনের সময় তাদের ভারতীয় জীবনধারার মূল স্রোত থেকে পৃথক রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে Scheduled District Act অনুসারে প্রশাসনিক দিক দিয়ে এই সব এলাকাকে আলাদা রাখা হয়। পরবর্তীকালে Govt. of India Act ১৯১৯ এবং ১৯৩৫-এ একই ধারা বজায় রাখা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নতুন নীতি গ্রহণ করা হয় এবং তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতে সামিল করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৫৪ সালে এলাকা উন্নয়ন (Community Development) পরিকল্পনা এবং আদিবাসীদের জন্য কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেশ কিছু কমিশন এবং কমিটি গঠন করা হয়। তারা আদিবাসীদের সমস্যা অনুধাবন করে তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করেন। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য কমিশন ও কমিটির নাম দেওয়া হল—

১। দি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার টিম অব্ দি কমিটি অন্ প্ল্যান প্রোজেক্টস - ১৯৫৯

২। দি ভেরিয়ার এলুইন কমিটি অন ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট

৩। দি কমিটি অন্ ট্রাইব্যাল ইকনমি ইন্ ফরেষ্ট এরিয়া - ১৯৬৭

৪। ধেবর কমিটি - ১৯৬১

(সুসংহতভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন— খাদ্য, পানীয়জল, চাকুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গ্রামের রাস্তার ওপর জোর দেওয়া ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।)

৫। দি টাস্ক ফোর্স অন্ ডেভেলপমেন্ট অব্ ট্রাইব্যাল এরিয়া - ১৯৭২

(বসবাসের এলাকা, পেশা ও সামাজিক বিষয় পর্যালোচনা করে নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণ করা যাতে আদিবাসীরা উপকৃত হয়।)

৬। দি দুবে কমিটি ১৯৭২ (জাতীয় স্তরে আদিবাসী উন্নয়নের সমস্যা পর্যালোচনা এবং সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা)

৭। দি স্টাডি টিম অন্ কো-অপারেটিভ স্ট্রাকচার ইন্ ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এরিয়া ১৯৭৬

৮। দি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন্ ডেভেলপমেন্ট অব্ এস. টি. (১৯৮৫-৯০)

৭.৭. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আদিবাসী উন্নয়ন

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসী উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

পঞ্চমার্ষিকী পরিকল্পনা	উদ্দেশ্য এবং সাফল্য
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১ - ৫৬)	পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নের জন্য মোট ৩৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। ১৭,৩৬ কোটি টাকা তপশিলি উপজাতির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও গৃহ নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬ - ৬১)	তপশিলি উপজাতি উন্নয়নের জন্য ৪৮,৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের (কৃষি, কুটিরশিল্প, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, সমবায় এবং বহুমুখী ট্রাইবাল ব্লক গঠন) ওপর জোর দেওয়া হয়।
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১ - ৬৬)	ভেরিয়ার এলুইন কমিটির প্রস্তাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গঠিত ব্লকগুলির নতুন নামকরণ হয় ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, যোগাযোগ ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়। ৪১৫টি ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক গঠিত হয়। ২৫,০০০ জনসংখ্যা পিছু (যেখানে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ আদিবাসী আছে) একটি ব্লক গঠন করা হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা দূর করার জন্য পর পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬ - ৬৯) করা হয়।	
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৯ - ৭৪)	এই পরিকল্পনা শেষে ৫০৪টি ব্লকের অধীনে ৪৩ শতাংশ আদিবাসী আওতাভুক্ত হয়। প্রায় ৭৫ কোটি টাকা আদিবাসী উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। কিছু নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। আদিবাসী কলোনি স্থাপন, সমবায়, কৃষক সমিতি, বন-দপ্তর থেকে আদিবাসীদের কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। আদিবাসী পরিবারের দিকে লক্ষ রেখে কৃষি মন্ত্রক থেকে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৪ - ৭৯)	আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনার এক উল্লেখযোগ্য সময়। ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান তৈরি করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (ITDP) শুরু হয়। এই পরিকল্পনার শেষে ১৮টি সাব্ প্ল্যান হয়, ৬৫ শতাংশ আদিবাসী এর আওতাভুক্ত হয়, ১৭৯টি ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (ITDP) চালু হয়। সিনিয়ার প্রোজেক্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়। প্রায় এক হাজার কোটি টাকা এই সময়ে ট্রাইবাল সাব্ প্ল্যান এলাকায় খরচ করা হয়। ১৬টি রাজ্যে এবং ২টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে রূপায়িত হয়।
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০ - ৮৫)	পঞ্চম পরিকল্পনায় গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য বজায় রাখা হয়। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আদিবাসী ও অন্যদের মধ্যে উন্নয়নের ফারাক কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। যে সকল এলাকা ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যানের

	অন্তর্ভুক্ত হয়নি অথচ ১০,০০০ এর বেশি জনসংখ্যা এবং তার অন্তত ৫০ ভাগ তপশিলি উপজাতি এমন এলাকায় Modified Area Development Approach (MADA) গ্রহণ করা হয়। ৫০ শতাংশ আদিবাসী পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্র ধার্য করা হয়। এর ফলে ৪৭ লক্ষ আদিবাসী পরিবার দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। ৯,০০০ আদিবাসী গ্রামে বিদ্যুৎ, ৮০,০০০ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ২৪৫টি MADA এলাকা, ৭২টি Primitive Tribal Projects চালু হয়। প্রায় ৭৫ শতাংশ আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হয়।
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫ - ৯০)	আদিবাসী পরিবার ও এলাকা উন্নয়ন উভয় প্রচেষ্টা চলতে থাকে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবারকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ১৯৮৭ সালে ট্রাইফেড গঠিত হয়। ১৯৮৭ - ৮৮ সালের শেষে মোট ১৮৪টি ITDP চালু হয়। ৩১৩,২১ লক্ষ আদিবাসী এর আওতাভুক্ত হয়।
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯২ - ৯৭)	১৯৯২-৯৩ সাল থেকে Grant in Aid to State Tribal Development Cooperative Corporation (STDCCs) স্কিম চালু হয়। ১৯৯৬ - ৯৭ সালে শস্যগোলা স্থাপন প্রকল্প (Grain Bank) চালু হয়।
নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭ - ২০০২)	১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে নবম পরিকল্পনাকালে ১০০টি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর জন্য ২৫০ কোটি টাকা খরচ ধার্য করা হয়। যে সমস্ত জেলায় আদিবাসী মহিলা শিক্ষার হার ১০ শতাংশের কম সেই জেলায় ১৯৯৮ সাল থেকে মহিলাদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়।

ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক

স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য ৫২ টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (Community Development Block) শুরু হয়। পরবর্তীকালে আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের জন্য **ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক** (Tribal Development Block) গঠন করা হয়। এই ধরনের ব্লক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো এলাকা এবং কম জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত। জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ আদিবাসী। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫০০ টি ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক ছিল এবং ৪০ শতাংশ আদিবাসী এর আওতাভুক্ত হয়।

ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি

চতুর্থ পঞ্চমার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যদলকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি প্রকল্প শুরু হয় যেমন— Small Farmers Development Agencies (SFDA), Marginal Farmers & Agricultural Development (MFAL) ইত্যাদি। এইভাবে এলাকা উন্নয়নের সাথে ব্যক্তির উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। Drought Prone Areas Programmeও শুরু হয়। ঐ সময় ছয়টি **ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি** শুরু হয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় আরো দু-টি শুরু হয়। প্রতিটি ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অধীনে কয়েকটি করে **ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক** অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও অর্থনৈতিক অবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য এই এজেন্সি গঠিত তবু তারা কৃষি উন্নয়ন ও রাস্তাঘাট তৈরির ওপর জোর দেয়।

পঞ্চম পরিকল্পনার প্রাক্কালে গঠিত Shilo Ao Committee মত প্রকাশ করে - আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক উপযুক্ত নয়। কোনো এক ধরনের কর্মসূচিও যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা ও সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন। এমনকি একই এলাকায়ও তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ওঙ্গে, বীরহোড় ইত্যাদি গোষ্ঠী এখনো শিকার করে, ফলমূল সংগ্রহ করে, মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। এই ধরনের আদিবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি প্রয়োজন।

ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান

পঞ্চম পরিকল্পনায় **ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৫০ শতাংশের বেশি আদিবাসী থাকলে TSP এলাকা ধারা হবে। কয়েকটি ব্লক হল এর একক। এই একক Integrated Tribal Development Project (ITDP) নামে পরিচিত। অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশ, ও বিহারে এবং ওড়িশায় আদিবাসীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই সব রাজ্যে **ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান** খুবই কার্যকরী হয়। অন্যান্য রাজ্যে কম এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসামে ২০,০০০ জনসংখ্যা আছে এমন এলাকাকে উন্নয়নের একক হিসেবে ধরা হয়। তামিলনাড়ু, কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশে ১০,০০০ জনসংখ্যা পিছু এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে আদিবাসী অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৭টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এই কর্মসূচি চালু হয়। ২৬টি জেলা সম্পূর্ণভাবে এবং ৯৭টি জেলা আংশিকভাবে এর আওতাভুক্ত হয়। মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুনাচলপ্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলি, লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি স্থানে অধিকাংশ মানুষ আদিবাসী হওয়ায় আলাদা TSP-র প্রয়োজন হয়নি কারণ সেখানে আদিবসী জনগণের কথা মাথায় রেখে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ঃ

-সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (Integraged Tribal Development Projects) ঃ প্রশাসনিক এলাকা-জেলা, মহকুমা, তহসীল, তালুক যেখানে ৫০ শতাংশ বা বেশি সংখ্যায় তপশিলি উপজাতি রয়েছে।

-বিশেষ বিশেষ এলাকা যেখানে ১০,০০০ জনসংখ্যা এবং ৫০ শতাংশ বা বেশি তপশিলি উপজাতি।

-আদিম জনজাতির জন্য বিশেষ প্রকল্প (Primitive Tribal Group Projects)।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তপশিলি উপজাতির মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সপ্তম পরিকল্পনায় যে সকল এলাকায় ৫০০০ জনসংখ্যা এবং তার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ তপশিলি উপজাতি সেখানে এই কর্মসূচি কার্যকরী হয়।

আদিবাসী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির মধ্যে-

-পরিবারভিত্তিক উপভোক্তা কর্মসূচি যেমন— চাষবাস, উদ্যান, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে উপভোক্তার উৎপাদন বাড়ানো।

-আদিবাসীদের শোষণ, বঞ্চনা, জমি হস্তান্তর, ঋণ ইত্যাদির হাত থেকে মুক্ত করা।

-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়ন ঘটানো।

-আদিবাসী এলাকায় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি।

Tribal Sub Plan-এর অর্থ আসে - রাজ্য পরিকল্পনা (State Plan), বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য (Special Central Assistance) কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা রূপায়িত কর্মসূচি ইত্যাদি থেকে।

৭.৮. আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প

আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের আদিবাসী মন্ত্রক (Ministry of Tribal Affairs) নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চালু করেছে।

(ক) **Special Central Assistance (SCA) for Tribal Sub Plan**

আদিবাসী মন্ত্রক থেকে রাজ্যগুলিকে ট্রাইব্যাল সাব্ প্ল্যান বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ Special Central Assistance (SCA) প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এটি একটি পরিবারভিত্তিক আয় বৃদ্ধি প্রকল্প। কৃষি, উদ্যান, রেশম চাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য তপশিলি উপজাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা। এই অর্থ ITDP এলাকা, MADA এলাকা, Cluster পকেট, আদিম উপজাতি উন্নয়ন, উদ্বাস্তু হয়েছে এমন আদিবাসীদের উন্নয়ন, Margin Money Loan Programme ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে।

(খ) **সংবিধানের ২৭৫(১) নং ধারা অনুসারে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা**

এই স্কিমের সাহায্যে নিম্নলিখিত প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়
স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ করে এমন আদিবাসীদের পুনর্বাসন,
জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের উন্নয়ন,
বিশেষ রোগে ভুগছে এমন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন,
বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রকল্প গ্রহণ,
LAMP ও সমবায়ের সদস্য হওয়ার জন্য ভরতুকি,
আদিবাসী মহিলা সংগঠনের আয়বৃদ্ধি প্রকল্প,
জমি হস্তান্তর, ঋণ, বংশ পরম্পরায় শ্রমদান শনাক্তকরণ এবং আদালতে কেস ফাইল করা,
Compact Area Programme,
আদিবাসীদের জন্য হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ সহ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন,
আদিম উপজাতি ছাত্রদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

(গ) **Grant in Aid to State Tribal Development Cooperative Corporation (STDCCs)**

১৯৯২-৯৩ সাল থেকে এই স্কিম চালু হয়েছে। মূলত Minor Forest Produces (MFP) সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাত করার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়।

(ঘ) **Price Support Operation to TRIFED**

MFP ও SAP-এর বাজার দর খুবই ওঠানামা করে। ক্ষতির হাত থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য আদিবাসী মন্ত্রণালয় থেকে ট্রাইফেডকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

(ঙ) **Investment in the Share Capital of TRIFED**

১৯৮৭ সালে ট্রাইফেড্ গঠিত হয়। এটি একটি জাতীয় স্তরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমবায়। এর উদ্দেশ্য হল তপশিলি উপজাতির মানুষদের সংগৃহীত ক্ষুদ্র বনজদ্রব্য (MFP) এবং কৃষিতে উৎপাদিত অতিরিক্ত দ্রব্য (SAP) বাজারজাত করা এবং উপযুক্ত মূল্য দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীর হাত থেকে রক্ষা করা। ট্রাইফেডের অংশীদারী মূলধন ১০০ কোটি টাকা।

(চ) শস্য ব্যাংক স্থাপন (Establishment of Grain Banks in Tribal Village)

আদিবাসী এলাকায় অনেকে বিশেষকরে শিশুরা অপুষ্টি ও অনাহারে মারা যায়। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি। অসুস্থ হয়ে অনেকে দিনমজুর খাটতে যেতে পারে না। বৃষ্টির জন্য বনজদ্রব্যও সংগ্রহ করতে পারে না। এদিকে বাড়িতে খাবার থাকে না। আবার উৎপাদনও সব বছর সমান হয় না। খাদ্যের এই অনিশ্চয়তা থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে খাদ্যগোলা বা শস্য ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে এই প্রকল্প চালু হয়। রাজ্য সরকার গ্রাম নির্বাচন করেন। প্রথমে ১২টি রাজ্যে ৭০৩টি গ্রামে এই ব্যাংক স্থাপন করা হয়। খরচ ধরা হয় প্রতি ব্যাংক পিছু ৬৪,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৪.৫ কোটি টাকা।

(ছ) তপশিলি উপজাতি ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প ১৯৮৯ - ৯০ সাল থেকে চালু হয়েছে। প্রতি হোস্টেলে ১০০ ছাত্র বা ছাত্রী থাকতে পারবে। মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চশিক্ষার জন্য এই হোস্টেল। হোস্টেলের জন্য জমি রাজ্য সরকার দেবে। কেন্দ্র ৫০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেবে।

(জ) ট্রাইবাল সাব্ প্ল্যান এলাকায় আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন

১৯৯০-৯১ থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য এই বিদ্যালয়।

(ঝ) আদিবাসী এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্যগুলিকে ১০০ ভাগ সহায়তা প্রদান করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে।

(ঞ) আদিবাসী মহিলাদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র

১৯৯৮ সাল থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বিদ্যালয় (প্রয়োজনে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) গড়া যাবে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় কোচিং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ১৯৯১ সালের লোক গণনা অনুসারে ১৩৪টি জেলায় আদিবাসী মহিলা শিক্ষার হার ১০ শতাংশের কম। ঐ সব জেলায় তাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য এরূপ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

(ট) আদিম উপজাতি উন্নয়ন

ভারতে ৭৫টি আদিম উপজাতি (Primitive Tribe) রয়েছে। তারাই সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। এই প্রকল্প ITDP, ITDA, TRI এবং NGO এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়। তিন বছরের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগঠন ইত্যাদি কর্মসূচি পরিচালনা করাযেতে পারে।

(ঠ) আদিবাসী কল্যাণে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পানীয় জল, আইনি সহায়তা ইত্যাদি কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা দেওয়া হয়।

উপরি-উক্ত প্রকল্পগুলি ছাড়াও ‘সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন’ মন্ত্রক (Ministry of Social Justice & Empowerment) থেকে আদিবাসীদের জন্য কিছু প্রকল্প পরিচালনা করা হয়, যেমন—

তপশিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি,

বুক ব্যাংক,

কোচিং,

STDC-কে সহায়তা,

তপশিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃদ্ধির জন্য (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) প্রকল্প যাতে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পায়।

পরিশেষে বলা যায়, আদিবাসীদের সমস্যা যেহেতু বহুমুখী, তাই তাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমস্যাবহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে, এখনো অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুযোগ নিতে পারছে না। সহভাগী পদ্ধতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করা হলে অধিক সাফল্য আসবে।

৭.৯. গ্রন্থপঞ্জি

১। Tribal Development and its Administration — by L. P. Vidyarthi

২। Tribal Culture in India — by L. P. Vidyarthi

৩। The Scheduled Tribes — by A. K. Ghosh (ed.)

৪। Tribal Development in India, Problems & Prospects — by B. Chaudhuri (ed.)

৫। Tribal Development in India— A study in Human Development by Kulmani Padhi

৬। Schemes for Tribal Development - Handbook — Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India

৭.১০. প্রশ্নাবলি

১। আদিবাসীদের মূল সমস্যাগুলি বর্ণনা করো।

২। তপশিলি উপজাতির সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সংবিধানের বিভিন্ন ধারাগুলি আলোচনা করো।

৩। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তপশিলি উপজাতি উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পগুলি আলোচনা করুন।

M. S. W. ঃ 10 (B)

একক—৮ ❑ পৌর সমষ্টির উন্নয়ন — ধারণা, গুরুত্ব, কাজের পরিধি এবং ভারতবর্ষে পৌর সমষ্টির উন্নয়ন

গঠন

৮.১. ভূমিকা
৮.২. পৌর সমষ্টির ধারণা
৮.৩. পৌর সমষ্টির বৈশিষ্ট্য
৮.৪. পৌর সমষ্টির উন্নয়নের গুরুত্ব
৮.৫. পৌর সমষ্টি উন্নয়নের পরিধি বা সুযোগ-সম্ভাবনা
৮.৬. ভারতবর্ষে পৌর সমষ্টি উন্নয়নের বিকাশ
৮.৭. গ্রন্থপঞ্জি
৮.৮. প্রশ্নাবলি

৮.১. ভূমিকা

পৌর সমষ্টি উন্নয়নের ধারণার আলোচনা শুরু করার আগে সমষ্টি (Community) ও সমষ্টি উন্নয়ন (Community Development) —এই দুটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে।

ইংরেজি **'Community'** শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে লাতিন Communis থেকে যার অর্থ সকলের করে তোলা (to make common)। এখন এটা সুস্পষ্ট যে 'সমষ্টি উন্নয়ন'কে বলা যেতে পারে সমগ্র সমষ্টির অধিকতর উন্নত জীবনযাপনের জন্য আন্দোলন। এই কাজটি করতে হবে সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সমষ্টি গ্রামীণ বা শহুরে যাইহোক না কেন।

৮.২. শহুরে সমষ্টির ধারণা

পৌর বা শহুরে সমষ্টি বলতে আমরা নগর (City) সমষ্টির কথা বুঝি। কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলেছিলেন, প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাস তার গ্রামাঞ্চলের ইতিহাস নয়— এই ইতিহাস শহর ও নগরের ইতিহাস। আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে বলতে হয়— এটা ইট, কাঠ, পাথর, সেতু, ছাদ, স্মারক স্তম্ভ, রাস্তা পায়েচলা পথ ইত্যাদির সমন্বয়ের মধ্যেও এমন এক পরিবেশের ইতিহাস যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের অসংখ্য আশা ও হতাশা নিয়ে বাস করে।

শহুরে সমষ্টির একটি সার্বিক ধারণা পেতে গেলে নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নিতে হয়, যেমন ঃ

❍ পৌর নিয়ম' (Urban System) শহুরে সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

❍ পৌর সমষ্টিতে, জীবন বলতে আমরা নগরজীবনকেই বুঝি।

যেহেতু 'নগর' (City) শব্দটি 'পৌর সমষ্টির' (Urban Community) ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতায় বেশ কাছাকাছি আছে তাই সমাজবিজ্ঞানের (Social Science) ক্ষেত্রে নগর সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি-প্রদত্ত কিছু সংজ্ঞা অন্তত আমাদের জানা উচিত ঃ

❍ Howard Woolston তাঁর 'Metropolis' নামক গ্রন্থে 'City' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন— নগর (City) একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাসকারী একটি জনবহুল অঞ্চল। ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু সাধারণ (Common) স্বার্থ থাকবে এবং তারা রাজ্য (সরকার) অনুমোদিত আঞ্চলিক শাসনের অধীনে থাকবে।

❍ Wirth-এর মতে City বা নগর একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো, ঘন এবং স্থায়ী বসতি, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। ("A city may be defined as a relatively large, dense and permanent settlement of socially heterogeneons individuals"— Wirth)

❍ আমরা আরও দেখছি সংখ্যা গণনার মাধ্যমেও একটি নগরের (City) সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। Adna Weber তাঁর "The growth of cities" গ্রন্থে নগরের সংজ্ঞায় বলেছেন — নগর এমন একটা স্থান যেখানে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ বাস করে।

৮.৩. পৌর সমষ্টির বৈশিষ্ট্য

পৌর বা শহুরে সমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলি সার্বিক ভাবে বুঝতে গেলে এবং বিশেষভাবে ক্ষুদ্র অনুন্নত (small urban community slums) শহুরে সমষ্টির কথা জানতে গেলে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝে নিতে হবে ঃ

❍ **সামাজিক জীবনের বিভিন্নতা (Heterogeneity of Social Life) ঃ** শহুরে জীবন বিভিন্ন প্রকার জটিল সমীকরণ নিয়ে গঠিত। এখানে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও মান (standards) একটা নিদিষ্ট স্তর পর্যন্ত ওঠা নামা করে। Louis Wirth তাঁর 'Urbanism as a way of life' প্রবন্ধে নগর সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে শহর হচ্ছে বিভিন্ন জাতি, মানুষ ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তিত হওয়ার জায়গা এবং নতুন প্রজন্ম ও সংস্কৃতির সবচেয়ে অনুকুল শিক্ষাক্ষেত্র। অন্য এক জায়গায় তিনি আরও বলেছেন— পারস্পরিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা যত বেশি হবে তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার মাত্রাও তত বেশি হবে।

❍ **নগর জীবন ঃ চেনাজানার বাইরে (Anonymity of City Life) ঃ** শহর একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কিছু পরস্পর অচেনা মানুষের বসবাসের জায়গা। একটি সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট অঞ্চলে বহুলোকের উপস্থিতি একে অপরকে চেনাজানার অভাব বাড়িয়ে তোলে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের কাছে অজানা হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়ই নগরজীবনের এই চেনাজানার অভাব জটিল সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটায়।

❍ **সার্বিক সামাজিক চলমানতা (Gross Social Mobility) ঃ** শহুরে সমষ্টির মধ্যে একটা ধারাবাহিক সামাজিক চলমানতা আছে। সামাজিক চলমানতা বলতে বোঝায় শহুরে সমষ্টির ব্যক্তিবিশেষের চলার পদ্ধতি। এই চলার পদ্ধতি একে অন্যের কাছে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির মর্যাদার প্রতীক করে তোলে। একজন ব্যক্তির স্তিত্যাধিকার (Locus standi) স্থির হয় তার নিজের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য, তার জন্মগত প্রাপ্তির জন্য নয়। শহুরে সমষ্টি অনেক পরস্পর বিরোধী সামাজিক চলমানতার সৃষ্টি করে। একদিকে যেটা ভৌগোলিক বা পেশাগত চলমানতা, অন্যদিকে সেটি সমান্তরাল ও উল্লম্ব সামাজিক চলমানতা। অল্প কথায় বলা যায়, পরিবর্তনের উপাদানই নগরের (City) অন্য নাম।

❍ **শ্রমের বিভিন্ন বিভাগ এবং বিশিষ্টতা (Varied Division of Labour and Specialization) ঃ** শহুরে সমষ্টি বিভিন্ন প্রকার শ্রম বিভাগ ও বিশিষ্টতার সংমিশ্রণ। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পেশাগত কাজে নিযুক্ত থাকে, যেমন— যান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক, আমোদপ্রমোদমূলক রাজনৈতিক, শৈল্পিক, প্রভৃতি। এগুলি অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের দক্ষতার গুণ, মেধা, বয়স, লিঙ্গ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল।

❍ **গৌণ সামাজিক সম্পর্ক (Secondary Social Relations) ঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শহুরে সমষ্টিতে বর্তমানে এই সম্পর্কের ধরনটা গৌণ প্রকৃতির। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকেরা একে অন্যের প্রতি উদাসীন— বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক সাধারণত থাকে না। দূরভাষণই বেশির ভাগ যোগাযোগের মাধ্যম।

❍ **গৌণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Secondary Social Control) ঃ** গৌণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে শহুরে সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক ব্যবহার ক্রমশ দুষ্কর হয়ে পড়ছে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন বা নানান সংস্কৃতির দ্রুত হারে বৃদ্ধি ও তার প্রচারের জন্য শহুরে সমষ্টির আচারআচরণ প্রচলিত প্রথা ঐতিহ্য এবং গোষ্ঠীর নীতি বা আদর্শ অনুসারে কদাচিৎ পরিচালিত হয়।

৮.৪. শহুরে বা পৌর সমষ্টির উন্নয়নের গুরুত্ব

পৌর সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার অনুন্নত এলাকার (Urban stums) উন্নয়নের আংশিক গুরুত্ব আছে— এ কথার কিছু প্রমাণ আছে এবং এটা আমাদের মেনেও নিতে হয়। উন্নতিকামী দেশগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে ওই অনুন্নত এলাকার লোকেরা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তার ফলে মানবজাতির স্বাভাবিক বিকাশের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির প্রসারণ ঘটাতে তারা অসমর্থ হয়। সমষ্টি উন্নয়ন একটি পদ্ধতি, এই পদ্ধতি শহুরে ক্ষুদ্র সমষ্টির উন্নয়নের গুরুত্বকে একটা সুচারুরূপে শহুরে সমষ্টির উন্নয়ন তথা জাতির উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকার করে। এটা একটা চরম উদ্‌বেগের বিষয় যে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী লোকেদের অধিকাংশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। তারা রুগ্‌ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং নিরক্ষর হয়। তারা তাদের নিজেদের উন্নতির জন্য যে-কোনো কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের করার ফলে অসংগঠিত। এসবের জন্য দায়ী তাদের জ্ঞানের ন্যূন্যতা এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব। সমষ্টি উন্নয়ন একটা বাস্তব সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে যে সমগ্রভাবে একটি দেশের উন্নয়ন তখনই ঘটতে পারে যখন শিল্পে (industry), যানবাহন (transportation) ব্যবস্থায়, রেলব্যবস্থায় (railways), জাহাজ ব্যবস্থায় (shipping), কৃষিক্ষেত্রে (agriculture) উন্নতি লক্ষ করা যায়। এবং এই উন্নতি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনসমাজের সমান ভাবে হতে হবে। শহরের কোনো একটি শ্রেণির মানুষ পশ্চাৎপদ থাকলে শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৮.৫. পৌর সমষ্টি উন্নয়নের পরিধি বা সুযোগ-সম্ভাবনা

পৌর সমষ্টিস্তরে একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য দরকার কার্যক্ষেত্রে পরিধি ও সুযোগ সম্ভাবনার বিষয়টি খতিয়ে দেখা। নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি শহুরে সমষ্টির উন্নয়নের পরিধি বা সুযোগ-সম্ভাবনার জন্য চিহ্নিত করা যেতে পারে—

❍ পৌর সমষ্টির একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নির্ভর করে মূল্যবোধ (value system) ও তার অনুশীলনের ওপর।

❍ পৌর সমষ্টির মধ্যে শহুরে শিক্ষার উন্নতি পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলে এবং সাধারণ (common) স্বার্থরক্ষার কাজও করে।

❍ পৌর সমষ্টিতে কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন সেখানেই হয় যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজেই অসামান্য অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে আলাদা এবং এক্ষেত্রে যুক্তিসংগত উন্নতিকামী কার্যকলাপের প্রয়োগই একটি ইতিবাচক ফলাফল এনে দিতে পারে।

❍ সামাজিক গোষ্ঠী কর্ম (Group work) পদ্ধতি এবং সামাজিক ব্যক্তিকর্ম (Case work) পদ্ধতির প্রয়োগ সামগ্রিক পৌর সমষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল আনতে পারে।

❍ গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ সম্ভাবনা— বিশেষত আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স (Modern electronics)-এর প্রয়োজন হয় একটি পৌর সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য। এই উন্নতি হতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জীবনের রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে।

৮.৬. ভারতবর্ষে পৌর সমষ্টি উন্নয়নের বিকাশ

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে পৃথিবীর অনেকদেশেই গ্রামীণ অঞ্চল থেকে আয়ের উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলে চলে আসার একটা প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় পৌর এলাকায় একটা নির্দিষ্ট উচ্চ সীমায় পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিনিষ্ঠ উন্নতির যথেষ্ট সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়।

শহরই অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র।

ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক দেশ এবং ক্রমশ নগরায়ণের পদ্ধতির দিকে চলে যাচ্ছে। শহরের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, বর্তমানে এই সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে মাত্র পঁচিশটি শহর ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালে আমরা কী দেখি? এই সংখ্যা চারগুণেরও বেশি বেড়েছে, আমাদের দেশে এই রকম শহরের সংখ্যা ১০৭।

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য চাহিদা অনুযায়ী শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫২ সাল থেকে সমষ্টিগত উন্নয়নকে একটা প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। যদিও গ্রামাঞ্চলেই এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির শুভ জন্মদিন থেকেই ‘Community Development Block গুলির যাত্রা শুরু। সেই সময় থেকেই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সমান ভাবে এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শহুরে সমষ্টিগুলিকে সংগঠিত করতে আরম্ভ করে। সময় সময় কেন্দ্রীয় স্তর ও একইভাবে রাজ্যস্তর থেকে অসুরক্ষিত জায়গাগুলির শহুরে সমষ্টির উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৩ সালে Central Social Welfare Board স্থাপিত হয় এবং রাজ্যস্তরে স্থাপিত হয় State Social Welfare Advisory Board. এই গোষ্ঠীগুলি (Board) শহুরে পরিবারের কল্যাণ পরিকল্পনার অধীনে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল যার মধ্যে আরোগ্যোত্তর পরিচর্যা প্রভৃতির কর্মসূচিও ছিল। আমাদের পরিকল্পকগণ মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শহরের দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নের জন্য নানা উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেছেন, এই কাজের তালিকায় আছে— জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, চিকিৎসার সুবিধা, শিক্ষা, চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে এবং এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মধ্যে একটি সমতারক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

শিশু কল্যাণে (Child welfare) সরকারের I. C. D. S. কর্মসূচির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। শহরাঞ্চলের ভেঙে পড়া বস্তি এলাকায়, যেখানে উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা আছে; সেখানে স্বাস্থ্য পরিসেবা ও পুষ্টিসংক্রান্ত কার্যক্রমের আশ্চর্য রকম ফলাফল দেখা গেছে। শহর এলাকায় ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের (Community Health Workers) শহুরে সমষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান আছে।

ভারতবর্ষে সমষ্টি উন্নয়নের বিকাশের ক্ষেত্রে শহর উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Urban Development)

গঠন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শহরাঞ্চলের গৃহহীনদের আশ্রয় প্রদানের কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শহুরে যুবকদের বৃত্তিমূলক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। এমনকি সাম্প্রতিক কালের স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে স্বরোজগার যোজনার (Swarnjayanti Sahari Swarojgar Yojana) লক্ষ্য স্বনিযুক্তি পরিকল্পনার সাহায্যে শহুরের দরিদ্রশ্রেণির পুনর্বাসন।

সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পৌর সমষ্টির উন্নয়নের জন্য অনেক বেসরকারি সংস্থা জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছে। যদিও এই ব্যাপারটির কথা সব শেষে বলা হল তবুও এটি কোনো ছোটো ঘটনা নয়— একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এটা সুস্পষ্ট যে দেশের বিভিন্ন শহুরে অঞ্চলে পরিস্থিতির পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৮.৭. গ্রন্থপঞ্জি

- Karangia, R. K. ‘They Also Survive’,— N. K. Publications, Pune, Maharashtra. India.
- Raman, P. ‘Urban Community of India’, — Nagraj Publications, New Delhi, India.

৮.৮. প্রশ্নাবলি

- পৌর সমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
- ভারতবর্ষে পৌর সমষ্টি উন্নয়নের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

একক—৯ ❑ বস্তি

গঠন

৯.১. প্রারম্ভিক কথা
৯.২. ধারণা
৯.৩. বৈশিষ্ট্যসমূহ
৯.৪. বস্তি সৃষ্টির পিছনে কারণসমূহ
৯.৫. সমস্যা
৯.৬. বস্তি উন্নয়নের পক্ষে গৃহীত কর্মসূচি / স্কীম
৯.৭. বস্তি উন্নয়নে কে. এম. ডি. এ. এবং বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকা
৯.৮. গ্রন্থপঞ্জি
৯.৯. প্রশ্নাবলি

৯.১. প্রারম্ভিক কথা

গ্রাম অথবা শহরবাসী— 'বস্তি' শব্দটি সকলের কাছেই পরিচিত। এগুলিকে শহরের বুকে 'দগদগে ঘা' হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। একমাত্র পরিস্থিতির কবলে পড়ে বাধ্য হলেই মানুষ বস্তিতে বসবাস করে। ভারতে বোধহয় এমন কোনো শহর নেই যেখানে বস্তি নেই। কলকাতা শহরে প্রায় ৪৫৫০ বিঘা জমিতে রয়েছে বস্তি। অন্তত তিরিশ লক্ষ মানুষের বসবাস সেখানে। ১৯৭৫ সালেই কলকাতার মোট জনসংখ্যার প্রায় তিরিশ ভাগ ছিল বস্তির বাসিন্দা। গত তিন দশকে তা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। বর্তমান প্রবণতা যদি বজায় থাকে তবে কলকাতা এবং হাওড়া শহরের মিলিত জনসংখ্যার চল্লিশ ভাগের মতো মানুষের বস্তির বাসিন্দা হবার সম্ভাবনা।

'বস্তি' এমন একটি শব্দ যা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় না। এটি একটি নিম্নমানের বসবাসের এলাকা। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডঃ রাধাকমল মুখার্জী কানপুর ও হাওড়ার বস্তি দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে মানুষ এখানে অমনুষ্যোচিত অবস্থায় বসবাস করে। শূকরের বসবাসের অবস্থার সঙ্গে তিনি এর তুলনা করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও মন্তব্য করেছেন যে, এগুলি মানুষের চূড়ান্ত অমর্যাদাকর বসবাসের এলাকা এবং এর সৃষ্টির পিছনে যারা রয়েছে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া কাম্য এবং কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই এই কাঠামোগুলি ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

যাই হোক, বস্তির অস্তিত্ব আমরা পছন্দ করি আর না করি, তা সর্বত্র বিরাজমান। প্রায় সব দেশে নগর বা শহরে বস্তির অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতও তার বস্তির জন্য বিখ্যাত। হাওড়া, নাগপুর, মুম্বাই, কলকাতা, কানপুর, লখনৌ, পুরানো দিল্লির মত শহরে মোট জনসংখ্যার প্রায় একের তিন ভাগ বস্তির বাসিন্দা।

৯.২. ধারণা

'বস্তি' শব্দটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবু বলা যেতে পারে যে,

(ক) বস্তি হচ্ছে নগর বা শহরের সেই ভৌগোলিক এলাকা যেখানে মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, যা প্রতিফলিত হয় অতিরিক্ত জনঘনত্বে, ভগ্নপ্রায় বাড়িতে, নিকাশি এবং শৌচালয় সুবিধার অভাবে।

(খ) বস্তি হচ্ছে শহরাঞ্চলের নীচু এবং স্যাঁতসেঁতে এলাকায় অবস্থিত একগুচ্ছ কুঁড়েঘর যা খড়, টালি, টিন ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া এবং কোনোরকম নাগরিক সম্বন্ধীয় সুবিধা ছাড়া বা সে ধরনের অতি সামান্য সুযোগযুক্ত।

(গ) বস্তি হচ্ছে সেই ধরনের উপনিবেশ যেখানে নিম্ন আয়ের বহু মানুষ সীমাবদ্ধ ছোটো এলাকায় বসবাস করে। জনবহুল, দুর্বল বাড়িঘর, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপ্রতুল নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি বাস্তব সত্য।

(ঘ) কলকাতা পৌর আইন অনুসারে বস্তি হচ্ছে কমপক্ষে দশ কাঠার সংযুক্ত এলাকা যেখানে কতগুলি কুঁড়েঘরের সহাবস্থান দেখা যায়।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং প্রতিষ্ঠিত অভিধান বস্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঙ) ওয়েবস্টার অভিধান অনুসারে বস্তি হল জবরদখল করা এবং অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকা।

(চ) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে বস্তি হল শহরে বসবাসের এলাকা যেগুলি দৈহিক ও সামাজিকভাবে অবনত এবং সন্তোষজনক পরিবারিক জীবনযাপন যেখানে অসম্ভব।

(ছ) অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে বস্তি হল একটি শহর বা নগরের রাস্তা, সংকীর্ণ পথ, গৃহপ্রাঙ্গণ ইত্যাদি যেখানে নিম্ন আয়ের মানুষ বসবাস করে।

(জ) ১৯৫২ সালে ইউ. এন. ও (রাষ্ট্রসংঘ) বস্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—

একটি বাড়ি, একগুচ্ছ বাড়ি বা এলাকা যা অতিমাত্রায় জনতার চাপ, অসুবিধায় অবনত, শৌচালয় বা পৌরসম্বন্ধীয় সুবিধারহিত বা এমন অবস্থার আগার যা মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে।

(ঝ) শিকাগো সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান বস্তিকে বলেছেন স্বতন্ত্র সমাজের দুর্বল বা ক্ষয়প্রাপ্ত এলাকা, চরম দারিদ্র্যের, উচ্চ জন্মহারের, অতিরিক্ত শিশুমৃত্যুর, সাধারণ মৃত্যু ও অসামাজিক ব্যবহারের উচ্চহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং অপরাধী থেকে নিরীহ সব ধরনের মানুষের আবাসস্থল।

(ঞ) মুম্বাইয়ে আয়োজিত সমাজবিজ্ঞানীদের এক আলোচনাচক্রে বস্তিকে বলা হয়েছে বিশৃঙ্খলভাবে অধিকৃত, প্রথাহীনভাবে গড়ে তোলা এবং সাধারণত অবহেলিত এলাকা যা উচ্চ জনঘনত্বসম্পন্ন এবং দুর্বলভাবে তৈরি এবং অবহেলিত কাঠামোর সমাহার।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যাগুলির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে বস্তি হচ্ছে শহর বা নগরের মধ্যে এমন বসবাসের এলাকা যা সাধারণত দরিদ্র মানুষকে স্থান দেয় যারা গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে শহরে আসে। বস্তির বাড়িগুলি ছোটো এবং খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া, অন্ধকার এবং অস্বাস্থ্যকর। জল সরবরাহ, আবর্জনাপাত্রের ব্যবস্থা, নিকাশি সুবিধা, শৌচালয়ের সুযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পার্ক এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। এলাকাটি সাধারণত অপরিচ্ছন্ন, ঘনবসতিপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত নীচু। বস্তি হল সব ধরনের অসুখের এবং অসামাজিক কাজের ভাণ্ডার। যে-কোনো শহর এলাকায় এগুলি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত। ধারণাটিকে এককথায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায় বস্তি হল শহরের মধ্যে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ নীচু এলাকা যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে মানুষের বাসযোগ্য নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে বস্তি হচ্ছে ঃ

- দেশান্তরগমন এবং শহরীকরণের ফল।

● শহরের বর্ধিত অংশ যা কিছুটা বিচ্ছিন্ন।

● শহরের কিছু নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে অল্প আয়ের মানুষেরা দুর্বল পরিকাঠামো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে।

● শহরের এমন এক এলাকা যেখানে আলো-বাতাসহীন বাড়ি, অপরিমিত শৌচালয় ও নিকাশি ব্যবস্থার অভাব বাস্তব চিত্র।

● এগুলি দুর্দশাগ্রস্ত এবং জনবহুল বসবাসের এলাকা যেগুলি বস্তি ছাড়াও ঝোপড়পট্টি, চাউলস, আহতাজ, চেরিজ, কেরিজ, পেটাজ, কাটরা, ঝুগ্গিঝুপড়ি, ঘেটো ইত্যাদি নামেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচিত।

সমাপ্তিতে বলা যায় যে, আমরা শহরের সেই সব এলাকাকে বস্তি বলি যেখানে নীচু জলাজমিতে ঝুপড়ি ঘরে মানুষ বাস করে এবং জলের বন্দোবস্ত সমেত কোনো সুবিধাই ভোগ করতে পারে না। বাড়ির মেঝে, দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদি সাধারণত কাঁচা এবং অস্থায়ী প্রকৃতির। ঘন সন্নিবিষ্ট বলে বাড়িগুলিতে আলো-হাওয়া চলাচলের সুযোগ নেই। ঘরগুলির আকার ছোটো এবং উচ্চতাও কম। অপরিসর রাস্তা, সম্মিলিত ও অস্বাস্থ্যকর শৌচালয়, প্রসাবগারের অভাব, নিকাশি ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব না থাকা, আবর্জনা পরিষ্কারের সুযোগহীনতা হল বস্তিজীবনের বাস্তবতা। এই অবস্থার ব্যতিক্রম তেমন একটা দেখা যায় না। ফল হিসাবে বস্তি বসবাসের অযোগ্য স্থান হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

৯.৩. বৈশিষ্ট্যসমূহ

বস্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

● দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের আবাসস্থল

● অপরিকল্পিতভাবে গজিয়ে ওঠা এলাকা

● ঘনসন্নিবিষ্ট অপরিসর কুঁড়েঘর যা সাধারণত স্যাঁতসেঁতে

● সাধারণত অধিকৃত জমিতে গড়ে ওঠা বসতি এলাকা

● বিমানবন্দর, জাহাজঘাটা, রেলস্টেশন, শিল্পাঞ্চল, হাউসিং কমপ্লেক্সের কাছাকাছি অবস্থিত

● প্রয়োজনীয় পরিসেবাগুলি থেকে বঞ্চিত

● অস্বাস্থ্যকর

● আবাসিকরা সাধারণত অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী

● স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ছোটো-বড়ো সবরকম শহরাঞ্চলেই বস্তির আকার ও অবস্থার মধ্যে শহর থেকে শহরে, এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, হাওড়া এবং কানপুরের মতো শহরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ বস্তির বাসিন্দা; এবং এইসব বস্তির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই শহরে অজস্র বড়ো আকারের বস্তি রয়েছে। মুম্বাইয়ের ধারাভি এক বিশালাকৃতি বস্তি যেখানে বহু লক্ষ মানুষ বাস করে। তবে এই সব শহরের বস্তিগুলির অবস্থা হাওড়া-কানপুরের বস্তির তুলনায় হয়তো সামান্য ভালো। সম্ভবত চণ্ডীগড় হল ভারতের একমাত্র শহর যেখানে বস্তির অস্তিত্ব জোরালো নয়। যেটুকু রয়েছে তার অবস্থাও তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো।

৯.৪. বস্তি সৃষ্টির পিছনে কারণসমূহ

আর্থিক ও সামাজিক এই দুই ধরনের কারণে বস্তি গড়ে ওঠে। মানুষ না চাইলেও ছোটো-বড়ো সব শহরেই বস্তি গড়ে উঠেছে বা উঠছে। প্রকৃতপক্ষে বস্তির অস্তিত্ব বোধয় আমাদের জীবনের চেয়েও বাস্তব সত্য। বস্তি সৃষ্টির পিছনে অনেকগুলি কারণের মধ্যে মুখ্য কারণগুলি হল ঃ

(ক) হাউসিং কমপ্লেক্স, বিভিন্ন বাড়ি, ব্যাবসায়িক এলাকা, রেলস্টেশন, কারখানা ইত্যাদিতে সস্তায় দক্ষ কর্মীর চাহিদা। পরিবার সহায়িকা, সাফাই কর্মী, দারোয়ান, রিক্সাচালক, মালবাহক, মিস্ত্রী ও জোগাড়ে ইত্যাদি শ্রেণির বহু কর্মীর দরকার। কিন্তু এই ধরনের কর্মীর আয় অল্প এবং সেজন্য বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হয়।

(খ) দেশভাগের ফলে বহু মানুষকে গৃহহীন হয়ে এদেশে আসতে হয়েছে নিঃসম্বল অবস্থায়। তাদের একটা অংশকেও বস্তি গড়ে তুলে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ধর্মীয় উন্মাদনার কারণেও কিছু কিছু মানুষকে সর্বস্ব হারাতে হয়। তাদেরও হয় নতুন বস্তি গড়ে তুলে বসবাস করতে হয় অথবা পুরানো বস্তির মধ্যেই ঠাঁই খুঁজতে হয়। এভাবেও বস্তির এবং বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

(গ) কৃষি জমির ওপর প্রবল চাপের কারণেও বস্তির সৃষ্টি হয়। শিল্পায়ন, লক্ষণীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, সেচের নালা (ক্যানাল) তৈরি, বসত এলাকার ক্রমাগত সম্প্রসারণ, বাজার এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে চাষজমির ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের বহু শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে ৭০.৬৭ ভাগ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত ছিল, ২০০১ সালে তা কমে আসে ৫৮.৬০ ভাগে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের হার এত দ্রুত হারে নেমে আসাই প্রমাণ দেয় যে চাষ জমির ওপর চাপ অত্যন্ত বেশি। ফলে কাজের সন্ধানে তাদের একটা অংশ শহরমুখী হচ্ছে। তারা সাধারণ কোনো কাজে যুক্ত হয়ে বস্তিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

(ঘ) প্রবল গতিতে শিল্পায়নের কারণেও বস্তি গজিয়ে উঠেছে বা উঠছে। অতীতেও শিল্পস্থাপন হয়েছে কিন্তু বর্তমান যুগ বিশেষভাবে শিল্পায়নের যুগ। যে-কোনো দেশের প্রগতি নির্ভর করে যে সব কারণের ওপর তার মধ্যে কৃষি, কুটিরশিল্প এবং ভারী শিল্প অন্যতম। দেশের উন্নতির প্রশ্নে উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই সমভাবে অগ্রসর হওয়া কাম্য। ভারতবর্ষে গত কয়েক দশকে অনেক ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে দুর্গাপুর, বোকারো, রাঁচী, রাউরকেলা, হলদিয়া, ভিলাই, কোয়েম্বাটুর, বার্ণপুর, জামশেদপুর ইত্যাদি এলাকায়। এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করার জন্য অথবা স্বনিয়োজনের চেষ্টায় বহু মানুষ গ্রাম থেকে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে এসেছে। এই সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবারগুলির মধ্যে যাদের আয় কম বা অনিশ্চিত, তার একত্রিত হয়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় বস্তি গড়ে তুলেছে। হাওড়া এবং কলকাতা শহরে বহু ভারী শিল্প থাকায় এবং সেখানকার নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য তেমনভাবে আবাস তৈরি না করায় তারাও বস্তিতে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। স্বভাবতই বস্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।

(ঙ) শহরীকরণকেও বস্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা যায়। শহরীকরণের প্রবণতা সারা বিশ্ব জুড়েই। ভারতেও শহর এবং শহরের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পকে কেন্দ্র করে যেমন শহর গড়ে উঠেছে তেমনি শিল্প ছাড়াও শহর গড়ে উঠার নজির অনেক। উদাহরণ হিসাবে শিলিগুড়ি, বর্ধমান, মালদা, বাঁকুড়া, চণ্ডীগড়, সিমলা, ভুবনেশ্বর, পুরী, বৃন্দাবন, বেনারস, বার্ণপুর ইত্যাদি শহরের কথা বলা যায়। এই জাতীয় শহরগুলি গড়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ হল মানুষের শহরবাস করার প্রবণতা এবং ধর্মস্থান হিসাবে সুখ্যাতি। উপরিউক্ত কারণে গ্রাম থেকে মানুষের আগমন ঘটেছে। তাদের একটা অংশ অন্নসংস্থানের জন্য যে-কোনো বৃত্তিতে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং বসবাসের জন্য বস্তিকে আশ্রয় করেছে।

(চ) চাকুরিদাতাদের মানসিকতাও এজন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। অধিকাংশ নিয়োগকর্তাই কর্মীদের প্রতি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখায়নি। তারা সামান্য কিছু কর্মীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করায় বাকিদের আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে বস্তিতে, কারণ তাদের আয়ের মান এমন যে ভালো কোনো ব্যবস্থার কথা তারা ভাবতে পারে না।

(ছ) সাম্রাজ্য প্রথার বিলুপ্তিও বস্তি সৃষ্টির পিছনে অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও সম্রাটের বিশাল আত্মীয়বর্গ, দাসদাসী এবং অন্যান্য কর্মচারীরা আশ্রয় ও আয় হারিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেককেই অন্নসংস্থান এবং আশ্রয়ের সন্ধানে বিব্রত হতে হয়েছে। কোনোভাবে বস্তি গড়ে তুলে তারা বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। পার্ক সার্কাস, মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার বস্তিগুলি মূলত এসব কারণেই গড়ে উঠেছে।

(জ) উপযুক্ত কৃষি বিপ্লবের অভাব বস্তি সৃষ্টির পিছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এখনও এ দেশের কৃষিকাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো প্রথায় চলে। অধিকাংশ জমি সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে উৎপাদনের হারও কম এবং সারাবছর ধরে কৃষিকাজও হয় না। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বহু কৃষি শ্রমিক এবং প্রান্তিক চাষিকে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হয়। নানা কারণে কুটিরশিল্প এবং পশুপালনও লাভদায়ক হয়ে উঠে না। এরকম অবস্থা গ্রামের কিছু মানুষকে শহরমুখী হতে বাধ্য করে। তারা বস্তির অধিবাসী হয়ে জীবনসংগ্রামে রত থাকে।

(ঝ) ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট বেশি। আমরা প্রতিটি জনগণনাতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির জোরালো হার প্রত্যক্ষ করি। এই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকা মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কাজের সুবিধা থেকে শুরু করে কোনো পরিসেবা বা সুবিধাই সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না। সকলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তো একেবারেই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে এক শ্রেণির মানুষ অত্যন্ত দরিদ্রের কারণে বসবাসের উপযোগী বাড়ি তৈরি করতে অসমর্থ। তারা যেমন তেমন একটা কাঠামো তৈরি করে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এভাবেই উচ্চহারে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

(ঞ) গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর চাপও বস্তি সৃষ্টির পিছনে আর একটি কারণ। গ্রামীণ আর্থনীতির যে কৃষি, কুটিরশিল্প এবং পশুপালনের ওপর মূলত নির্ভরশীল সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ট্রাক্টর সমেত নানা কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং অনেক কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে যাওয়ার জন্য এইসব বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত কিছুসংখ্যক মানুষ জীবনজীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সীমাহীন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কর্মহীন মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে গ্রামাঞ্চলে। এই অবস্থা গ্রামের বহু মানুষকে বাধ্য করছে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে রুজিরোজগারের চেষ্টা করতে। এভাবেই নতুন নতুন বস্তির জন্ম হচ্ছে এবং পুরানো বস্তির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বস্তি সৃষ্টির পিছনে আরও কিছু কারণ থাকা স্বাভাবিক তবে উপরে বর্ণিত কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

৯.৫. বস্তিবাসীদের সমস্যা

বস্তিবাসীরা নানা সমস্যার শিকার যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি হল ঃ

(ক) **অতিরিক্ত জনঘনত্ব ঃ**

অতিরিক্ত জনঘনত্বের জন্য স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিক সমস্যার উদ্ভবও স্বাভাবিক। জনসংখ্যার সঙ্গে বাসস্থান এবং বাসস্থান সংলগ্ন জমির পরিমাণের মধ্যে কোনো সাযুজ্য না থাকায় সর্বদা সেখানে মানুষের চাপ। বাইরের

খোলা জায়গায় রাত্রিযাপন করতে হয় অনেককে। জনঘনত্বের চাপে অনেক বস্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করাও কঠিন। এই অতিঘনত্ব স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক নানা সমস্যার কারণ হয়ে উঠে।

(খ) **বাড়ির দুর্দশা ঃ**

অপরিচ্ছন্ন এলাকায় সব রকম সুবিধা বর্জিত হয়ে বস্তির মানুষকে জীবনযাপন করতে হয়। অত্যন্ত ঘিঞ্জি অবস্থানের জন্য বাড়িগুলিতে আলো-হাওয়ার প্রবেশ এবং খোলা হাওয়ার চলাচল প্রায় নিষিদ্ধ। দেওয়ালগুলি নিত্যান্ত দুর্বল, মেঝে কাঁচা ও স্যাঁৎসেঁতে এবং ছাদ খড়, টিন, টালি, ত্রিপল, নারকেল-তাল-খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি। মাত্র একটি দরজা এবং সাধারণত কোনো জানালা থাকে না। সামগ্রিকভাবে বস্তি ও তার বাড়িগুলিকে দুষিত বলেই গণ্য করা হয়।

(গ) **স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা এবং নাগরিক সম্বন্ধীয় সুবিধার অভাব ঃ**

সমস্ত বস্তিরই এটি প্রাথমিক সমস্যা এবং বলা হয়ে থাকে যে বস্তির প্রথম দুর্ঘটনা হলো স্বাস্থ্য। এস. এন. সেন. কলকাতার একবালপুর বস্তিতে সমীক্ষা করার পর কতগুলি সমস্যা তুলে ধরেছেন যেগুলির সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যেমন—

- একের সাত ভাগ পরিবারের শৌচালয় নেই।
- ৮২% পরিবার শৌচালয় যৌথ বা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে।
- ৫৪% পরিবারের বাড়িতে জলের কল নেই।
- বেশির ভাগ বাড়ির আকার তিরিশ বর্গফুট এবং তার মধ্যে পাঁচজনের বেশি মানুষ বসবাস করে।

(ঘ) **পরিবেশগত সমস্যা ঃ**

দুর্গতিপূর্ণ বসবাসের অবস্থা, ধুলো-ধোঁয়ার উপস্থিতি, আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা না থাকা, জল জমে থাকার সমস্যা, স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব বস্তির মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অভাববোধক প্রভাব ফেলে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চর্মরোগ, পেটের অসুখ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের শিকার হতে হয় অনেককে। বস্তি নয় এমন এলাকাতেও এই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে।

(ঙ) **নিরক্ষরতা ও অদক্ষতা ঃ**

বস্তিবাসীরা সাধারণত নিরক্ষর বা সামান্য লেখাপড়া জানা। কোনো প্রায়োগিক ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারীও নয়। এর ফলে তারা নিম্নতম সচেতনতার হার সমেত নানা সমস্যার শিকার। উচ্চহারে বেকারত্ব তার মধ্যে একটি।

(চ) **নিম্নস্তরের নৈতিক মান ঃ**

উপযুক্ত নৈতিক মানের অধিকারী হওয়ার জন্য মনোমত পরিবেশের প্রয়োজন। বস্তি বাসিন্দারা সে ধরনের পরিবেশ পায় না। স্বাভাবিকভাবেই নিম্নস্তরের নৈতিক মানের ধারক হয়ে উঠে তারা। মদ্যপান, জুয়া, অবৈধ সম্পর্ক, চুরি, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি নানা অসামাজিক কাজ বস্তিতে সাধারণ ঘটনা। বস্তিকে যে জন্য শহরের 'ঘা' হিসাবে বর্ণনা করা হয় তার অন্যতম কারণ হল এই নিম্ন নৈতিকমানের উপস্থিতি। অনেক সময় বস্তিগুলি সংগঠিত ও অসংগঠিত অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। অনেক বস্তি দেহব্যবসায়ের ক্ষেত্র বলেও চিহ্নিত। মুম্মাইয়ের ধারাভি বস্তি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে হাজার হাজার মেয়ে ও মহিলা এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সেখানে অজস্র পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হয় এই বৃত্তি থেকে আয়ের সাহায্যে। বস্তির পরিবেশ এভাবে সামাজিক পরিবেশকে বিশৃঙ্খল করে দেয়।

(ছ) **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঃ**

বস্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনীহা এবং বস্তিবাসীদের হীনমন্যতার জন্য সাধারণত বস্তি এলাকাগুলি

শহরের অন্য এলাকা থেকে সামাজিকভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকে। শহরের সাধারণ এলাকাগুলির মানুষের সামাজিক-সংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে বস্তিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান সম্ভব হয় না। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা বস্তিবাসীদের জীবনে একটি বাস্তব ঘটনা হয়ে থাকে।

(জ) **হীন অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ**

যারা বস্তির বাসিন্দা তারা সাধারণত আর্থিকভাবে দুর্বল। তাদের আয় নিশ্চিত নয়। মূলত তারা স্বনিয়োজিত অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী। অনেক বস্তিবাসী সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং আয়হীন। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে তারা হয় কর্মহীন অথবা শোষিত। আয়ের পরিমাণ এত অল্প যে ঋণদাতাদের সচল পদক্ষেপ রোধ করার সুযোগ থাকে না।

(ঝ) **মহিলাদের নিম্নমানের অবস্থান ঃ**

বস্তিতে মহিলাদের অবস্থান সাধারণভাবে দুর্বল। বিশেষত সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। নিম্নতম সম্মানপ্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের সামান্যতম গোপনীয়তা রক্ষার সুযোগদানের ব্যাপারেও আন্তরিকতার অভাব। এমনকি তাদের অস্তিত্ব নিয়েই যেন উদাসীন। বস্তিতে বসবাসকারী মহিলারাও এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, এর বেশি কিছুর প্রত্যাশী নয়।

(ঞ) **যোগ্যতা বা কর্মক্ষমতার প্রভাব ঃ**

মানুষের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর, যার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অন্যতম। যে ব্যক্তি কোনো শারীরিক সমস্যা ও মানসিক চাপ বা অস্থিরতার শিকার হয় সে তার সেবাটা দিতে পারে না এবং স্বভাবতই কর্মক্ষমতার স্তর নেমে আসে। বস্তি পরিবেশ এমনই যা যোগ্যতা বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয় না। যোগ্যতা হল জ্ঞান, দক্ষতা, চরিত্রবল, মনোভাব এবং স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যারা বস্তিবাসী তারা সাধারণত উপরিউক্ত স্তরগুলির অভাববোধ করে। এরকম অবস্থায় এটি প্রায় অবধারিত যে ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা উন্নতমানের হবে না।

(চ) **স্থায়িত্বের অভাব ঃ**

স্থায়িত্ব শব্দটি বস্তির ক্ষেত্রে বেমানান। প্রথমত বস্তিগুলির অবস্থানই স্থায়ী নয় কারণ সরকার প্রয়োজন বোধ করলে যে-কোনো দিন তা ধ্বংস করে দিতে পারে। নানা কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বস্তি ধ্বংস করা হয়। যেহেতু বস্তিগুলি সাধারণত অনথিভুক্ত তাই বিভিন্ন সময় এগুলি ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট বস্তির বাসিন্দাদের স্থান পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। মারণ রোগের প্রকোপ, আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার কারণেও বস্তিবাসীদের জীবনে স্থায়িত্ব প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়ায়। তা ছাড়া তারা তাদের বৃত্তি এবং আয় সম্পর্কেও কখনও নিশ্চিত থাকে না।

(ছ) **আবেগময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক সমস্যা ঃ**

বস্তির নানাবিধ দুরবস্থার কারণে বস্তিবাসীদের জীবনে অন্তর্কলহ, উদ্‌বেগ, নিরাপত্তাহীনতা, ক্রোধ, উত্তেজনা, ইত্যাদি নিত্য সঙ্গী হওয়ায় তাদের আবেগময় স্বাস্থ্য (Emotional health) গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়। এভাবে জীবনধারণের ফলে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতার শিকার হতে হয়। বস্তিবাসী এবং তারা যাদের সংস্পর্শে থাকে তাদের জীবনে এই অবস্থার প্রভাব পড়ে। মূলত এ ধরনের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই 'বস্তি সংস্কৃতি' নামক কথাটি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

(জ) **গোপনীয়তার অভাব ঃ**

প্রতি মানুষ তার নিত্য দিনের জীবনযাত্রায় কিছুটা গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনবোধ করে। কিন্তু বস্তির পরিবেশে একজন মানুষ নিম্নতম গোপনীয়তা রক্ষার কথাও ভাবতে পারে না। পৃথক স্নানঘর বা শৌচালয়,

শোওয়ার ঘর বা বিশ্রামঘরের কোনো বন্দোবস্ত নেই। তাই বস্তিতে যেন গোপনীয়তা রক্ষা কথাটিই অপমান বোধের শিকার। এই অবস্থার পরিবর্তনের কোনো উপায় নেই।

(ঝ) **মাদক ও পানীয়তে আসক্তি ঃ**

উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রে আসক্তিও বস্তিজীবনে অতি সাধারণ ঘটনা। মানসিক উদ্‌বেগ এবং বস্তির সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে প্রায় সমস্ত বস্তিতেই মাদক ও পানীয়ের প্রতি আসক্তি একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদক ও পানীয় পাচারকারীদের চক্র এসব অঞ্চলে অত্যন্ত সক্রিয় হওয়ায় সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। দুবৃত্তের দলও বস্তি অঞ্চল থেকে কাজকর্ম নিরাপদে পরিচালনা করে।

এভাবে বস্তির বৈশিষ্ট্য বহু সামাজিক, আর্থিক, সংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার দ্বারা চিহ্নিত।

৯.৬. বস্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি / স্কীম

যে সমস্ত শ্রেণির মানুষ বেশি অসুবিধার বা সমস্যার শিকার তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ বা যত্ন নেওয়া যে-কোনো উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। স্বভাবতই শহর উন্নয়নের, বিশেষত শহরের বস্তি উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন সময়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ঃ

(১) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা।

(২) বি. ডি. এ., ডি. ডি. এ., সি. এম. ডি. এ., পৌরসভা ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।

(৩) উপরিউক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে বস্তি উচ্ছেদ কর্মসূচি গ্রহণ।

(৪) নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পগ্রহণ।

(৫) জনশিক্ষণ সংস্থান, নেহরু যুবকেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই শহর উন্নয়ন বা পৌরবিষয়ক বিভাগ রয়েছে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই উন্নয়ন উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত।

বস্তির অবস্থার সদর্থক পরিবর্তন সাধনের দুটি মূল পন্থতি রয়েছে। সেগুলি হল বস্তি উচ্ছেদ এবং বস্তি উন্নয়ন। বস্তি উন্নয়ন বলতে বোঝায় নিকাশি ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন, আবর্জনা সরানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা, বস্তির মধ্যের গলিগুলির উন্নতিসাধন, সাধারণের ব্যবহারের জায়গাগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করা, পাকা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিসেবার বন্দোবস্ত করা, পরিবার নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা বৃধ্বি ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে বস্তির পরিকাঠামোগত এবং পরিসেবাগত সুযোগসুবিধা বৃধ্বির মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন। যেহেতু বস্তি হল নানা রকম অসুখের উৎসস্থল, তাই স্বাস্থ্যগত কর্মসূচিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয় বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচিতে। অন্যদিকে বস্তি উচ্ছেদ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বস্তি কাঠামো ধ্বংস করে একই এলাকায় অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো এলাকায় তুলনায় ভালো পরিবেশে বস্তিবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বস্তি উচ্ছেদ কর্মসূচি যে অত্যন্ত জটিল তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেজন্য সামান্য কিছু এলাকাতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেই স্থানের বিশেষ গুরুত্ব এবং সেখানকার বাসিন্দাদের বিশেষ সমস্যার কথা বিবেচনা করে। কলকাতায় এ ধরনের কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তিরও রূপান্তর ঘটিয়েছে এই পন্থতির মাধ্যমে। খরচ ও অন্যান্য সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখেই বস্তি উচ্ছেদ নয়, বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচিকেই দেশ জুড়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯.৭. বস্তি উন্নয়নে কে. এম. ডি. এ. এবং বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকা

(ক) **কে. এম. ডি. এ.-র ভূমিকা ঃ**

কলকাতা এবং তার সন্নিহিত এলাকার উন্নয়নের জন্য সি. এম. ডি. এ-র পত্তন হয় ১৯৬৯-৭০ সালে, পরবর্তীকালে যার নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় কে. এম. ডি. এ। মোট ৫২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কে. এম. ডি. এর অন্তর্গত। এর অন্তর্গত সমগ্র এলাকার উন্নয়নসাধনই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হলেও বস্তি উন্নয়নের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তির কল্যাণে কে. এম. ডি. এ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, সৌন্দর্য্যায়ন, দূষণরোধ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উন্নত পরিসেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কে. এম. ডি. এ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি এ ধরনের ভূমিকা পালন করে চলার জন্যই সামগ্রিকভাবে শহরের এবং বিশেষভাবে বস্তির উন্নয়ন, অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। বস্তির ভিতরের গলিপথ, নিকাশি নালা, আলোর ব্যবস্থা, আবর্জনা সরানোর কাজ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। স্কুলবাড়ি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে চলমান স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পও চালু ছিল যা পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়।

(খ) **বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকা ঃ**

বেসরকারি সংগঠন সাধারণত মানুষকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। তারা সংশ্লিষ্ট সমষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। শহর অঞ্চলে তাদের কাজের এলাকা মূলত বস্তি অঞ্চল। প্রতিটি শহরেই এমন বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বস্তি উন্নয়নের কাজে জড়িত। কলকাতা শহরেও এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান বর্তমান। বস্তিবাসীদের উন্নয়নে তারা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। তার কয়েকটি হল—

- স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত পরিসেবা দান।
- স্বাস্থ্যকরভাবে জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে বস্তিবাসীদের আগ্রহী করে তোলা।
- ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে আগ্রহ সঞ্চার এবং স্বসাহায্যকারী গোষ্ঠীগঠন।
- শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি।
- পথবাসী এবং যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ।
- আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বস্তি উন্নয়নের কাজে সরকার ও পৌরসভাকে সাহায্য করা।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা যার মাধ্যমে তরুণ সমাজ সৃষ্টিধর্মী কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।
- ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা।

বেসরকারি সংগঠন বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে চলেছে উপরিউক্ত বিবরণ তার এক সংক্ষিপ্তরূপ মাত্র। বেসরকারি সংগঠন কী করতে পারে সে সম্পর্কে এখানে শুধু একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তিতে যা করেছে তা এক উল্লেখযোগ্য কাজ। অনেকগুলি চারতলা বাড়ি তৈরি করে প্রায় পাঁচশো পরিবারকে নিজস্ব ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। বিবেকানন্দ পল্লি নামে নতুনভাবে নামকরণ করা এই একদা বস্তি এলাকায় অন্যান্য পরিসেবা দানও করা হচ্ছে। এটি একটি মডেল বস্তি উচ্ছেদ প্রকল্প যেখানে কোনো পরিবারকেই এলাকাচ্যুত হতে হয়নি। সাক্ষরতা,

শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিনোদন কর্মসূচি, স্বসহায়ক দল গঠন, নারী সশক্তকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পও পরিচালিত হচ্ছে। এইভাবে স্থানীয় সমিতি ও অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বস্তিবাসীর সেবায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৯.৮. গ্রন্থপঞ্জি

(i) Slums – A study in Urban Problems : K N Venkatarayappa

(ii) The Slums – Challenge and Response : David Hunter

(iii) The Children of Indian Nomads : S P Ruhela

(iv) A Treatise of the Urban Complexities of the Present Times : IISWBM

(v) Slums within Slum : Sabir Ali

(vi) Slum and Urbanization : Desai & Pillai

৯.৯. প্রশ্নাবলি

১। 'বস্তি' শব্দটি ব্যাখ্যা করে তা সৃষ্টির পিছনে কী কারণ রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

২। ভারতীয় বস্তির বাসিন্দাদের সমস্যাগুলি সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৩। বস্তিবাসীদের সমস্যা নিরসনে সরকারি উদ্যোগে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। বস্তিবাসীদের সমস্যা কমানোর ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

একক—১০ ❑ শহুরে সমষ্টি উন্নয়নের কয়েকটি বিশেষ সংস্থা (Special Agencies in Urban Community) ঃ

গঠন

১০.১. ভূমিকা (Introduction)

১০.২. বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metropolitan Development Authority) K. M. D. A

১০.৩. হলদিয়া উন্নয়ন সংস্থা (Haldia Development Authority) H. D. A

১০.৪. শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ (Siliguri Jalpaiguri Development Authority) S. J. D. A

১০.৫. আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা (Asansol Durgapur Development Authority) A. D. D. A

১০.৬. কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট (Kolkata Improvement Trust) K. I. T

১০.৭. প্রশ্নাবলি

১০.১. ভূমিকা

শহুরে সমষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সংস্থাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নানা রকম পরিকাঠামোর সুবিধার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং কিছু কিছু অত্যাবশ্যক পরিসেবা কার্যে পরিণতকরণ, যেমন ঃ জল সরবরাহ, আবর্জনা নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, শহরের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং নানা পৌর পরিসেবা।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই বিশেষ সংস্থার কাজ নানা শৃঙ্খলায় বিস্তৃত— যেমন নগর পরিকল্পনা, নতুন নতুন জায়গায় নগর সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরি এবং তার বাহ্য পরিকাঠামোরও উন্নয়ন করা এবং একই সঙ্গে কিছু মূল পরিসেবা যেমন জল, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থের (পরিষ্কারের) ব্যবস্থারও জোগান দেয়। এই বিশেষ সংস্থাগুলির একটি যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন বহুমুখী কাজের জন্য উপযুক্ত দল থাকা চাই, এই দলটির যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দরকার, এই দলে কয়েকজন বাস্তুকার (engineers), পরিকল্পক, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি থাকবে। এখানে শর্ত থাকবে এই দলের সদস্যরা একটি গুণমান সম্পন্ন সুন্দর সজীব পরিবেশের সৃষ্টির লক্ষে কাজ করবে। এই বিশেষ সংস্থাগুলির সদস্যরা পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকবে ও সেই সঙ্গে তারা পরিকল্পিত প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের কাজও করবে। তা ছাড়া জমি ব্যবহারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও উন্নয়নের কাজেও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করবে। শহুরে সমষ্টির উন্নয়নের একটি বিশেষ সংস্থার হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, রাস্তা তৈরি প্রভৃতি কাজের বাহ্যিক পরিকাঠামো তৈরির কাজে সীমাবব্ধ থাকবে না। বরং তাদের কার্যসীমার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা ও শহরের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মতো কাজকেও যুক্ত করে নেবে।

শহরাঞ্চলে স্থানীয় সমষ্টির গোষ্ঠীগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে ও ঘটনাহীন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, এর কারণ

স্থানীয় উদ্যমের অভাব ও সেই সঙ্গে আছে সমষ্টি সংগঠনেরও অভাব। এতএব শহুরে সমষ্টির সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে সমষ্টি সংগঠনের কাজে ও সেই সঙ্গে শহরের স্থানীয় যুবকদের শহুরে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য চালিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন সংস্থা আছে, যাদের নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা যায়—

(১) **স্থানীয় সংগঠন (Local Organisation) ঃ** একটি স্থানীয় সংগঠন নানা আকারে গঠিত হতে পারে ঃ

(ক) **পাড়ার সভা** (Neighbourhood Council) ঃ এই সভা প্রায়ই স্থানীয় কিছু সুবিধার ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করে, যেমন ঃ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, নগরোদ্দান ও মাঠ তৈরি বা বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির (Summer Camp) খোলার ব্যবস্থা। এই সভা আরও কিছু কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে— যেমন সমষ্টি কেন্দ্র স্থাপন। ওই অঞ্চলের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা বসতি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, গ্রাহক সমবায় সমিতি ('consumers' co-operative) প্রতিষ্ঠা করে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্যকে নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে রাখা অথবা আবর্জনা সংগ্রহের পদ্ধতিও তৈরি করে। আমেরিকায় পাড়ার সভা (neighbourhood council) নাগরিকদের (কার্যনির্বাহক) সমিতি। এই সমিতি গঠিত হয় সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য—যে অবস্থাগুলি কোনো একটি পাড়ার নির্দিষ্ট স্বার্থসংক্রান্ত।

(খ) **কল্যাণব্রতী সভা** (Council of Welfare Agencies) ঃ এই সভা বা পরিষদ গঠিত হয় বেশ উন্নত শহরাঞ্চলে। এই সভার অনেকগুলি স্থানীয় সংগঠন থাকে। এই সংগঠনগুলি কিছু ছোটো বড়ো কর্মসূচির মাধ্যমে সমষ্টির বিভিন্ন বিভাগে কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। আমেরিকাতে কল্যাণব্রতী সভা আছে। এই সভাগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাগুলির সরকারি ও বেসরকারি (public and private) সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা রক্ষা করা। পরিসেবার মান উন্নয়ন করা ও ওই মান রক্ষা করা, তা ছাড়া স্বাস্থ্য পরিসেবার কল্যাণমূলক কাজ ও সামাজিক পরিকল্পনার কাজে উৎসাহ দানের মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নতি ঘটান। ভারতের বিভিন্ন শহরেও এ ধরনের সভার অস্তিত্ব রয়েছে।

(গ) **সমন্বয় সাধনকারী সভা বা পরিষদ** (The Co-ordinating Council) ঃ সমন্বয় সাধনকারী সভা নাগরিক গোষ্ঠীর সভা। কোনো একটি পৌর অঞ্চলের সামাজিক শক্তিগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য এই সভা গঠিত হয় সমাজের কিছু বিশেষ সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য— যেমন তরুণ তরুণীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা (Juvenile delinquency) নিয়ে কাজ করা।

(ঘ) **সামাজিক পরিসেবা বিনিময়** (সভা) (The Social Service Exchange) ঃ সামাজিক পরিসেবা কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এবং সমবায়ের মাধ্যমে পরিসেবা বিনিময় করে এই সভা। স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সংস্থার পরিচিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে এই সভা। সামাজিক পরিসেবা বিনিময় সমষ্টি কল্যাণব্রতী সভা বেসরকারি বা সরকারি সংস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়। যেমন— জনকল্যাণ বিভাগ দ্বারা এই সভা গঠিত হতে পারে।

(২) **পৌরপর্ষদের সমষ্টি সংগঠন বিভাগ (Community Organisation Division of a Municipal Board) ঃ**

উন্নত দেশগুলির বড়ো বড়ো নগর ও শহরে অনেক উন্নতিকামী পৌরগোষ্ঠীর সামাজিক পরিসেবা বিভাগ থাকে। এগুলি পৌরপ্রশাসনের অংশবিশেষ। এই সব বিভাগের কিছু কিছু সমষ্টি সংগঠন বিভাগও থাকে। এগুলির কাজ হচ্ছে শহরের বিভিন্ন অংশে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির প্রসারণ ঘটানো। দিল্লির পৌরনিগমে এই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, এবং ১৯৫৮ সালে শহুরে সমষ্টি উন্নয়ন (Urban Community Department) নামে একটি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) **ব্যক্তিগত সামাজিক সংস্থাগুলির দ্বারা সমষ্টি সংগঠন (Community Organisation by Individual Social Agencies) ঃ**

কোনো সমষ্টি অঞ্চলে কোনো কোনো সমস্যা এবং প্রয়োজনের ওপর বিশেষ জোর (গুরুত্ব) দেওয়া হয় এবং সমষ্টির প্রধান প্রধান দিকগুলির দেখাশোনা করার জন্য বিশেষ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো অঞ্চলের স্বাস্থ্যবিভাগ উপস্থাপনার মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের অন্য অন্য প্রয়োজনের বিষয় তুলে ধরতে পারে।

(৪) **প্রদেশিক রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরের সংস্থাসমূহ (Agencies at Regional, State or Central Level) ঃ**

রাজ্যস্তরে কিছু কিছু সংস্থা থাকতে পারে যেগুলির কাজ বিভিন্ন এলাকার সংস্থাগুলির কর্মসূচির সমন্বয় রক্ষা করা। একইভাবে কেন্দ্রীয় স্তরেও কিছু সংগঠন থাকতে পারে বিশেষ সংস্থাগুলির কাজে সমন্বয় সাধনের জন্যে, যেমন— ভারতীয় শিশুকল্যাণ পর্ষদ (Indian council of Child Welfare). এই ধরনের সংস্থাগুলি সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি আনুকূল্যে সমন্বয়সাধনের কাজের পদ্ধতিতে আগ্রহী হয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী (কাজের) মান উন্নয়ন করে ও জনসাধারণের বিশাল সমর্থন তালিকাভুক্ত করে। সরকারি সংস্থাগুলি রাজ্যের সমাজকল্যাণ বিভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্ত রাজ্য স্তরে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ গোষ্ঠীর (Central Welfare Board) কেন্দ্র স্তরে ঘটে।

১০.২. বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metropolitan Development Authority— KMDA)

কে. এম. ডি. এ বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলের (K M A) পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য একটি বিধিসম্মত সংস্থা। এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ শহর ও নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (West Bengal Town and Country Planning and Development) আইনের চুক্তির অধীনে। বর্তমানে এটি বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলের (KMA) পরিকল্পনাকারী, উন্নয়নকারী সংস্থা, যদিও প্রথমে এই সংস্থা ১৯৭০ সালের রাষ্ট্রপতির একটি অধ্যাদেশে (Presidental Ordinance) গঠিত হয়েছিল।

কে. এম. ডি.-এর কাজ নানা শাখায় বিভক্ত— প্রথমত এটি একটি পরিকল্পনাকারী সংস্থা। কলকাতার মধ্যে নতুন নতুন এলাকায় শহর সৃষ্টির খসড়া তৈরি করে। তা ছাড়া এই সংস্থা বাহ্যিক পরিকাঠামোর বিকাশসাধন করে। সেই সঙ্গে জল সরবরাহ, আবর্জনা নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার মতো পরিকাঠামো তৈরি করে। এ সব ছাড়া K M D A বৃহত্তর কলকাতার পরিকল্পনা সমিতির (Kolkata Metropolitan Panning Committee — K M P C) প্রযুক্তি সচিবালয় (Technical Secretariate) যা ভারতবর্ষে এই ধরনের সংস্থার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম, যা ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের পরিকল্পনার কার্যনির্বাহক সমিতির আইনের (West Bengal Metropolitan Planning Committee Act, 1994) অধীনে এই সংস্থা গঠিত হয়।

কে. এম. ডি. এ-র কার্যাবলি (Functions of K M D A) ঃ

(১) **পরিকাঠামো** (Intrastructure) **গঠন** ঃ কলকাতা মহানগরীর পরিকাঠামোটিকে মজবুত করার জন্য নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে K M D A এগিয়ে চলেছে। পরিকল্পনাগুলির মধ্য আছে জল সরবরাহ, নোংরা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, এ ছাড়া যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থার কাজ ও বসতি এলাকা ও নতুন এলাকার উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা সেই সঙ্গে আছে বাসগৃহ নির্মাণ ও নতুন নতুন অঞ্চলের উন্নতি সাধন। নতুন ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চলছে প্রচলিত ব্যবস্থার নবরূপায়ণ ও ওই ব্যবস্থাকে মজবুত করার কাজও K M D A-এর কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়।

বর্তমানের পরিকাঠামো ও পরিসেবার মান উন্নয়নের জন্য K M D A একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে K M D A যে পরিকল্পনাগুলি সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

(ক) **জল সরবরাহ ঃ** বর্তমানের জল সংরক্ষণের পরিমাণ (capacity) বাড়ানো ও জলাধারের সংস্কারসাধন। জল পরিশোধনের নতুন ব্যবস্থা তৈরি এবং বৃহৎ ব্যাসের (big diameter) নলকূপ স্থাপন ও জলবণ্টন ব্যবস্থার জীর্ণ সংস্কার, প্রভৃতি।

গৃহীত পরিকল্পনাগুলির অগ্রগণ্য বিষয় (Highlights) ঃ

✪ K M D A-এর বাসিন্দাদের জন্য বহনযোগ্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা,

✪ ৮০% জনসংখ্যাকে পাইপ লাইনের সাহায্যে জলসরবরাহ।

✪ পাইপ লাইনের সাহায্যে প্রান্তিক অঞ্চলেও জল সরবরাহ।

✪ গত পাঁচ বছরে তেরোটি প্রধান পরিকল্পনা সহ জল সরবরাহ প্রকল্পে ১৬৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

✪ চালু জলসরবরাহ পরিকল্পনাগুলির জন্য ১৩৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত ৮টি প্রধান প্রকল্প যেগুলির জন্য নদিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দারা উপকৃত হচ্ছে।

✪ পাঁচটি প্রধান জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ২৬৩.৮৬ কোটি টাকা JN - NORUM-এ অধীনে এবং এর জন্য অদূর ভবিষ্যতে হুগলি ও হাওড়া জেলা উপকৃত হবে।

✪ ভূতলস্থ জল সরবরাহ উৎপাদনের যতদূর সম্ভব বৃদ্ধির একটি লক্ষ্য আছে।

(খ) **ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থা, জল নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন (Sewerage, Drainage and Sanitation) ঃ**

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার নালাগুলির উন্নতিসাধন ও নির্মাণ, pumping stationগুলির ও ভূমির নীচের নর্দমাগুলির বাড়ি বাড়ি সংযোজন, কঠিন আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা ও মাটির নীচের নর্দমা পরিষ্কার রাখা, ইত্যাদি।

গৃহীত পরিকল্পনাগুলির অগ্রগণ্য বিষয় (Highlights) ঃ

✪ K M A-এর নগরবাসীদের পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশের জন্য পয়ঃপ্রণালীর network-এর সুবন্দোবস্ত এবং কঠিন বর্জ্যপদার্থের অপসারণ ব্যবস্থা।

✪ K M A-তে জলনিষ্কাশনের network স্থাপন ও জল জমা সমস্যার সমাধানের জন্য pumping station স্থাপন।

✪ নয়টি পরিকল্পনার জন্য (প্রকল্পের) গত পাঁচ বছরে ৪৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

✪ বিভিন্ন পৌর এলাকার মধ্যে কঠিন বর্জ্যপদার্থের অপসারণের জন্য ছয়টি প্রধান শহরে জাপানি ব্যাংকের অধীনে আন্তঃজাতিক সহায়তায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

(গ) **যানবাহন ও পরিবহণ (Traffic and Transportation) ঃ**

বর্তমানের রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; নতুন করে গাড়িচলার রাস্তা, পার্শ্বরাস্তা, সুড়ঙ্গ পথ, উড়ালপুল ও সেতু নির্মাণ, বাসের গুমটি গঠন, রাস্তার আলোর ব্যবস্থার উন্নতি ও যানচলাচলের signal গুলির উন্নয়ন করণ।

গৃহীত পরিকল্পনাগুলির অগ্রগণ্য বিষয় (Highlights) ঃ

✪ শহরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির যানচলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা ও রাস্তায় যানজটের ভিড় সরানোর লক্ষ্যও আছে। সেই সঙ্গে আছে শহর-ভ্রমণকে বিপদমুক্ত ও আরামদায়ক করে তোলার লক্ষ্য।

✪ গত পাঁচ বছরে ২০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে কয়েকটি প্রধান যোজক (connectives) স্থাপনে। এক্ষেত্রে যুক্ত আছে ২৫টি বড়ো বড়ো প্রকল্প, যেমন—লেক গার্ডেন্সের উড়ালপুল, দমদমের সড়ক পথ, সোনারপুরের উড়ালপুল (E. M. B. P.), ইষ্টার্ন বাইপাশের প্রসারণ প্রভৃতি।

✪ ১৩৮.৩৪ কোটি টাকার ২২টি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে, এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে বন্ডেলগেট উড়ালপুল, প্রিন্স আনোয়ারশা রোডের সঙ্গে ই. এম. বাইপাশের (E M B P) র সংযোজন, লবণহ্রদের সেক্টর-এর রাস্তা তৈরি প্রভৃতি।

(ঘ) **নতুন এলাকা গঠন (New Area Developement) ঃ** বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন এলাকার সন্নিহিত অঞ্চলে বাসস্থানের চাহিদা সাধারণত বেশি। সেজন্য metro-core-এর প্রান্তিক এলাকায় নতুন অঞ্চল গঠনের প্রকল্পকে কার্যকরি করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রকল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প—বৈষ্ণবঘাট - পাটুলি অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, উত্তর কলকাতা অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প, পশ্চিম হাওড়ার উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি। তা ছাড়া অত্যাবশ্যক নাগরিক পরিকাঠামো সমেত service land এর জোগান ও K M D A-এর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য আছে কিছু কিছু অত্যাবশ্যক সুবিধারও জোগান দেওয়া, যেমন—স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিপণন কেন্দ্র (shopping complex), ব্যাংক, পোস্টাপিস, দমকল কেন্দ্র, বিনোদন (recreational) কেন্দ্র ইত্যাদি। এই সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য—প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা একটি নতুন শহর এলাকার মধ্যেই শহুরে এলাকার কিছু মূল সুবিধা ভোগ করতে পারবে। জমির মূল্য নির্ধারণে পারস্পরিক অনুদান নীতি (Cross subsidization principle) গৃহীত হয়েছে। ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল (Economically weaker sections - EWS) শ্রেণির লোকেরাও জমি পেতে পারছে। এমনকি নিম্ন আয়ের লোকেরাও (Low Income groups - LIG) তাদের সাধ্য অনুযায়ী জমি পেতে পারছে।

(ঙ) **বাণিজ্যিক উন্নয়ন (Commercial Development) ঃ** প্রধান শহরগুলিতে বাণিজ্য ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থানাভাব আছে। সেই কারণে এই সব অঞ্চলের ভাড়া অত্যন্ত বেশি। K M D A এ ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ জমির জায়গায় সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই রকম পরিকাঠামো জোগানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। K M D A এই উদ্দেশ্যে কিছু প্রকল্প তৈরি করেছে এবং সেই প্রকল্প কার্যকরী করে তোলার জন্য কয়েকটি ছোটো shopping complex উত্তর কলকাতায় গড়ে তুলেছে। আর বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি অঞ্চলে শহর গড়ে তোলাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ। বর্তমানে কিছু কিছু প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বহুমুখী বিপণন কেন্দ্র গোড়ে তোলার কাজ K M D A শুরু করেছে।

(২) স্থাবর সম্পত্তি (Real Estate) ঃ K M D A স্থাবর সম্পত্তির জন্যও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে আবাসন তৈরি, বাণিজ্যক বিপণন তৈরি ও বিখ্যাত মন্দিরগুলির পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নতি সাধন।

(৩) **কিছু বিশেষ প্রকল্প (Special Projects) ঃ** K M D A গৃহীত বিশেষ প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে Ganga Action Plan, Gas Distribution Network, পৌরউন্নয়ন কর্মসূচি ও উদ্‌বাস্তু কলোনির উন্নয়ন।

(৪) **সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারি প্রকল্প (R P P) ঃ** K M D A কয়েকটি p p p প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেমন Hiland Park, River holding private limited, City Centre (DC Block, Salt Lake) Salt Lake Bypass, Digital Destination (Nonadanga, East Kolkata), West Howrah Township, Habitat Centre (DJ Block, Salt Lake) Water Park at (East Kolkata) ইত্যাদি। অনুমোদিত এই কাজগুলির প্রস্তাব হলে তা p p p প্রকল্পের অন্তর্গত হবে।

(৫) **জওহরলাল নেহেরু জাতীয় আবাসস্থলের নবীকরণ (J N N V R M) ঃ** J N N U R M-এর শহুরে পরিকাঠামো ও শাসনের জন্য এখন পর্যন্ত ২২৭ D P R S গৃহীত হয়েছে। এবং পরীক্ষার পর ৭৯ D P R ১ অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পগুলিকে বিভিন্ন স্তরে কার্যে পরিণত করার জন্য ৪.৪১০ কোটি টাকা মূল্য ধার্য করা হয়েছে।

১০.৩. হলদিয়া উন্নয়ন সংস্থা (Haldia Development Authority— HDA)

শিল্পনগরী হিসাবে হলদিয়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতি রাজ্য সরকারের কাছে সর্বদা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের ক্রমবিকাশ হলদিয়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক। প্রথম দিকে HDA হলদিয়া বন্দর কমপ্লেক্সের (H D C) প্রশাসনের অধীনে ছিল। হলদিয়ার সুবিধাজনক অবস্থান এবং হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে প্রদত্ত ব্যাপক বন্দরের সুবিধা, নানান Public Sector Company প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। ওই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আছে Indian Oil Corporation এবং Hindustan Fertilizer। এগুলি ছাড়া কিছু বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এই অঞ্চল আকর্ষণ করেছে তাদের বিপণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য। ওই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে Hindustan Lever, Exide Industries, Shaw Wallace উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাও আছে, যারা নানা পণ্য দ্রব্য তৈরি করে, যেমন— engineering and fabrication, automobiles, electricals, food processing, packaging, building materials. 5170 কোটি টাকা ব্যয়ের Haldia Petrochemicals Ltd. এবং 1400 কোটি টাকার Purified Terepthalic Acid (PTA) Plant (Mitshubishi Chemical Company of Japan) — এই দুটি স্বপ্নপূরণের কারখানা হলদিয়ায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পাঞ্চলের বিকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ শহর ও নগর আইনের আওতায় HDA গঠিত হয়েছিল। HDA-এর উদ্দেশ্য ছিল হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়নকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা। HDA-কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বশাসনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য সফল করার জন্য— উদ্দেশ্যটি হল হলদিয়াকে অগ্রগামী, উন্নতিশীল, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকর্মের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে তোলা— বর্তমানে HDA এর পরিচালক সমিতির সদস্য সংখ্যা সভাপতি সমেত ১৪ জন। এই পরিচালক সমিতির মেয়াদ সচরাচর ৩ বছর।

HDA-এর অঞ্চল ৩২৬.৯২ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং ১৯৯১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী HDA-এর জনসংখ্যা ৩.৯১ লাখ। এই সংস্থার কাজ জমির ব্যবহার (land use) ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের (Development Control Plan) পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা বলবৎ করা অথবা LVDCP নিজস্ব এলাকার মধ্যে জমি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া অঞ্চলটির উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য, যেগুলি HDA সোজাসুজি নিজেই বা অন্যান্য সংস্থার সাহায্যে সেগুলি কাজে পরিণত করবে। HDA শিল্প, বাসগৃহনির্মাণ এবং বাণিজ্যিক এলাকাকে (Complex) উন্নত করে। HDA রাস্তাঘাট বৈদ্যুতিকরণ, জল সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থা ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে। HDA কিছু কিছু সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির কাজেও সাহায্য করে যাতে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমস্ত বিভাগ এবং সংস্থাগুলি- যেগুলি প্রকল্প এলাকায় কাজ করছে— তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে।

HDA বেশ কয়েকটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ করছে। অনেকগুলি প্রধান শিল্প যেমন— MCCPIA, South Asian Petrochem Ltd. ইতিমধ্যেই হলদিয়ায় তিনটি কারখানা স্থাপন করেছে। অনেক অনুগামী শিল্প যেমন— Capstan Shipping and Estate Limited, Hindustan Seals Limited, Marcus Oil and Chemicals Ltd., Indian Oil Blending Limited and Indian Institute of Information Technology হলদিয়ায় কারখানা স্থাপনের জন্য আগ্রহী হওয়ায় তাদের শিল্পের জন্য জমিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

HDA কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গড়ে তুলেছে, যেমন Anusna Complex, Durgachak and Piyambada Complex, Basudevpur, Swati Housing Complex, Hatiberia.

HDA শিল্প ও গার্হস্থ্যের প্রয়োজনে জল সরবরাহের জন্য বদ্ধপরিকর। বর্তমানে 20 mgd. জল সরবরাহকে প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য গুণমান (quality) বজায় রেখে সুনিশ্চিত জল জোগানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই গোঁয়াখালীর জল পরিশোধোনাগারটি সংস্কার সাধন করা হয়েছে। 30 mgd. ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন Plant স্থাপনের কাজ উলুবেড়িয়ায় এগিয়ে চলেছে। HPL কারখানায় জল সরবরাহের জন্য HDA চৈতন্যপুরে ভূগর্ভে একটি জলাধার নির্মাণ করেছে, সেই সঙ্গে একটি Pump houseও তৈরি করেছে। উৎখাতকৃত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য কলোনি গড়ে তুলেছে নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে — খুদিরাম নগর, দেভগ, কাশবেড়ে এবং হাতিবেড়িয়ায়।

HDA কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে, যেমন HPL Link Road-এর উন্নতি সাধন, বাদরা রেলস্টেশন থেকে গেঁয়োখালি, জল সরবরাহ, বাইপাস তৈরি ইত্যাদি। একটি Ring Road তৈরির প্রকল্পও ভাবনাচিন্তার মধ্যে আছে।

WBSED-র সহযোগিতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে HDA গভীরভাবে জড়িত আছে। এই কাজের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি হচ্ছে— দুর্গাচকে 1200 লোকের বসার আসনবিশিষ্ট একটি খেলার মাঠ (stadium) HDA তৈরি করেছে। দুর্গাচক ও বাসদেবপুরে খেলার সরঞ্জাম, বাগান ও লন সহ দুটি নগরোদ্যান HDA তৈরি করেছে, যেগুলির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে HDA স্বয়ং।

বেশ কিছু সংখ্যক দোকান ঘর তৈরি হয়েছে দুর্গাচক সুপার মার্কেট এবং স্বাতি হাউসিং কমপ্লেক্সে। এগুলিকে ইজারাও দেওয়া (Leased out) হয়েছে।

১০.৪. শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ (Siliguri Jalpaiguri Development Authority — SJDA)

S. J. D. A. কাজের জায়গা 1.400 Sq KM পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকাভুক্ত রয়েছে দুটি বড়ো নগর — শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি। S. J. D. A-এর অধীন প্রধান নগর শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার। এক সময় কাঠ, তামাক ও পর্যটন ছিল এই জায়গার প্রধান শিল্প। বর্তমানে হলদিয়া ও কলকাতার পরে এখানেই সবচেয়ে বেশি নগরায়নের (urbanisation) কাজ চলছে। উন্নয়নের প্রধান কাজ এখানে করে SJDA, তবে অবশ্যই স্থানীয় পৌরনিগম ও পঞ্চায়েতের সহায়তায়। শিলিগুড়ির বিকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই প্রথমে একটি master plan-এর খসড়া তৈরি হয়েছিল। পরে এটিকে একটি যথাযথ পরিকল্পনায় উন্নত করা হয়— ‘Perspective plan — Siliguri — Jalpaiguri 2025’।

এই অঞ্চলে দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে কৃষিভিত্তিক বিভাগের চেয়ে অকৃষিভিত্তিক বিভাগের বিকাশ অনেক বেশি। পরিসেবা বিভাগেই ছিল প্রধান উন্নয়রে জায়গা, যেমন— ব্যাংক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদি। ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এখানে অনেক বেশি। আর অন্য সমস্ত বড় শহরগুলির মতো এখানেও অন্য রাজ্যগুলি এবং সীমান্ত রাজ্যগুলি থেকে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটছে। এখন আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই অঞ্চল পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় প্রধান নগর হয়ে উঠবে। একটি পরিবহন নগর (Transport nagar) ও ট্রাক-গুমটি (truck terminal) স্থাপিত হয়েছে। শিলিগুড়িতে ও জলপাইগুড়িতে ২টি by-pass তৈরি হয়েছে। তৃতীয় মহানন্দা সেতুও তৈরি হয়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে একটি ও শিলিগুড়িতে একটি ক্ষুদ্র শহরেরও (setellite towns) পত্তন হয়েছে।

১৯৭৯ সালের West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act-এর অধীনে ১৯৮০ সালে STDA স্থাপিত হয়। SJDA-এ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে সভাপতি সমেত ১৪ জন। এই গোষ্ঠীর মেয়াদ সচরাচর ৩ বছর।

S J D A এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি ‘nodal agency’ তৈরি করেছে। SJDA এই সংস্থার যুক্ত আছে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শহর এবং নকশালবাড়ির শহরাঞ্চল, এ সবই SJDA-এর কর্তৃত্বের এলাকার মধ্যে, যার পরিধির বিস্তৃতি 1162 Sq. K. M., এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় 10.52 লাখ। এর সঙ্গে যুক্ত আছে একটি আইনসংগত পৌরসভা এবং একটি পৌরসংঘ (শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি)।

S. J. D. A. গঠনের আরম্ভ থেকেই SJDA বাণিজ্যিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিকাঠামোর উন্নয়ন সাধনের উপযুক্ত নানা উপায় গ্রহণ করে এই সংস্থা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উন্নতি সাধন করেছে যেমন— Fulbari-Ghoshpukur Bypass Road, Ektiasal Road, Siliguri-Baribhasa Connector of Eastern Bypass. Construction of the Third Mahananda Bridge along with approach road connecting North Bengal Medical College গড়ে তোলার কাজও চলছে।

বাণিজ্যিক জায়গার উত্তরোত্তর চাহিদা মেটাতে এই সংস্থা সেবক রোড বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, আম্বেদকর ও শহিদ ক্ষুদিরাম বানিজ্যিক কেন্দ্র গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

বাসস্থান, অফিস ও বিনোদনের ক্ষেত্র নির্মাণের জমি জোগানের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেমন— Composite Complex, Jalpaiguri Residential Complex (Himachal Bihar) Santipur Complex ইত্যাদি।

আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে SJDA কিছু কাজ হাতে নিয়েছে, যেমন— বূপশিং ও বৈরাতিসাদ মৌজার উন্নয়ন ও শিল্পতালুক গঠন।

চাঁদমারী বাগানের ভূসম্পত্তির যে সমস্ত জমি পুনর্গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে WBIDC ও Luxmi Township Private limited-এর সঙ্গে যৌথভাবে ছোটো শহর (Satellite Township) গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। সংস্থার পরিকল্পনা প্রসারণ এলাকার কাজও সক্রিয়ভাবেই এগিয়ে চলেছে।

বর্তমানে SJDA পরিকাঠামো গঠনের কাজের দিকে এমনভাবে নজর রাখছে যে, এই এলাকার চারিদিকে অর্থনৈতিক কার্যকর্মও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে বেসরকারি বিনিয়োগ আরও বেশি বাড়বে ও ওই অঞ্চলে আরও বেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে। বেসরকারি বিনিয়োগের জায়গা হিসাবে যেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি হল পরিকাঠামো নির্মাণে, বাড়িঘর নির্মাণে, ভ্রমণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পকে গড়ে তোলা। এবং Taj Group এখানে ইতিমধ্যেই জমি সংগ্রহ করেছে। তা ছাড়া এই জায়গায় herbal based industries এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এ ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার পথ খোঁজা চলছে।

১০.৫. আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা (Asansol Durgapur Development Authority– ADDA)

১৯৭৯ সালের West Bengal Town and Country (Planning and Development) আইনের অধীনে ১৯৮০ সালে ADDA স্থাপিত হয়। বর্তমানে ADDA গোষ্ঠীর সভাপতি সমেত সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। সচরাচর এই গোষ্ঠীর মেয়াদ ৩ বছর। ADDA অধিকৃত ক্ষেত্র বিশাল, প্রায় ১৬১৫ Sq. KM. যা বর্ধমান জেলায় দুটি উপবিভাগে আসানসোল এবং দুর্গাপুরে বিস্তৃত। এই এলাকার সঙ্গে আছে দুটি আইনসংগত পৌরসভা — আসানসোল পৌরসভা ও দুর্গাপুর পৌরসভা এবং তিনটি পৌরসংঘ— রানিগঞ্জ, জামুরিয়া ও কুলটি।

শিল্প ও শহরাঞ্চল গড়ে তোলার (উভয় ক্ষেত্রেই) কাজে ADDA অঞ্চল উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিল্পাঞ্চলের খণ্ড খণ্ড জমির উন্নয়ন করছে, যেখানে রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর সুবিধা আছে, তা ছাড়া বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে জমিও দিচ্ছে।

ADDA ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য জলের লাইন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জোগান দিচ্ছে। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে জল সরবরাহ যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্য ADDA Durgapur Project Limited ও DMC-র সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে এবং DPL, DVC এবং WBSED-এর সঙ্গে ADDA সংযোগ রাখছে শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তিকে সহজলভ্য করার জন্য যে যার নিজের আধিপত্যের এলাকায়।

শহর-এলাকায় ADDA বিভিন্ন মাপের বাসযোগ্য জমির উন্নয়ন করছে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে হাউসিং সমবায়, সরকারি এবং বেসরকারি অফিস, শিল্প স্থাপন এবং ব্যাবসায়িক কারণে জমি বণ্টন করা। এ ছাড়া ADDA রাস্তা অন্য সমস্ত পরিকাঠামো এবং জনজীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তুসমূহেরও জোগান দিচ্ছে। ব্যাবসা ও বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা গড়ে তোলার জন্য ADDA ব্যাপক Area Development প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির জন্য ADDA জমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে, উদ্দেশ্য— স্কুল, কলেজ, অতিথিশালা ও বিনোদনের জন্য নগরোদ্যান সৃষ্টি করা।

ADDA অবিচলিত ভাবে গ্রাম-শহরে সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে চলেছে। ADDA নিজস্ব ও সেইসঙ্গে সরকারি মূলধনের সাহায্যে শহুরে ও গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় জল নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ নর্দমা নির্মাণ, জল সরবরাহ ও অন্য সব জনহিতকর কাজ ও সেচের সুবিধার জোগান দিয়ে চলেছে।

১০.৬. কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট (Kolkata Improvement Trust – KIT)

যে বছর ইংরাজ সরকার তৎকালীন কলকাতা থেকে (Calcutta) ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই সময়ই এই নগরের উন্নতির জন্য একটি improvement trust দিলেন ইংরাজ সরকার। এই trust-এর দায়িত্ব ছিল এই নগরীর জন্য সবরকম উন্নয়নমূলক সুযোগসুবিধার জোগান দেওয়া। এই Kolkata Improvement Trust (KIT) ১৯১২ সালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই নগরীর অনেক রকম উন্নয়নের ভার ছিল এই 'Trust' ওপর। বেশির ভাগ উন্নয়ন মূলক কাজের ধরন ছিল রাস্তা তৈরি, অঞ্চল উন্নয়ন ও বস্তি উন্নয়ন।

কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Corporation) ওপর "Kit"-এর কর্তৃত্ব ছিল। এটি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের অঞ্চল সীমা বাড়াতে পারে না। এবং এই প্রসারণ একমাত্র রাজ্য সরকারই করতে পারে।

নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির সঙ্গে 'KIT' জড়িত ঃ

(১) সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্প (General Improvement Scheme)।

(২) রাস্তা প্রকল্প (Street Scheme)।

(৩) বাড়িঘরের বন্দোবস্তের প্রকল্প (Housing Accomodation)।

(৪) পুনর্বাসন প্রকল্প (Rehousing Scheme)।

এই প্রকল্পগুলি গঠনের সময় 'Trust' নগরের সমস্যাগুলির নানা দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারে— যেমন— সমস্যার প্রকৃতি (nature), অবস্থা, (condition) এবং সন্নিহিত অঞ্চলের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশের উন্নতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 'Trust'-কে নিজের প্রকল্পগুলির জন্য জমি অধিগ্রহণে অধিকার দেওয়া হয়েছে, যার ফলে খোলা জায়গা, নগরোদ্যান ইত্যাদি জনসাধারণের সুবিধার জন্য Trust এগুলি স্থাপন করতে পারে।

Trust রাস্তা তৈরি এবং রাস্তা অদলবদলের কাজের দায়িত্বও নিয়েছে, কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া Trust-এর দায়িত্ব আছে বাড়ি ভাঙা এবং পুনগঠনের কাজ। যে-কোনো শ্রেণির অধিবাসীদের জন্য বাসস্থানের জোগান দেওয়া ও বাসগৃহগুলি অদলবদলও Trust করতে পারে।

KIT-এর উন্নয়ন প্রকল্পে তিনটি ধাপ (Steps) আছে ঃ

(১) প্রকল্পটি প্রস্তাবনার প্রকাশন ও তার ঘোষণা—

(ক) স্থানীয় এলাকায় প্রকল্পটির প্রকাশ।

(খ) স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটির ঘোষণা।

(গ) যে বাড়িটি অধিগ্রহণ করা হবে তার দখলদারিদের প্রত্যেককে প্রকল্পটির কথা জানাতে হবে।

(২) অভিযোগ শোনার জন্য Trust একটি সমিতি গঠন করবে এবং সমস্ত অভিযোগগুলি বিবেচনা করার পর—

(৩) Trust স্থির করবে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে না বাতিল করা হবে।

প্রকল্পটি যদি অনুমোদন পায় KIT তখন অনুমোদনের জন্য রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন জানাবে।

KIT-এর প্রকল্পটি যদি গৃহীত হয় রাজ্যসরকার তখন প্রকল্পটিকে অনুমোদন করতে পারে বা বাতিল করতে পারে বা রদবদল করতে পারে।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ গড়ে তোলা Trust-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। এগুলি ছাড়া উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোড এবং বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ রাস্তা দুটি Trust-ই তৈরি করেছে। কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব অংশের ড. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ গঠন 'Trust' -এর আর একটি কৃতিত্ব।

নতুন অঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'Trust' ঢাকুরিয়া লেকের পাশে সাউদার্ন অ্যাভিনিউ নামে রাস্তাটি তৈরি করেছে, এবং পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা লেকও 'Trust'-এর সৃষ্টি। কলকাতার পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অঞ্চল উন্নয়নের কর্মসূচির সাহায্যে ভবানীপুর-কে শহর পরিকল্পনার আধুনিকমানে উন্নত করা হয়েছে। KIT-এর সাম্প্রতিক কর্ম সাফল্য উল্টোডাঙা ও ঢাকুরিয়ায় নাগরিক কেন্দ্রের (Civic Centers) সৃষ্টি।

'Trust' যদিও এখনও কাজ করে যাচ্ছে তবে Trust খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে নানারকম বিধিনিষেধের কারণে। এর জন্য দায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। যাইহোক বছরের পর বছর ধরে KIT শহর পরিকল্পনার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে তার কাজকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করে রেখেছে। উন্নয়নের পথে বহু অর্থনৈতিক বাধা সত্ত্বেও KIT বিকাশশীল কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টা করে চলেছে।

১০.৭. প্রশ্নাবলি

১। শহুরে সমষ্টি উন্নয়নের বিশেষ উন্নয়ন সংস্থাগুলির বিশদ বিবরণ দিন এবং ব্যাখ্যা করুন।

২। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন সংস্থার (SJDA) উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির বিবরণ দিন।

৩। হলদিয়া উন্নয়ন সংস্থার (HDA) ওপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

একক—১১ ❑ শহুরে স্থানীয় সংজ্ঞাসমূহ

গঠন

১১.১ পৌর বা নগর এলাকার স্থানীয় সংস্থাসমূহের গঠন এবং কার্যাবলি

১১.২ পৌর কাঠামো এবং গঠন

১১.৩ নগরপালিকা বিল ও ওই বিলের ৭০ তম সাংবিধানিক সংশোধন

১১.৪ প্রশ্নাবলি

১১.১ পৌর বা নগর এলাকার স্থানীয় সংস্থাসমূহের গঠন এবং কার্যাবলি

আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ধারণা, গঠন এবং কার্যাবলি — ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের কথা জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ভারতে ইংরাজ শাসনের আমলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রধানত লর্ড রিপনের সক্রিয়তায় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সব প্রদেশেই স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি চালু হয়েছিল। এরকম স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের উচ্চকাঙ্খা পূরণ করা। ওই সময় ইংরেজ আমলাদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অকৃত্রিম ইচ্ছা ছিল। ইংরাজ আমলাগণ আরও আশা করেছিলেন যে স্থানীয় উন্নয়নের কাজের ভার নিতে পারবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি। ওই সময়ের আমলাতন্ত্র এই কাজগুলি সম্পন্ন করার অবস্থায় ছিল না। স্থানীয় প্রশাসনের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গঠন আমরা এখন দেখি সেগুলি এদেশে ইংরাজ শাসনের সময়ই শুরু হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শহুরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর প্রচলন তা গত শতাব্দীর শুরুতেই চালু করেছিল ব্রিটিশ রাজ্য। এই সব শহুরে স্থানীয় শাসন প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় লোকেদের কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে স্বশাসন দেবার চেষ্টা। যার ফলে ওই অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের কিছু নাগরিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে মিটিয়ে নিতে পারবে ও সেই সঙ্গে স্থানীয় লোকের কাজের প্রয়োজনে স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতা পেতে পারবে। এসব ছাড়া শহুরে আঞ্চলিক শাসন প্রণালীর আরও একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল যে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করে ওই অঞ্চলের লোকেরা আঞ্চলিক সরকারকে আর্থিক সহায়তা দিতে পারবে। আঞ্চলিক স্তরে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা শহুরে স্থানীয় স্বশাসনের আরও একটি উদ্দেশ্য।

পৌর আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল— আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলি এক একটি নির্বাচিত গোষ্ঠী। স্থানীয় এলাকায়, যেখানে গোষ্ঠীগুলি কাজ করে, সেখানে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকে স্থানীয় গোষ্ঠীর সভার জন্য একজন করে সভ্য (Councillor) নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচিত সভ্যগণ, (আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে) মহানগরিক বা সভাপতি নির্বাচিত করেন। সাধারণত এই মহানাগরিক (Mayor) সভাপতিই (Chairman) স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রধান কর্মসচিব (Chief Exceution) বেশির ভাগ পৌর স্থানীয় গোষ্ঠীর নানা সমিতি আছে। এই সমিতিগুলির কাজ মহানাগরিক বা সভাপতিকে তার কাজে সহায়তা করা। এই সমিতিগুলি কর্মচারী তালিকাভুক্ত করে। কররের আবেদন শোনে এবং কেনাকাটার কাজ করে। এই সমিতিগুলির গঠন এবং কাজ সাধারণত রাজ্যের পৌরনিগমের আইন (Municipalities Act) অনুসারে স্থির হয়। এই সমস্ত পৌর আঞ্চলিক শাসক গোষ্ঠী তাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য সাহায্য পায় একটি কার্যনির্বাহিক শাখার। এই শাখার প্রধান Commissioner of the Corporation or Municipality. এই সব Municipal Commissioner গণ সরকারী

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। রাজ্য সরকার এঁদের প্রতিনিধিরূপে পৌরসংঘ প্রেরণ করেন। এই পৌরসংঘগুলির (Municipalities) তাদের নিজস্ব কর্মী (Staff) আছে। এই কর্মীরা কাজ করে স্থানীয় অঞ্চলে। আঞ্চলিক গোষ্ঠীবর্গ নিজেরাই এদের নিয়োগ করে।

কার্যাবলি (Functions) ঃ শহরের স্থানীয় সংস্থা নিজেদের এলাকায় কিছু প্রাথমিক নাগরিক প্রয়োজনের কাজ করে থাকে। বেশির ভাগ স্থানীয় সংস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নাগরিক কাজগুলি করে থাকে তার মধ্যে আছে—

(১) স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উন্নতি সাধন— (Sanitation) ঃ স্থানীয় এলাকার আবর্জনা নিষ্কাশন, শহরের ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থার কাজ, স্থানীয় এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।

(২) জলসরবরাহ।

(৩) জনস্বাস্থ্য — এলাকার জন্ম এবং মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ, কবরস্থান ও শবদাহের জন্য চুল্লির ব্যবস্থা, প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের কাজ।

(৪) শহর এলাকার প্রাণী নিয়ন্ত্রণ।

(৫) শহর পরিকল্পনা ও গৃহনির্মাণের বিধি নির্ধারণ।

(৬) শহরে আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ও শিল্প এলাকা নির্দিষ্ট করা এবং শহর এলাকায় শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্য অঞ্চলের উন্নয়নের নিয়ম বিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

শহরে স্থানীয় সংস্থা গুলিতে কিছু প্রশিক্ষত কর্মচারী থাকে। এই প্রশিক্ষণ বিভিন্ন এলাকার নানা ধরনের কাজ করার জন্য। প্রত্যেকটি কাজের জায়গা এক একটি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বিভাগের কাজের নেতৃত্ব দেন ওই অঞ্চলের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের সচরাচর দেখাশোনা করেন একজন Health officer এবং গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে বিধিগুলি কার্যকরি করে শহর পরিকল্পনা বিভাগ এবং এ কাজের নেতৃত্ব দেন একজন Town Planner (শহর পরিকল্পক)। বেশির ভাগ রাজ্যে স্থানীয় সঞ্চিত অর্থ সরকারি ভাবে পরীক্ষার জন্য বিভাগ আছে। এই বিভাগ পৌর নিগম এবং পৌর সংঘ যে সঞ্চিত অর্থ খরচ করে তার হিসাব করে। এই স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কাজের যে আইন তা স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি যে ক্ষমতাভোগ করে তার প্রাপ্তির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত তবুও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্থানীয় সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত কার্যকরি করার আগেই রাজ্য সরকার নিজেই সেগুলির জন্য সরকারের অনুমোদন চাইতে পারেন। কোন কোন পরিস্থিতিতে রাজ্যসরকারগুলি সভার কাজ (duties) চালিয়ে নেবার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অপসারিত করে বিশেষ officer নিয়োগ করার অধিকার রাখেন। সাধারণত এই অধিকারের প্রয়োগ তখনই হয় যখন কোন স্থানীয় গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

উপরে উল্লিখিত কাজগুলির সব কাজই স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি করে থাকে। এগুলির সবই প্রাথমিক নাগরিক প্রয়োজনের কাজ, যেগুলিকে যে-কোনো স্থানীয় সংস্থাকে করতে হবে। এ সব ছাড়াও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড়ো স্থানীয় সংস্থা আছে যারা কিছু লাভজনক কাজ করে বা তাদের অন্য অন্য সরকারি কাজের জন্য রাজস্ব উপার্জন করতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ মুম্বাই-এর পৌরনিগমের কথা বলা যায়। এই রকম পৌরনিগমের কিছু স্থানীয় সংস্থা থাকে। মুম্বাই-এর পৌরনিগম স্থানীয় বাস (Bus) পরিসেবা চালায়। আবার অনেক স্থানীয় গোষ্ঠী আছে যারা তাদের এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ (Electricty) বণ্টন করে। এই রকম বাণিজ্যিক কাজকর্ম এই সব স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য কর মুক্ত রাজস্ব পেতে সাহায্য করে।

আঞ্চলিক সরকারকে চালিত রাখার জন্য এইসব পৌর স্থানীয় সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হল স্থানীয় সম্পদ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। শহরাঞ্চলের বেশির ভাগ স্থানীয় সংস্থার রাজস্বের জন্য সুনির্দিষ্ট উৎস আছে। স্থানীয় সংস্থাগুলির রাজস্ব উপার্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ঃ

(১) **সম্পত্তি কর ঃ** ভারতবর্ষে স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য রাজস্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ সরকারের রাজস্বের ক্ষেত্রে এটাই প্রধান অবলম্বন।

(২) **আমোদ কর ঃ** রাজ্যসরকার এই কর ধার্য করেন সবরকম আমোদজনক ঘটনার পৌর এবং গ্রামীণ উভয় অঞ্চলেই। এই কর থেকে যা লাভ হয় তা সবই স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে চলে যায়।

(৩) **বৃত্তি কর ঃ** এই কর ধার্য করা হয় সেইসব লোকেদের ওপর যারা ওই এলাকায় কোনো পেশায় যুক্ত বা কোনো চাকরিতে নিযুক্ত।

(৪) **নগর-শুল্ক (Octroi Duties) ঃ** কিছু কিছু রাজ্য আছে, যেমন মহারাষ্ট্র, সেখানে স্থানীয় সংস্থার জন্য ভালো আয়ের উৎস আছে। শহুরে এই সংস্থাগুলি সরকারি প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় যদি কোনো মাল (goods), বিক্রি বা ব্যবহারের জন্য প্রবেশ করে ঐ সংস্থা সেই মালের উপর কর ধার্য করে। এই করকেই বলে ‘Octroi’।

পারিশ্রমিক (Fees) ঃ শহরের স্থানীয় সংস্থাগুলি বিভিন্ন পরিসেবার জন্য যে পারিশ্রমিক পায় যেসব তারা সরকারি রাজস্ব-বিভাগে জমা দেয়। যে যে পরিসেবার জন্য পারিশ্রমিক ধার্য করা হয় সেগুলি হল ঃ জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন প্রভৃতি। তা ছাড়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুমতি পত্র (licences) দেওয়া হয়— যেমন গৃহনির্মাণের জন্য কোনো শিল্প বা বাণিজ্য সংস্থা চালানোর জন্য বা বাড়িতে কোনো পশু রাখার জন্য কর, প্রভৃতি।

১১.২ পৌর স্থানীয় শাসন-প্রণালীর গঠন

পৌর স্থানীয় শাসন-প্রণালীর গঠন ঃ

১। পৌরনিগম (Municipal corporation)

২। পৌরসংঘ / পৌরসভা (Municipalities/ Municipal council)

৩। ঘোষিত এলাকা সমিতি/ শহরাঞ্চল সমিতি (Notified Area committee / Town Area Committee)

৪। সেনাবাস বোর্ড (Cantonment Board)

৫। শহর এলাকা (Township)

প্রত্যেক রাজ্যেই নির্দিষ্ট কিছু প্রণীত আইন আছে পৌর প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার জন্য এবং এটি গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসন পদ্ধতির সঙ্গেও কাজ করে। কেননা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা রাজ্যের বিষয়। বেশির ভাগ শহরাঞ্চল পৌরসংঘ, পৌরসভা ও শহর পঞ্চায়েতের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা থাকে বা ভাগ করা থাকে। তবে এই বিভাগ জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে এবং সেই নীতি এক এক রাজ্যে এক এক রকম হতে পারে। ১০ লাখের ওপর জনসংখ্যা সহ বড়ো নগরগুলি কর্পোরেশন হিসাবে গঠিত, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো নগর মুম্বাই এবং কলকাতা। যে সব নগরের জনসংখ্যা কমের দিকে (সচরাচর ১০ লক্ষের কম, কিন্তু ৫০ হাজারের বেশি) সেগুলিতে তৈরি হয় পৌরসভা এবং যে শহরের জনসংখ্যা ৫ হাজারের বেশি কিন্তু ৫০ হাজারের কম, সে জায়গায় গড়ে ওঠে শহর পঞ্চায়েত। যদিও এই সব সংস্থাগুলি সরকারি কাজই করে কিন্তু এলাকার স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে কাজের সুযোগ সম্ভাবনায় তফাত থাকে। তা ছাড়া শহর এলাকার স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির প্রশাসন সংগঠনের জন্য পরিসেবার কাজের পার্থক্য হয়। ভারতবর্ষের আরও দুটি শহরে স্থানীয় গোষ্ঠীর বিষয় উল্লেখ করতে হবে। যেমন Townships and Cantonment Boards. Township গুলি গড়ে ওঠে কিছু কিছু বিশেষ শহরাঞ্চলে যেমন পাহাড়ি resort বা শিল্পাঞ্চল, এবং পৌরসভা ও Township-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে — যেখানে পৌরসভার সদস্যরা নির্বাচিত সদস্য, সেখানে Township সমিতির সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধি নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু কিছু অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

যে ভাবে এই কাজগুলি করা হয় তা স্বায়ত্তশাসনের গণতান্ত্রিক মেজাজের একেবারে বিপরীত। কিছু কিছু অঞ্চলে যেখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির প্রাধান্য যেমন Military Cantonment (সেনা ছাউনি), সেখানে পৌর স্থানীয় প্রশাসনকে বলে Cantonment Board, এবং যদি এই Board-এর সভাপতি ও সদস্যগণ নির্বাচিত হন তবুও পৌরসভাগুলির তুলনায় এদের ক্ষমতা খানিকটা সীমাবধ্ধ।

(১) **পৌরনিগম (Municipal corporation)** ঃ পৌর স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্থানে আছে পৌরনিগম (Municipal Corporation); 'সর্ব্বোচ্চ', কারণ অন্য ধরনের স্থানীয় প্রশাসনের তুলনায় এটি সবচেয়ে বেশি স্বশ্বাসনের সুবিধা ভোগ করে। পৌরনিগম স্থাপিত হয় রাজ্য বিধান সভার অনুমোদিত বিশেষ আইনে। কেন্দ্র শাসিত রাজ্যগুলির পৌরনিগম স্থাপিত হয় সংসদের আইনে।

(২) **পৌরসংঘ / পৌরসভা (Municipalities / Municipal council)** ঃ পৌর আইনের অধীনে এগুলি চালিত হয়। প্রধানত শহরাঞ্চলের জন্য এই সংস্থা অর্থাৎ এই শহুরে প্রশাসন কাজ করে। এখানকার কাজ দুটি ভাগে বিভক্ত; যেমন— একটি বাধ্যতামূলক ও অন্যটি বিবেচনামূলক। বাধ্যতামূলক কর্ম সম্পাদনের ব্যর্থতায় পৌরসভার চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং পৌরসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। বিবেচনামূলক কাজগুলির সম্পাদন নির্ভর করে পৌরসভার সংগতির ওপর।

(৩) **ঘোষিত এলাকা সমিতি / শহরাঞ্চল সমিতি (Notified Area Communittee)** ঃ পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত ঘোষিত অঞ্চল সমিতি এবং শহরাঞ্চল সমিতি। ঘোষিত এলাকা সমিতিকে পৌরসংঘের সঙ্গে তুলনা করা যায় না কিন্তু নতুন উন্নতিশীল শহরগুলির সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ আছে। এই সমিতি স্থাপনার খবর সরকারি সংবাদ পত্রে ঘোষিত হয়। এই সমিতির সদস্যগণ রাজ্যসরকারের মনোনীত করা সাধারণত উন্নতিকামী শহরগুলির কিছু নাগরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য এগুলি স্থাপিত হয়। ওই সমিতিকে পৌর আইনের নির্দেশিত সীমার মধ্যে কাজ করতে হয়। এবং এটি সরকারি সংবাদপত্রের ঘোষিত নির্দেশের অধীন। এই সম্পূর্ণ মনোনীত গোষ্ঠী অন্য সব পৌরসংঘ যেভাবে কাজ করে এরাও সেই ভাবে কাজ করে। এবং গৃহ নির্মাণ কর 'Octroi' এদের রাজস্বের প্রধান উৎস। পৌর আইনের কিছু কিছু বিভাগ এই সব অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়। এবং এই অঞ্চলের কিছু কিছু কাজ এই সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৪) **সেনাবাস বোর্ড (Cantonment Board)** ঃ এই সেনাবাস বোর্ডগুলি একেবারে সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত অঞ্চল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের পরিচালিত। এই শহুরে আঞ্চলিক প্রশাসন অত্যন্ত সীমাবধ্ধ কাজ করে এবং এই বোর্ডগুলি ১৯২৪ সালের Cantonment আইনের আওতায় গঠিত হয়। এই সৈনবাসগুলি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ঃ

(১) প্রথম শ্রেণির সেনাবাস — যেখানকার অসামরিক লোক সংখ্যা ১০,০০০ এর বেশি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির সেনাবাস — যেখানে অসামরিক লোক সংখ্যা ২,৫০০ এবং ১০,০০০ মধ্যে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির সেনাবাস — যেখানে অসামরিক লোক সংখ্যা ২,৫০০ এর কম।

(৫) শহর এলাকা (Township) ঃ শহর এলাকায় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত; এই এলাকার বেশির ভাগই বর্তমান শহরের বাইরে গঠিত হয়। এগুলি সাধিত হয় আমলাতান্ত্রিক ধরনে। অন্যসব প্রশাসনের (Government) থেকে আলাদা। যুক্তি দিয়ে বলা হয় এগুলি 'Project Population-র জন্য তৈরি হয়। কারণ এই জনগণের জন্য প্রয়োজন হয় উচ্চমানের পরিসেবা ও সুযোগসুবিধা।

বেশির ভাগ সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের কর্মীদের জন্য শহরাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। শহরাঞ্চল প্রতিষ্ঠায় মূল বিনিয়োগের প্রায় ১১% তারা খরচ করে।

এই ধরনের শহরাঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(১) শহরাঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

(২) শহরাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিসেবা অত্যন্ত উচ্চ মানের, সাধারণত অন্য পৌরসভার দ্বারা প্রদত্ত রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিসেবার তুলনায়।

(৩) এই সব পরিসেবা ও সুযোগসুবিধার খরচ চালায় শিল্পগুলি।

(৪) শহরাঞ্চলের চারপাশের অঞ্চল অত্যন্ত শৃঙ্খলবিহীনভাবে বেড়ে ওঠে। তা ছাড়া ওই জায়গায় অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলোভাবে বসতি গড়ে ওঠে এবং ওই জায়গার চারিপাশের বাড়িগুলি নিম্নমানের।

১১.৩ নগরপালিকা বিল এবং ওই বিলের ৭৪ তম সাংবিধানিক সংশোধন

১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকার একটি সাংবিধানিক বিল (প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি) আনেন— যেটি 'নাগরপালিকা বিল' নামে পরিচিত। এই 'বিলটি' শহরে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এই বিলটি সংসদে উপস্থাপিত করার সময় প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন যে অসামরিক গোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই 'বিলে' গণতন্ত্র সমাজের নীচু স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এতদিন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোনো পৃথক সাংবিধানিক অস্তিত্ব ছিল না এবং পঞ্চায়েত ও অসামরিক গোষ্ঠী কদাচিৎ কার্যকরী হত। এখন গণতন্ত্র আমাদের সামাজিক গঠনের সবচেয়ে নীচু স্তর থেকে মূল অবধি ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

নগরপালিকা বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) পৌরগোষ্ঠীগুলিকে সাংবিধানিক পদমর্যাদা দেওয়া যে মর্যাদা এতদিন তাদের ছিল না।

(২) পৌরগোষ্ঠীর জন্য আগের চেয়ে আরও বেশি অর্থ সাহায্য।

(৩) পাঁচ বছর অন্তর পৌর সভার নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং বিভাগীয় সমিতি তৈরি।

(৪) অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত উপজাতিদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুবিচারের স্বার্থে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ।

(৫) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার উন্নতির পথে বাধা ছিল। কিন্তু এই বিলের শর্ত এই পদ্ধতিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

(৬) আরও বড়ো পৌরগোষ্ঠীর জন্য স্তরভিত্তিক কাঠামোর ধারণা অবলম্বন করা। বিভাগীয় সমিতিগুলির যথোপযুক্ত বিধিসম্মত ক্ষমতা থাকা। বিভাগীয় মন্ত্রণা সভার সভ্যগণ পৌরসভা ও বিভাগীয় সমিতির সংযোজক হতে পারে। ৩,০০,০০০ এর বেশি জনসংখ্যাযুক্ত নগরগুলি তাদের জন্য পৌরসংঘগুলি (Municipal corporation) সমেত একটি বিশেষ অঞ্চলে গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল।

(৭) বড়ো বড়ো পৌরসভার জন্য দুই বা তিন স্তরের কাঠামো এবং আধা-শহর অঞ্চলের জন্য নগর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। এই পদক্ষেপ উন্নয়ন পদ্ধতিতে ও উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত-তৈরির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

যাইহোক, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ একটি সংশোধিত 'নগরপালিকা বিল' অনুমোদন করেন, এবং সংবিধানের ৭৪তম সংশোধন (নগরপালিকার সংক্রান্ত আইনের) ১লা জুন ১৯৯৩ থেকে তা কার্যকরী হয়। এই নগরপালিকা আইন পৌরপ্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন প্রবর্তনের জন্য বিবেচনা করেন। এই পরিবর্তনগুলি হল— দুর্বল শ্রেণি ও নারীদের প্রতিনিধিত্ব, যথাবিধি নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজ্য ও পৌর নিগমগুলির মধ্যে উন্নত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং জেলা ও শহরগুলির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তার জন্য পরিকল্পক সমিতি গঠন করা।

সংশোধিত আইনের ২৪৩ ২এফ দফা অনুযায়ী পৌরসভার যে-কোনো শর্ত— (প্রচলিত আইন সংক্রান্ত) যে শর্ত

সংশোধন আইনের সঙ্গে সংগতিহীন তা কার্যকরী থাকবে, যতদিন না আইনটি সংশোধিত হয় বা পরিবর্তে অন্য আইন বলবৎ হয় একটি উপযুক্ত বিধানমণ্ডলের দ্বারা, অথবা প্রচলিত আইনটির মেয়াদ যদি আইনটি কার্যকরী হওয়ার ১ বছর আগে শেষ হয়ে যায়— বা যে ঘটনাটি আগে ঘটবে (Whichever is earlier)।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ এই নগরপালিকা বিলটি অনুমোদন করেন। এর উদ্দেশ্য— শহুরে আঞ্চলিক প্রশাসনের গঠন ও সংগঠনে যতকিছু দোষ-ত্রুটি, অভাব এবং অপ্রতুলতা আছে তার সংশোধন করা ও পুনরুজ্জীমিত করে শক্তিশালী করে তোলা। সাম্প্রতিককালের এই আইনটির ঘোরালো বিষয়গুলি নিম্নে লিখিত হল।

(ক) তিন ধরনের নগরপালিকার স্থাপন— নগরপালিকা পঞ্চায়েত অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সূচক (transitional) এলাকাগুলির জন্য, পৌরসভার জন্য ও শহরাঞ্চলের পৌরসংঘগুলির জন্য।

(খ) বিভাগীয় ও আঞ্চলিক সমিতি গঠন, এর উদ্দেশ্য— আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে প্রমাণ করা।

(গ) জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া এবং তাদের ওপরে বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব দেওয়া যাতে একটি নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

(ঘ) স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া, যার ফলে কমিশন ন্যায্য ভাবে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে অকৃপণ সাহায্য দিতে পারে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির জনসংখ্যা অনুপাতে অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(চ) মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ।

(ছ) অর্থ কমিশনের নিয়োগ যাতে আঞ্চলিক সংস্থার রাজস্বের প্রয়োজন মেটানো যায় ও নিয়মিত ভাবে খরচ সরকারি হিসাবে পরীক্ষা চলতে পারে।

(জ) স্থানীয় শহরে সংস্থাগুলির সাংবিধানিক পদ মর্যাদার অনুমোদন।

আশা করা যায় উপরে উল্লিখিত শর্তগুলি স্থানীয় সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করে তুলবে। একটি নতুন যুগের সূচনা হবে— যেখানে একটি সুসংগঠিত এবং উপযুক্তভাবে পুনরুজ্জীবিত স্থানীয় শাসন পদ্ধতি থাকবে, যে পদ্ধতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত প্রশাসনের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিধি সংগতভাবে কার্যে পরিণত করে। কারণ প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর।

১১.৪ প্রশ্নাবলি

(১) শহুরে আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির গঠন ও কার্যাবলির বিবরণ দিন।

(২) 'নগরপালিকা বিল'-এর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

একক—১২ ❑ স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা ইত্যাদি নগর উন্নয়নপ্রকল্পের পশ্চাৎপট, প্রশাসন, লক্ষ্য, লক্ষ্যগোষ্ঠী এবং কাজ।

গঠন

১২.১. ভূমিকা
১২.২. স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা
১২.৩. প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা
১২.৪. প্রশ্নাবলি

১২.১. ভূমিকা

গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নতি বিধানের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যে ভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, সেভাবেই শহরের দরিদ্র মানুষের— বিশেষত বস্তীবাসীদের উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পগুলি সরাসরি সরকার পরিচালিত অথবা কোনো বিধিবদ্ধ স্বশাসিত সংস্থা যেমন দিল্লি উন্নয়ন প্রাধিকার (DDA), ভুবনেশ্বর উন্নয়ন প্রাধিকার (BDA), কলকাতা রাজধানী সম্বন্ধীয় উন্নয়ন প্রাধিকার (KMDA) ইত্যাদির দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে। এমনকি পৌরসভা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনও এই সব প্রকল্প রূপায়ণে ভূমিকা পালন করে থাকে। এই এককটির উদ্দেশ্য হল এই প্রকল্পগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণার জোগান দেওয়া।

১২.২. স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY)

এই প্রকল্পটি শহরাঞ্চলের বেকার এবং অর্ধবেকার দরিদ্র মানুষের জীবনধারণের উপযোগী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। স্বনিয়োজন অথবা চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনে পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি রচিত হয়েছে। এই যোজনা বা প্রকল্পটির মধ্যে দুটি বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) শহরী স্বনিযুক্তি কর্মসূচি (USEP)

(খ) শহরী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি (UWEP)

এই যোজনার মুখ্য বিষয়গুলি হল ঃ

— সমষ্টি সশক্তকরণের ভিত্তির ওপর এটি দাঁড়িয়ে আছে।

— স্থানীয় উন্নয়নের জন্য ওপর থেকে প্রকল্প রূপায়ণের পরিবর্তে সমষ্টি সংগঠন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে সমষ্টিকে যুক্ত করে কাজ করা।

— লক্ষ্য এলাকায় পাড়া গোষ্ঠী (Neighbourhood group), পাড়া গোষ্ঠী কমিটি (Neighburhood Committee), সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি (Commity Development Society) ইত্যাদির মত গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা।

— উপকৃত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, আবেদনপত্র তৈরি, ঋণ শোধ করানোতে সাহায্য ইত্যাদিসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তামূলক কাজকর্মে তারাই হল কেন্দ্রবিন্দু।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

— এই CDS গুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সম্ভাবনাময় উদ্যোগ প্রকল্প নির্বাচনে মূল ভূমিকা নেবে।

— CDS গুলি নিজেদের Thrift and Credit Society হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। অবশ্য এগুলিকে CDS থেকে পৃথকভাবেও সংগঠিত করা যেতে পারে।

— CDS গুলি আইন অনুযায়ী পঞ্জিকৃত হবে।

— এই যোজনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৭৫ ভাগ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ ভাগ দেবে রাজ্য সরকার।

শহরী স্বনিযুক্তি কর্মসূচি (U. S. E. P.) ঃ

এই কর্মসূচি তিনটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত। সেগুলি হল ঃ

(ক) শহরে বসবাসকারী দরিদ্রদের ব্যক্তিগত স্বনিযুক্তি বা যৌথ উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা দান।

(খ) শহরের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে গঠিত উপগোষ্ঠীগুলিকে DWCUA নামক উপকর্মসূচির মাধ্যমে সাহায্য করা।

(গ) উপরিউক্ত শ্রেণির মানুষদের স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে কারিগরি ও ঔদ্যোগিক দক্ষতা অর্জন এবং বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এই কর্মসূচির পরিধি হল দেশের সমস্ত শহর এলাকা। শহরের নিম্নবিত্ত মানুষেরা যে সব খণ্ডে বসবাস করেন সেই এলাকাগুলি হল লক্ষ্য এলাকা। শহরের সমস্ত দরিদ্ররাই এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। তবে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করা মানুষেরা বিশেষ গুরুত্ব পাবে। আবার তাদের মধ্যে নারী, বিকলাঙ্গ, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত উপজাতিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মোট উপকৃতের অন্তত তিরিশ ভাগ মহিলা হবেন এবং তিন ভাগ হবেন বিকলাঙ্গ। এলাকায় বসবাসকারী অনুসূচিত জাতি ও উপজাতির সংখ্যার বা অনুপাতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ওই শ্রেণিভূক্ত সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। মহিলা পরিচালিত পরিবারগুলি অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য পাবে।

এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনো নিম্নসীমা নেই। তবে স্বনিযুক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে নবম শ্রেণি পর্যন্ত। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ প্রকল্পে শিক্ষার মান নিয়ে কোনো বাধানিষেধ নেই। উপকৃতদের সঠিকভাবে নির্বাচনের স্বার্থে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ চালানো হয় পৌরসভার নেতৃত্বে। এইভাবে নির্বাচিতদের তালিকা পৌরসভার কার্যালয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পৌরসভা মনে করলে এই কাজের জন্য উপযুক্ত কোনো সংস্থার সাহায্য নিতে পারে।

এই কর্মসূচির উপাদানগুলি হল ঃ

(ক) এর মাধ্যমে বেকার এবং অর্ধবেকারদের অনু আয়তনের স্বনিযুক্তি উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। স্থানীয় দক্ষতা এবং হস্তশিল্প, ছোটো ব্যবসায়, উৎপাদনধর্মী কাজ, পরিসেবামূলক কাজে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা হয়। জিনিসের মূল্য, বাজারজাত করার সুবিধা, টিকে থাকার সম্ভাবনা ইত্যাদি মাথায় রেখে প্রতিটি পৌরসভা একটি তালিকা তৈরি করবে। এই প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫০০ টাকা বা মোট ব্যয়ের ১৫% সরকারি সাহায্য হিসাবে দেওয়া যাবে। অন্যদিকে উপকৃত ব্যক্তিকে মোট ব্যয়ের শতকরা ৫ ভাগ প্রান্ত অর্থ (Margin money) হিসাবে দিতে হবে।

(খ) এই কর্মসূচীর দ্বিতীয় উপাদান হল উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে স্বনিয়োজন বা চাকুরি প্রাপ্তির উপযুক্ত করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে আই. টি. আই, সমষ্টি পলিটেকনিক, জনশিক্ষণ সংস্থান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করবেন। সেজন্য উপকৃত পিছু ২০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তা দু'মাসের কম এবং ছয় মাসের বেশি হবে না।

(গ) অনু আয়তনের উদ্যোগ স্থাপনকারীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরিকাঠামোগত সহায়তা দান এই কর্মসূচির আর একটি উপাদান। এর জন্য কিয়স্ক (Kiosk) স্থাপন, পৌরসভা সেবাকেন্দ্র গঠন, হাট ও বাজার স্থাপনের মত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে বাজার ও তার প্রবণতা সমীক্ষার কাজ, প্রচারকার্য

চালানো ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সহায়তা দেওয়া যাবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ সন্তোষজনক ভাবে শেষ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে অনধিক ৬০০ টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে।

শহর এলাকার মহিলা ও শিশুবিকাশ প্রকল্প ঃ

শহরের নিম্নবিত্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে যৌথ স্বনিযুক্তি উদ্যোগে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলাকার অবস্থা, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অর্জিত দক্ষতার সঙ্গে খাপখাইয়ে মহিলারা গোষ্ঠীবন্ধ হয়ে বৈষয়িক কাজ কর্ম তথা স্বনিযুক্তি উদ্যোগ নির্বাচন করবেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে শুধু আয়ের পথ সুগম হওয়া নয়, স্বনিযুক্তিমূলক প্রকল্প গড়ার পরিমণ্ডল তৈরি হবে এবং দরিদ্র মহিলারা আত্মনির্ভর হতে পারবে। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে গেলে অন্তত দশজন দরিদ্র মহিলাকে গোষ্ঠীবন্ধ হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সংগঠিকা হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। কী ধরনের গোষ্ঠী প্রকল্প তারা চালু করবেন তা নিজেরাই ঠিক করবেন। তারা আত্মসাহায্যকারী দল হিসাবেও নিজেদের গড়ে নিতে পারেন।

প্রত্যেক DWCUA গোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০ ভাগ বা সর্বোচ্চ ১,২৫,০০০ টাকা অনুদান পাবার যোগ্য। যদি তারা ঔদ্যোগিক কাজ ছাড়া স্বস্বহায়ক দল গঠন করেন সেক্ষেত্রে সদস্য পিছু ১০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫০০০ টাকার অনুদান পেতে পারে। এই আবর্তনমূলক মূলধন (Revolving fund) দিয়ে নিম্নলিখিত কাজকর্ম করা যাবে।

— কাঁচামাল ক্রয়বিক্রয়

— পরিকাঠামোগত সহায়তাদান

— শিশুসেবামূলক ক্রিয়াকর্ম

— রাহা খরচ

— নিজের বা পরিবারের অন্যদের জন্য স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা, জীবনবীমার জন্য

— গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য খরচ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে করা যাবে।

DWCUA বা স্বসাহায্যকারী দল গঠন করার অন্তত এক বছর পর ওই গোষ্ঠী বা দল আবর্তনমূলক মূলধন পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। ওই গোষ্ঠী কতগুলি মিটিং করেছে, কত অর্থ সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সঞ্চিত করেছে, সঞ্চয় নিয়মিত ভাবে করা হয় কি না, দক্ষতা বা কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি না এ সব সঠিকভাবে পরীক্ষা করার পরই গোষ্ঠীকে অর্থসাহায্য করা হয়।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়া সদস্যদের কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সমষ্টি সেবা কেন্দ্র গঠনের সংস্থানও রয়েছে এই কর্মসূচিতে। এই সেবা কেন্দ্র গঠনের জন্য পৌরসভা বিনামূল্যে জমি দান করবে। স্বনিযোজনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থের সর্বেচ্চ ১০ ভাগ এধরনের পরিকাঠামো গঠনের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের জন্য মোট বরাদ্দীকৃত অর্থের ৫ ভাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

শহরী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি (U. W. E. P.) ঃ

এই কর্মসূচি আর্থিক ও সামাজিকভাবে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপকৃতদের গঠনকাজে যুক্ত করে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে যে সব শহরের জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষের বেশি একমাত্র সেখানেই এই কর্মসূচি রূপায়িত হতে পারবে। এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ষাট ভাগ দ্রব্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং চল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হবে মজুরি হিসাবে।

সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি (C. D. S.) নিজ এলাকায় নিম্নতম যে সব সুবিধাসুযোগ রয়েছে তার তালিকা তৈরি করবে।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

সেই সঙ্গে কী ধরনের পরিকাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার তালিকাও তৈরি করবে। এগুলি 'ক' এবং 'খ' তালিকাভুক্ত হবে। 'ক' তালিকায় স্থান পাবে এলাকায় কোন্ কোন্ সেবার অভাব রয়েছে তার হিসাব এবং 'খ' তালিকায় স্থান পাবে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর তালিকা। বছরের শুরুতে এই তালিকা দুটি পৌরসভার দারিদ্র দূরীকরণ সেলের কাছে পেশ করতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্য শহর উন্নয়ন সংস্থা (S. U. D. A.) এবং জেলা শহর উন্নয়ন সংস্থাকে (D. U. D. A) এই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। পৌরসভার নজরদারিতে সমষ্টি উন্নয়ন সমিতিগুলিই সঠিকভাবে কর্মকাণ্ড রূপায়িত করবে। এই কর্মকাণ্ড সমাপ্তির পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য সার্বিক দায়িত্ব হল অনুমোদনকারী সংস্থার।

কর্মসূচি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখার জন্য ২০০০ চিহ্নিত পরিবার পিছু একজন করে সমষ্টি সংগঠক নিযুক্ত হবে না। যথাসম্ভব তিনি হবেন একজন মহিলা। তাদের দায়িত্ব হবে ঃ

— স্বেচ্ছাশ্রমে মানুষকে উদ্দীপ্ত করা এবং সমষ্টি কাঠামো তৈরি করা।
— প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ এবং পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করা।
— কর্মকাণ্ড রূপায়ণ এবং তদারকিতে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা।
— উপযুক্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
— সমষ্টির দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
— নিয়মিত follow up করা।
— সমষ্টি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা।
— স্বনিয়োজন উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত উপকৃতের চিহ্নিতকরণ।
— উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে শহরের দারিদ্র দূরীকরণের উপযোগী অন্য যে-কোনো বিষয়।

পৌরসভা স্তরে দরিদ্র দূরীকরণ সেলের কাজকর্ম দেখার জন্য একজন প্রকল্প আধিকারিক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। এই প্রকল্প আধিকারিকের দায়িত্ব হল ঃ

— সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি এবং সমষ্টি সংগঠকের কাজে সমন্বয় রক্ষায় সাহায্য করা।
— সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি এবং পৌরসভার কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।
— সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।
— সমষ্টি উন্নয়ন সমিতিগুলিকে তাদের কাজে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশ দান করা।
— পৌরসভার কর্মসূচির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শহরের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত করা।
— শহর স্তরে মানুষ্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া।
— শহর স্তরে এ সম্পর্কিত কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
— শহর সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা।

প্রতিটি শহর স্তরে শহর প্রকল্প আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে যার দায়িত্ব হল জেলা শহর উন্নয়ন সংস্থার (DRDA) কাজকর্ম দেখাশোনা করা। জেলা শাসকের প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও নির্দেশমত তিনি কাজ করবেন। জেলা উন্নয়ন সংস্থা হবে নিবন্ধভুক্ত। জেলা প্রকল্প আধিকারিকের মূল দায়দায়িত্ব হল ঃ

— জেলা স্তরে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পলিসি ঠিক করা।
— শহর/জেলা স্তরে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।
— তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
— জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিটির রূপায়ণ ও সংযোগ সাধনে উপদেশকের ভূমিকা পালন করা।

রাজ্যস্তরে এই প্রকল্পটি তত্ত্বাবধান করার জন্য রাজ্য শহর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA) গঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

এই সংস্থায় নেতৃত্ব দেবেন রাজ্য সরকারের কোনো প্রবীণ প্রশাসক। শহরের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি মূল সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। SUDA-কেও সরকারি নিয়মমতো নিবন্ধভুক্ত হতে হবে। SUDA-র দায়দায়িত্ব বা কাজকর্ম হবে নিম্নরূপ—

— রাজ্যের শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত কৌশলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজ্যের সমস্ত শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি ও নীতিনির্ধারণ করা।

— শহর এবং জেলাগুলিকে প্রায়োগিক সাহায্য (technical support) দেওয়া যাতে অংশভাগীতার প্রথা এবং পরিবর্তনের লক্ষ্য পূরণ করা যায়।

— কর্মকাণ্ডগুলির অগ্রগতির তদারকি করা।

— রাজ্যের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা, প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা, সতর্ককরণ (monitoring) করা।

— আন্তঃশহর পরিদর্শনের উপযোগী পরিল্পনা এবং সমন্বয় সাধন করা।

— অতীতের সাফল্য এবং প্রকৃত চাহিদার কথা মাথায় রেখে সম্পদ সংগ্রহ এবং তা বরাদ্দকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

— মাঝে মাঝে কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান ও পথ প্রদর্শন করা।

— ভারত সরকারের শহরী নিয়োগ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগের কাছে নিয়মমত রিপোর্ট পাঠানো।

১২.৩. প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা

দেশের এক বড়ো সংখ্যক যুবক যুবতী কর্মহীন। এই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ কর্মহীন যুবক যুবতীদের জন্য উপরিউক্ত প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে যাতে তারা স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। এই প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের সহায়তা রয়েছে। প্রকল্পটি রূপায়িত হয় জেলা শিল্প কেন্দ্র (D. I. C.), রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ, পঞ্চায়েৎ সমিতি ও পৌরসভার মাধ্যমে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত উদ্যোগীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হল ঃ

— অন্তত অষ্টম মানের শিক্ষা থাকতে হবে।

— বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে।

— তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীদের ক্ষেত্রে বয়সকাল ১৮ থেকে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত।

— পরিবারের বাৎসরিক আয় হবে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে।

— বর্তমান ঠিকানায় অন্তত তিন বছর একাদিক্রমে বসবাস করতে হবে। বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী বা শ্বশুরকে একাদিক্রমে অন্তত তিন বছর ওই এলাকায় বসবাস করতে হবে।

— সরকার অনুমোদিত কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্তত ছয় মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করলে বা সরকারি অন্য কোনো প্রকল্পে ভরতুকি পেয়ে থাকলে সেই ব্যক্তি এই প্রকল্প থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোনো উদ্যোগ শুরু করার জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যাবসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা।

(খ) শিল্প ও পরিসেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুইপক্ষ টাকা।

(গ) যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫ থেকে ১৬.২৫ শতাংশ অর্থ আবেদনকারীকে বিনিয়োগ করতে হবে। বাকি অর্থ প্রকল্প থেকে পাওয়া যাবে। প্রকল্প থেকে দেয় অর্থের ১৫ শতাংশ বা ৭৫০০ টাকা এর মধ্যে যেটি কম সেই পরিমাণ অর্থ ভরতুকি হিসাবে পাওয়া যাবে। বাকি অর্থ পাওয়া যাবে ঋণ হিসাবে। এই প্রকল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো প্রকার বন্ধক নিতে পারবে না।

ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ তিন থেকে সাত বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়মানুসারে নির্ধারিত হবে। দুই লক্ষ টাকার বেশি ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে। ঋণ গ্রহণের আগে আবেদনকারীকে অবশ্যই ব্যক্তি উদ্যোগ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রকল্পের অধীন উদ্যোগগুলি হবে নিম্নোক্ত চার প্রকারের— উৎপাদন, মেরামতি, পরিসেবামূলক এবং ক্রয়বিক্রয়মূলক।

১২.৪. প্রশ্নাবলি

১। স্বর্ণজয়ন্তী শহুরী রোজগার যোজনার উদ্দেশ্য ও মুখ্য বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। শহর এলাকার মহিলা ও শিশু বিকাশের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির সারাংশ লিখুন। এগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠকের ভূমিকা কী?

৩। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার সুবিধা পেতে গেলে কী কী ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজন?

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

একক—১৩ ❑ শহুরে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ

গঠন

১৩.১ প্রকৃতি
১৩.২ নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ
১৩.৩ উৎপত্তি
১৩.৪ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা
১৩.৫ ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের গুরুত্ব
১৩.৬ অনুক্রম এবং মধ্যস্থতা
১৩.৭ বিশেষ সমস্যা
১৩.৮ প্রশ্নাবলি

১৩.১ প্রকৃতি

নিয়ম-বহিভূত বিভাগ (Informal Sector) যেন একটি বিরোধালংকার (Oxymoron)-এক দিকে এই বিভাগ একটি 'অসংগঠিত উৎপাত' (Unorganised nuisance) বিভাগ— উদাহরণস্বরূপ এই বিভাগের সদস্যরা কোনো রকম কর (Tax) দেয় না; আবার অন্য দিকে এই বিভাগ চাকরির সংস্থান করে এবং শহরের সবচেয়ে অসুরক্ষিত (সবচেয়ে নিম্ন আয়ের দল) মানুষদের আয়ের পরিমাণ বাড়ায়। তার ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে— এখানে কাজের পদ্ধতি কেমন হবে? কারা বা কে ওই কাজগুলো করবে? নিয়মসিদ্ধ বিভাগের সঙ্গে এই বিভাগের সংযোগ কোথায়? এই প্রশ্নগুলির কোনো সহজ উত্তর নেই।

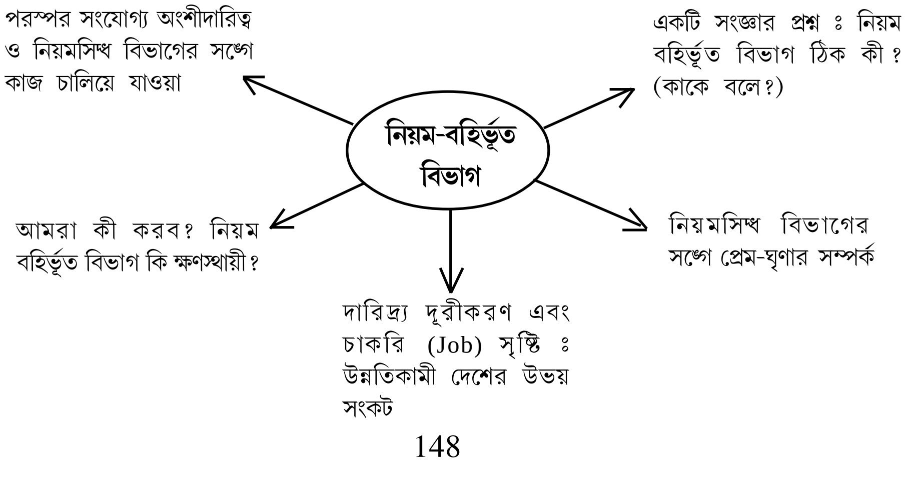

এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ ১৯৯৩ সালের জাতীয় হিসাবের পদ্ধতি (System of National Accounts-SNA) অনুসারে একটি লাভজনক প্রাতিষ্ঠানিক একক। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি—

(ক) একটি নিম্নস্তরের সংগঠন,

(খ) শ্রম এবং মূলধনের মধ্যে কোনো বিভাগ নেই; এবং

(গ) শ্রমিক সম্পর্ক অনিয়মিত নিয়োগের ওপর নির্ভরশীল এবং সমাজিক সম্পর্ক নিয়মসিদ্ধ চুক্তির বিরুদ্ধে।

ভারতীয় জাতীয় হিসাবের রাশিবিজ্ঞানে (INAS — Indian National Accounts Statistics) মোট অর্থনীতির প্রত্যেকটি শিল্পের (অর্থনৈতিক কাজকর্ম) সংগঠিত এবং অসংগঠিত অংশের আয়ের যোগফল বোঝায়। বর্তমানে অসংগঠিত অংশের নানান অর্থনৈতিক কাজকর্মের যে প্রচলিত রীতি চলছে (গার্হস্থ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেগুলির বিষয় নীচে বর্ণনা দেওয়া হল।

(১) **কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় কাজকর্ম (Agriculture and Allied Activities) ঃ** ভারতবর্ষে কৃষি কাজ এবং কৃষি সম্বন্ধীয় কাজ প্রধানত অসংঘটিত, এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগগুলির মতো। কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় কাজগুলি বলতে সবরকম কৃষিজাত উৎপাদনকেই বোঝায়, যেমন— গৃহপালিত পশুপালন, মুরগি ইত্যাদি পালন, গৃহপালিত পশু-জাত দ্রব্য, সেচের কাজ ইত্যাদি। সরকারি সেচ পদ্ধতির কাজ ছাড়া আবাদি ফসল— চা, কফি ইত্যাদি ছাড়া বেশির ভাগ চাষের কাজ গার্হস্থ্য বিভাগে পড়ে।

(২) **বনাঞ্চল সংরক্ষণ বিদ্যা (Forestry) ঃ** বনাঞ্চল সংরক্ষণ বিদ্যার অধীনে সমস্ত প্রধান অরণ্যজাত জিনিসগুলি পড়ে; যেমন শিল্পের প্রয়োজনে কাঠ এবং জ্বালানি কাঠ এবং অরণ্যে উৎপাদিত অনেকরকম (বৃহৎ পরিমাণে) জিনিসও আছে যেমন, বাঁশ, পশু-খাদ্য, গালা, চন্দনকাঠ, মধু, ধুনো, গঁদ, (tendu) বিড়ি পাতা প্রভৃতি। জালানি কাঠ এবং অনেক ছোটো ছোটো বনজ দ্রব্য যার বেশির ভাগই গৃহস্থ লোকেরা জোগাড় করে বিনামূল্যে, অথবা ওইসব জিনিস সংগ্রহের জন্য 'Licence fee' দিয়ে। অতএব এসব কাজই অসংঘটিত বিভাগের অধীনে পড়ে। যেহেতু এই গৃহস্থ লোকেরা নিজেদের উদ্যোগেই এসব কাজ করে থাকে।

(৩) **খনির কাজ ও পাথরের খাদে কাজ (Mining and Quarrying) ঃ** এই ব্যাপারে সব কাজের মোটামুটি হিসাব আলাদা ভাবে ছোটো বড়ো সব খনিজ দ্রব্যের মধ্যেই পড়ে। এই অসংগঠিত বিভাগের কাজকর্ম ছোটোখাটো খনিজ পর্যায়ও পাথরের খাদের কাজের সঙ্গে জড়িত।

(৪) **শিল্পদ্রব্য তৈরি (Manufacturing) ঃ** গৃহজাত শিল্প দ্রব্যে মোটামুটি হিসাব করার উদ্দেশ্য সব 'Manufacturing'-র কাজকর্ম দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়— সুসংঘটিত এবং অসংগঠিত। Indian National Accounts Statistics-এ এই অসংগঠিত শিল্প দ্রব্য তৈরি বিভাগ শিল্প দ্রব্য তৈরির অসংঘটিত উপাদানের কথাই উপস্থাপিত করে। তালিকাভুক্ত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য, পাট, আসবাবপত্র, ধাতুর তৈরি জিনিস (metal products), Capital goods-এর মেরামতি কাজ প্রভৃতি।

(৫) **নির্মাণ (Construction) ঃ** নির্মাণের কার্যাবলির মধ্যে আছে সেই কাজ যা শ্রমিককেন্দ্রিক। যেমন— জমির উন্নয়ন, আবাদ করা, স্বগৃহবাসীদের প্রাকৃতিক জিনিসপত্র (যেমন বাঁশ, পাতা ইত্যাদি যেগুলি বিনামূল্যে সংগ্রহ করা) দিয়ে বাড়িঘর তৈরি। নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ দেখে, অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রাথমিক উপকরণ, যেগুলি নির্মাণের কাজে লাগবে তার প্রাপ্যতার ব্যাপারটি বিবেচ্য।

(৬) **বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জল সরবরাহ (Electricity, Gas and Water Supply) ঃ** অসংগঠিত বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে আর যে কাজগুলি পড়ে তার মধ্যে আছে জল সরবরাহের কাজ। এই কাজ প্রথমত ভারী (Water fetcher) বাহিত জল-সরবরাহ, এই জলের উৎস পাতকুয়া নয়তো হাতে চালানো পাম্পের সাহায্যে তোলা জল। এই জলসরবরাহের জন্য যারা এই পরিসেবায় তারা জল-বাহকদের কিছু পারিশ্রমিক দেয়। এই অসংগঠিত অংশের

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

আর একটি কাজ গোবর গ্যাসের কাজ। এই কাজ গৃহস্থরা তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেই করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গোবর (cowdung) গ্যাস বিক্রির সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(৭) **ব্যবসায়, পান্থনিবাস, সাধারণ ভোজনালয় (Trade, Hotels, Restaurants) ঃ** Trade, Hotels এবং Restaurants-গুলির কাজ দু-ভাবেই হয়ে থাকে— সংগঠিত ও অসংগঠিত। যে উদ্যোগগুলি কাজ করে নিজস্ব মূলধনের সেগুলি সংখ্যায় অনেক এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর।

(৮) **অন্যান্য কাজ কর্ম (Other Seruices) ঃ** অন্যান্য সব কাজের মধ্যে আছে— শিক্ষা পরিসেবা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের পরিসেবা, ধর্মীয় ও অন্যসব সমাজ উন্নয়ন পরিসেবা, ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিসেবা— গৃহস্থের কাপড় কাচার কাজ, জল ব্যবহার না করে কাপড় কাচার কাজ, নাপিতের কাজ, তা ছাড়া নানান আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের কাজ।

এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগে আর সে সব কাজ আছে তাদের কাজের পরিধি খুবই বিস্তৃত— এই কাজ 'labour market' সংক্রান্ত। এখানে ভিন্ন প্রকৃতির দুটির দল আছে। একদিকে এই 'informal sector' (নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ) গঠিত হয় ব্যক্তিসাধারণের এবং পরিবারগুলির সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে। এই সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অর্থনৈতিক পরিবেশ, যেখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ নেই বললেই চলে। অন্যদিকে এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা তৈরি করে এবং ওই ব্যবসায়ীরা (ঝুঁকি নিয়ে) রাজ্যে বিধি নিয়ম এড়িয়ে চলতে চায়।

এই দুই ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কাজকর্ম বর্ণনা করা যায় ২ ভাবে ঃ

(১) **সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা (Coping Strategies) (survival activities) ঃ** অনিয়মিত কাজ, অস্থায়ী কাজ, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ, জীবিকা হিসাবে চাষবাসের কাজ বা ভরণপোষণের জন্য চাষের কাজ একই সঙ্গে নানান কাজ।

(২) **বেসরকারি অর্থ উপার্জনের পন্থা (ব্যবসায় অবৈধতা) —**

(ক) **বেসরকারি ব্যবসার কাজকর্ম (Unofficial business activities) ঃ** কর না দেওয়া (Tax evasion) শ্রমনীতি বা অন্য সব সরকারি বা প্রতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন এড়িয়ে চলা, Company-কে তালিকাভুক্ত না করা।

(খ) **অপরাধ জগতের কাজকর্ম (Underground activities) ঃ** অপরাধ, দুর্নীতি— যে কাজকর্ম পরিসংখ্যানে তালিকাভুক্ত নয়।

নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত কাজ করে— চাকরি জোগান দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওইসব চাকরিগুলি নিম্ন আয়ের এবং চাকরির নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। এই 'informal sector' যে সমস্ত ব্যবসায়ী লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করে তাদের কাজে উৎসাহিত করে, কিন্তু এসবই তারা করে সরকারি অনুশাসনের ক্ষতি করে, বিশেষ করে কর ও শ্রম আইনের ক্ষেত্রে।

নিয়ম-বহির্ভূত শ্রম-বাজারের আয়তনের পরিবর্তন হয়। উচ্চ-আয়ের দেশে মোটামুটি হিসাবের (৪—৬)% থেকে ৫০% নিম্ন আয়ের দেশে মধ্যে। অর্থনৈতিক মন্দার সময় এর আয়তন এবং কাজ (অর্থনীতির ক্ষেত্রে) বৃদ্ধি পায় অর্থনীতির নির্ধারণ ও পরিবর্তনের সময়।

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (International Labour Organisation- ILO) তার কেনিয়া মিশন রিপোর্টে (Kenya Mission Report), আন্তর্জাতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে informal sector-এর ধারার পরিচিতি নিয়ে আসে। এই নিয়ম-বহির্ভূততাকে (informality) একটি 'কাজের ধরন' বলা হয়, যার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন ঃ (ক) শুরু করা সহজ; (খ) দেশীয় সম্পদের ওপর নির্ভরতা; (গ) পরিবারের মালিকানা; (ঘ) ক্ষুদ্র শিল্পের ধরনে কাজ; (ঙ) শ্রমিকদের প্রাধান্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার, (চ) নিয়মসিদ্ধ বিভাগের বহির্ভূত দক্ষতার প্রয়োজন; (ছ) অনিয়ন্ত্রিত এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এর শুরু থেকেই এই 'কাজের ধরনের' জন্য ILO স্বয়ং এবং বিভিন্ন লেখক নানান সংজ্ঞা

(definition) দিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে 'informal sector'-এর ওপর ILO/ICFTU-র যে আন্তর্জাতিক 'symposium' হয় সেখানে একটি প্রস্তাবে অনিয়মিত বিভাগের কর্মীদের তিনটি বড়ো শ্রেণিতে বিভক্ত করার কথা বলা হয়।

(ক) ছোটো উদ্যোগের মালিক নিজেই কর্মীনিয়োগকারী, এখানে শ্রমিকদের কোনো সময় শিক্ষানবিশ থাকে কোনো সময় থাকে না।

(খ) মালিক নিজেই নিজের উদ্যোগের কর্মী; এটাকে বলা যায় 'One-persen business', যেখানে মালিক একাই কাজ করেন অথবা বিনাপারিশ্রমিকে সাহায্য পেয়ে থাকেন, এই শ্রমিকরা সাধারণত পরিবারের সদস্য বা শিক্ষানবিশ।

(গ) আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে মালিকেরা অধীনস্থ বা আশ্রিত কিছু ব্যক্তি শ্রমিকের কাজ করে; এরা কখনও পারিশ্রমিক পায় কখনও পায় না। এক্ষেত্রেও শ্রমিকরা ছোটো উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত— যেখানে মালিকের পরিবারের লোকেরা ও শিক্ষানবিশ বিনা মজুরিতে কাজ করে। এ ছাড়া কিছু চুক্তিবন্ধ শ্রমিক থাকে এবং বাড়িতে যারা কাজ করে অর্থাৎ 'domestic help' থাকে যারা পারিশ্রমিক পায়।

১৩.২ নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

(১) নিয়োগ (Employment) মূলধন (Capital) ঃ

নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the people engaged in the informal sector) ঃ

(১) সরকারি নিরাপত্তা ও স্বীকৃতির অভাব,

(২) ন্যূনতম মজুরি-আইনের সুরক্ষা নেই এবং সেই সঙ্গে নেই সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) নিজস্ব হিসাবনিকাশ এবং স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা।

(৪) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অভাব।

(৫) নিম্ন আয় এবং নিম্ন মজুরি।

(৬) চাকরির নিরাপত্তা খুব কম।

(৭) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা নেই।

(২) উদ্যোগ বা ব্যবস্থা (Enterprise) ঃ

নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কাজের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) অনিয়মিত এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

(২) ব্যক্তিগত বা পরিবারের মালিকানায় ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ।

(৩) এখানে কাজে প্রবেশ করা সহজ।

(৪) স্থানীয় প্রাপ্য সম্পদের ওপর নির্ভরতা।

(৫) ব্যবসার পারিবারিক মালিকানা।

(৬) শ্রমিকদের প্রাধান্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

(৭) প্রাতিষ্ঠানিক বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ঋণ শোধ করার আর্থিক সাহায্যের অভাব, অথবা অন্য সাহায্য বা সুরক্ষার অভাব।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

(৩) বাসস্থান (Habitat) ঃ নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের জমি ও ঘরবাড়ির বিশেষত্ব (Characteristics of the informal sector land and housing) ঃ

(১) অনুন্নত সরকারি বা বেসরকারি জমির ব্যবহার।

(২) বে-আইনী ভাবে জমির ভাড়া বা খাজনা ভাগ।

(৩) অনুন্নত বাড়ি-ঘর ইত্যাদির নির্মাণ।

(৪) এলাকায় প্রাপ্ত নিম্নমূল্যের বাতিল জিনিস দিয়ে নির্মাণের কাজ চালানোর ওপর নির্ভরশীলতা।

(৫) সীমাবদ্ধ মান এবং নিয়মবিধির সভাব।

(৬) নির্মানের ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রম এবং কারিগরি কলাকৌশলের ওপর নির্ভরতা।

(৭) বন্ধক ও অন্য কোনো অনুমানিক অর্থের অপ্রাপ্যতা।

(৪) ঋণ পরিশোধের অর্থ (Credit) নিয়ম-বহির্ভূত ঋণশোধ যোগ্য অর্থের বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of informal credit market)

(১) অনিয়ন্ত্রিত ও অনুদানহীন।

(২) সহজলভ্য।

(৩) ছোটো মাপের ও অল্পসময়ের জন্য প্রাপ্যতা।

(৪) প্রশাসনিক ও কার্যপ্রণালীর কম খরচ।

(৫) সমর্থনকারীর প্রয়োজন খুব অল্প বা একেবারেই নেই।

(৬) সুদের হার নমনীয় (কোথাও খুব বেশি সুদ দিতে হয় কোথাও একেবারই সুদ দিতে হয় না)।

(৭) কাজ কর্মের ধরন অত্যন্ত নমনীয় এবং (সুদ) পরিশোধের ব্যাপার ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী।

১৩.৩ উৎপত্তি

যুদ্ধোত্তর সময়ে সবগুলি Demographic phenomena-র মধ্যে বিকাশশীল দেশগুলিতে দ্রুত নগরায়ণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটি (নগরায়ণ) আরও বৃহত্তর আকারে প্রতীয়মান হবে। United Nations-এর হিসাবে নগরের এই দ্রুত বৃদ্ধি ২০০০ সালে 2.1 billion বা 66%। পৃথিবীর শহরবাসীদের ক্ষেত্রে এই শহরবাসীরা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জায়গায় বাস করবে।

এই অভূতপূর্ব আয়তনের শহুরে জমায়েত (মানুষের) প্রসঙ্গে একটি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসে যে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলি এত মানুষের সমাবেশ কীভাবে সাফলতার সঙ্গে মানিয়ে নেবে? এই মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন উঠছে সর্বক্ষেত্রে— অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে। একথা সত্যি যে এই কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি কিছু মূল্য-হ্রাসের সুযোগ দেয় এবং 'Economics of scale and proximities এবং সেই সঙ্গে অন্য অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিকের বাহ্যিক সুবিধা আছে, উদাহরণস্বরূপ নগর জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু সুযোগ সুবিধা, যেমন— দক্ষ কর্মী, সস্তা পরিবহন, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা, উন্নত আবাসন এবং সামাজিক পরিবেশের অতিরিক্ত ভারের জন্য সামাজিক মূল্য দিতে হয়। তবে (নগর জীবনের) অপরাধ প্রবণতার আধিক্য, দূষণ এবং অতিরিক্ত ভিড় শহরের উপরে উল্লিখিত ঐতিহাসিক সুযোগ সুবিধাগুলির গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস করে দিতে চায় ক্রমে ক্রমে।

দ্রুত নগরায়ণের প্রসারের সঙ্গে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শহরে প্রবণতার সঙ্গে এসেছে প্রচুর অনুন্নত এলাকার (বস্তি) বৃদ্ধি। কলকাতার বস্তিগুলির এই অস্থায়ী সম্প্রদায়গুলি প্রতি ৫ বছর থেকে ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে এই বস্তি কলোনিগুলি শহুরে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে উপস্থাপন করে। সমস্ত বিকাশশীল

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ MSW-10B \ MSW10B-2 P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

দেশগুলিতে; অনেক ক্ষেত্রে এই হিসাব মোট শহুরে জনসংখ্যার ৬০%। বেশির ভাগ বস্তি-কলোনিতে পরিস্রুত জল নেই। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ নেই।

যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান হারে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার প্রবণতা শহরে অনুন্নত এলাকা (বস্তি) প্রসারণের জন্য প্রধানত দায়ী, তবুও এর কিছুটা দায় কম উন্নত দেশের সরকারের উপর বর্তায়। সরকারের শহুরে পরিকল্পনা ও গৃহনির্মাণের সেকেলে বা অপ্রচলিত পদ্ধতির ভুল কার্যধারা অনেক সময় নতুন শহুরে গৃহব্যবস্থার ৮০% থেকে ৯০% বেআইনী বলে প্রমাণিত।

বিকাশশীল দেশগুলির দ্রুত শহর-উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিস্তৃত অসন্তোষ থেকে গেছে। এই জটিল ব্যাপারটিকে জাতীয় স্তরের সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা দরকার। তবেই উন্নয়ন কার্যধারার একটি সুনিশ্চিত প্রভাব শহুরে বিভাগের ক্ষেত্রে পড়তে পারে। কেননা জাতীয় সরকার তখন উন্নয়নের কার্যধারার একটি পদ্ধতি তৈরি করতে পারবেন। এ কথা পরিষ্কার যে গত কয়েক দশক ধরে প্রশ্নাতীত ভাবে প্রাচীন পন্থীর উন্নয়ন পদ্ধতিকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চলে ছিল। এর সঙ্গে ছিল তাদের শিল্পায়ন। আধুনিকীকরণে ভ্রান্ত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শহরের বিকাশের ওপর জোর, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে এগুলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে; এ ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে গ্রাম থেকে গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান চলে আসার উপরও উপরে উল্লিখিত কারণগুলির তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আছে। কয়েকটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে জন্ম হার কমে যাওয়ার শুরু থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক সমস্যা দ্রুত শহুরে বিকাশ এবং ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ ও শহুরে migration এবং এর সঙ্গে নিঃসন্দেহে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এবং demographic বিচার্য্য বিষয়— একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এগুলি দেখা যাবে। শহরাঞ্চলের মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের বিকাশ এবং উন্নয়ন সেই সঙ্গে তার শ্রমিক নিয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সন্ধান অধিকার করবে। এই সব অসংগঠিত, অনিয়মিত এবং বেশির ভাগই আইনসংগত, (কিন্তু তালিকাভুক্ত নয়)। নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগগুলি ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে স্বীকৃতি পায়। এর কারণ— অনেক উন্নয়নশীল দেশে এই যে বিরাট অংশের শ্রমশক্তি যোগ হচ্ছে সেটা নিয়মসিদ্ধ আধুনিক বিভাগের বেকারির (unemployment) পরিসংখ্যানে দেখানো যায় নি। শহুরে শ্রমিক-শক্তির, নতুন যোগদানকারীর একটা বিরাট অংশ মনে হয় তারা নিজেরাই নিজের কর্মসংস্থান করে নেয় বা ছোটো পারিবারের উদ্যোগে (ব্যবসায়) কাজ করে। আবার যারা স্বনিযুক্তি কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখে তারা নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে। তাদের এই কাজকর্ম ফেরিওয়ালার কাছ থেকে রাস্তায় বসে জিনিস বিক্রি, ছুরিতে ধার দেওয়া, পুরানো আতসবাজি সংগ্রহ করে বিক্রি করা, নীচ বৃত্তির কাজ (prostitution), অবিক্রয় পণ্য দ্রব্যের (drugs) কারবার করা, এবং সাপের খেলা দেখানোর (Snake charming) কাজ পর্যন্ত থাকে। অন্যেরা কেউ কেউ মিস্ত্রি বা ছুতোর বা ছোটোছোটো কারুশিল্পের কাজ করে, আবার কেউ কেউ নাপিতের কাজ বা গৃহ-ভৃত্যের কাজও করে। আরও কেউ কেউ অন্যসব কর্মচারীদের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে উচ্চ আয়করে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মসিদ্ধ বিভাগে এমন কর্মীও থাকে যারা আইনসংগত ভাবে তালিকাভুক্ত এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সরকারি শ্রমিক আইনের শর্তাধীন থাকে। উন্নতিকামী দেশগুলিতে শহরাঞ্চলে নজিরবিহীন জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির সঙ্গে (আশা করা হয় এই অবস্থা চলবে) গ্রামীণ ও শহুরে বিভাগে বাড়তি শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগাবার ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতাও আছে। তাই নিয়ম- বহির্ভূত বিভাগের নির্দিষ্ট কাজের দিকে আরো বেশি নম্বর দেওয়া হচ্ছে, যাতে ক্রমবর্ধমান বেকারি (Unemployment) সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বব্যাধিনিরোধকের কাজ করতে পারে।

১৯৭১ সালে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের ধারণাকে সর্বপ্রথম কাজে লাগান K. Hart. যাইহোক কেউ কেউ দাবি করেন এই বিভাগের ধারণাটি বাস্তবিক ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল আগেকার 'Unorganised sector'-এর ধারণার ওপর।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

যে ধারণা ছোটো মাপের উৎপাদন units-এর কথা বলে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে 'হাতের কাজ'— যেগুলির একটা গার্হস্থ্য অসংগঠিত চরিত্র আছে এবং এটা অর্থনীতির 'non-monetory' sector-এর অংশ হতে পারে। Bromley (1978) আবার যেমন দাবি করেন যে এটা একই ভাবে দেখা যায় 'as a spin-off of the dual economy literature, originating with lewis (1954) and Hirschmann (1958), যেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা গড়ে তোলে— 'as the emergence and growth of manufacturing sector ('আধুনিক বিভাগ') এরই মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগপর্ব স্বাধীন হয় কৃষিকার্জের (traditional sector) থেকে, কারণ উৎপাদনে আরও বেশি উপায় হচ্ছে কৃষকরা। যেখানে দ্বৈত অর্থনীতির (the modern traditional dichotomy) লিখিত বিষয়গুলি বিভাগীয় পার্থক্যের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য। যাইহোক পরের দিকে প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিত বিষয়গুলি বিভাগগুলির সংগঠনের ওপর বেশি জোর দিয়েছে (Sethuraman 1976)।

১৩.৪ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ অনেক শ্রমিকের আয় চালু রাখার সুযোগের জায়গা। ভারতবর্ষে, বিকল্পক্ষেত্রে, শ্রমিকদের একটা বিরাট বিস্তৃতি আছে, এই শ্রমিককুল নিয়মবহির্ভূত বিভাগ থেকে জীবিকানির্বাহের উপায় পেয়ে থাকে। আইনকে কার্যকরি করা এবং অন্য যেসমস্ত উপায় আছে শ্রমিকদের একটা নিয়মের অধীনে আনার এবং সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সেসব ব্যবস্থা আছে। এগুলি নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের বর্তমানে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিগুলিকে বিরুদ্ধভাবে প্রভাবিত করবে। এই বিরুদ্ধভাব বাজারে অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করে marketed অর্থনীতির অপ্রতিহত কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া এখানে বিরাট ভাবে পরিকাঠামোগত এবং প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দরকার। যে ব্যবস্থা আর্থিক ব্যবস্থাকেও এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে যা সমস্ত পৃথিবীর অবস্থাকে (situation) কে বদলে দেবে এবং যেটা সরকারের ধারণা ক্ষমতার বাইরে। সরকারকে এসব ক্ষেত্রে একজন সুবিধা সৃষ্টিকারী (facilitator) এবং নতুন নতুন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠনে (অর্থ সাহায্য দিয়ে) অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। যাতে নিয়ম বহির্ভূত বিভাগে কর্মরত শ্রমিকরা তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পেতে সমর্থ হয়। এই সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা তাদের মধ্যে একটি সুন্দর কর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে যাতে শ্রমিকরা তাদের আয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে নিজেদের দক্ষতা সম্পূর্ণ ভাবে (কর্মক্ষেত্রে) প্রকাশ করতে পারে।

১৩.৫ ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের গুরুত্ব

১৯৯৯-২০০০ সালের NSS পরিদর্শন (এর report) অনুসারে একটি দেশের প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন শ্রমিক মোট শ্রম-শক্তি ৯২% গঠন করে। এই শ্রমিকদল নিয়ম বহির্ভূত বিভাগে কাজ করে। তাই এটাই প্রমাণ করে যে এই অনিয়মিত বিভাগ কর্মশক্তির একটা বিরাট অংশের কর্ম সংস্থানের সুযোগসুবিধার জোগান দিয়ে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর আদান তাৎপর্যপূর্ণ। এই অসংঘটিত বিভাগের আদান মোট গার্হস্থ্য বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এবং মোট NDF-তে এর অংশ (বর্তমান মূল্যে) ৬০%-এ বেশি সঞ্চয়ের ব্যাপারে পারিবারিক বিভাগে total gross গার্হস্থ্য সঞ্চয় (প্রধানত অসংগঠিত বিভাগে) প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। এই ভাবে আমাদের অর্থনীতিতে অসংগঠিত বিভাগের একটা অত্যন্ত প্রামাণিক কার্যধারা আছে— এই কার্যধারার মধ্যে পড়ে— কর্মসংস্থান এবং NDP-তে তার অবদান, সঞ্চয় এবং মূলধন গঠন। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতি সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে, সেই সঙ্গে আছে উদারনীতির অনুসরণ। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে— বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্র হওয়া, শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একত্র হওয়া এবং প্রযুক্তির মান উন্নয়ন এবং আরও নতুন নতুন

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ MSW-10B \ MSW10B-2 P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

পন্থার প্রবর্তন। এ সবই হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতার জন্য। এই নতুন নতুন পন্থা নেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে উৎাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনমূল্য এবং অন্য সব গুণাগুণ মানের প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য। এর ফলে অদক্ষ সংস্থাগুলি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে বা অন্য অনেক সংস্থার সঙ্গে মিলে গিয়ে ভাল কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ দরকার আছে; এরজন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের দরকার, দরকার শ্রমিকদের দক্ষতার মান বাড়ানো। আরও নানা উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে শ্রমিকরা কর্মসংস্থানের নতুন রাস্তা খুঁজে পেতে পারে। তারা যেন তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্রে উপাদানশীলতা বাড়াতে পারে। এসবই প্রয়োজন তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা (গুণমান এবং উৎপাদন-মূল্য-দুটি ক্ষেত্রেই) বাড়াতে। এই সবের সাহায্যে শ্রমিকরা তাদের আয় বাড়াতে পারবে এবং সেই সঙ্গে তাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদারও উন্নতি হতে পারবে। অভিজ্ঞতা থেকে এটা বোঝা গেছে যে নিয়মসিদ্ধ বিভাগ দেশের মধ্যে শ্রমিকদের কাজে লাগাতে যে উপযুক্ত সুযোগসুবিধা দরকার তার জোগান দিতে পারেনি। কিন্তু নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ শ্রমিকদের বেঁচেথাকার জন্য জীবিকার সংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান করছে। এই সমস্ত কথা মনে রেখে বোঝা যাচ্ছে বর্তমানের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে, নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ আরও অনেকটা প্রসারিত হবে, — আগামী বছরগুলিতে। সেই কারণে এই বিভাগগুলিকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। তার ফলেই এই বিভাগ কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে যেতে পারবে।

১৩.৬ অনুক্রম এবং মধ্যস্থতা

অনেকগুলি অনুক্রম, মধ্যস্থতা ও ‘model’ আছে, এগুলি সবই শ্রমিকদের (অসংঘটিত বিভাগের) সামাজিক নিরাপত্তা দেবার জন্য। সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

- কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যে সামাজিক সহায়তার অনুক্রম।
- সামাজিক বিমা প্রকল্প।
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ বিভাগের অর্থে সামাজিক সহায়তা।
- জনসাধারণের নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যে সামাজিক সহায়তার অনুক্রমে আছে কর্মমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণের অনুক্রম। যেমন— স্বর্ণজয়ন্তী শ্রম স্বরোজগার যোজনা, জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা, কর্মসংস্থানের আশ্বাস প্রকল্প। জাতীয় সামাজিক সহায়তা অনুক্রমের (NSAP) মধ্যে আছে বার্ধক্য ভাতা, পারিবারিক সুবিধা এবং মাতৃত্বের সুবিধা ও দারিদ্র্যসীমার নীচের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার অনেকগুলি প্রকল্প চালু করেছেন সামাজিক বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে। এগুলি সব সমাজের দুর্বল শ্রেণির সুবিধার জন্য, এবং এগুলি কার্যকরী হয় Life Insurance Corporation of India এবং General Insurance-এর সহায়তায়। যারা দোকানে কাজ করে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং এ ছাড়া অন্য সব দুর্বল শ্রেণির জন্যও প্রকল্প আছে। Janshree Bima Yojana একটি group Insurance প্রকল্প— যে প্রকল্পে স্বাভাবিক বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু cover করে। আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থায়ী অক্ষম (দুর্ঘটনা জনিত) ব্যক্তিরা বা দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষ এবং marginally above লোকেরা সবাই এই প্রকল্পে যোগ দেবার জন্য যোগ্য। আর এক দলগত বিমা প্রকল্প আছে— ভূমিহীন চাষীদের জন্য। কৃষি শ্রমিক সুরক্ষা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০০১ (Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana - 2001) — এটা চালু হয় ২০০১ সালের জুলাই মাসে, এই যোজনা ভাতা এবং বিমা দুটোই যোগান দেয়। তাছাড়া এখানে ‘money-back’ ব্যবস্থাও আছে। যেখানে দানগ্রাহীর (সংস্থার) অবদান দিতে এক টাকা (১.০০), সেখানে সরকারের অবদান দিনে দু’টাকা

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

(২.০০)।

অনেকগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা আছে যেগুলি নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা দেয়— কতকগুলি বিশেষ শ্রমিক গোষ্ঠীকে। এদের মধ্যে Self Women's Association (SEWA) সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে সমবায় সমিতি গঠন করে।

এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য যে জনকল্যাণ অর্থভাণ্ডার ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে সেটিকে একটি আদর্শ (model) বলা চলে। ভারত সরকার পাঁচটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারটি (fund) শ্রমমন্ত্রকের দ্বারা চালিত হবে। এই ভাণ্ডারটি প্রধানত বিড়ি-শ্রমিক এবং অন্যান্য কয়েকটি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য কাজ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো সোজাসুজি মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক নেই। এখানকার fund-এর জন্য যে টাকা কাজে লাগানো হয় তাতে সরকারের কোনো অবদান নেই। এই কল্যাণ প্রকল্পে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের কোনো কাঠামো নেই অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক নেই। এবং এই fund-এর জন্য যে টাকা সরকার সংগ্রহ করেন তাতে সরকারের কোনো অবদান নেই। এটি (non-contributory)। এই কল্যাণ পরিসেবা, যেটা শ্রমিকদের দেওয়া হয়, তার সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষ কোনো শ্রমিকের অবদানের কোনো যোগাযোগ নেই। এই fund তৈরি হয় কর (Tax) সংগ্রহের টাকায়। যে কর সংগ্রহ হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক এবং প্রস্তুতকারক। উৎপাদকের কাছ থেকে অথবা কোনো বিশেষ দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য হয় সেই করের সংগৃহিত অর্থে।

বাড়ি-ঘর তৈরি এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সরকার একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রবর্তন করেছেন, এর কাজ রাজ্যস্তরে কল্যাণমূলক fund তৈরি করা। দেশে প্রায় ২০ মিলিয়ান নির্মাণ-শ্রমিক আছে। নির্মাণ কাজের খরচের অর্থ থেকে কিছু কর সংগৃহিত হয়। ওই সংগৃহিত অর্থই নির্মাণ-শ্রমিকদের কল্যাণ ভাণ্ডারের 'Corpus' তৈরি করে। এই সব সুবিধাগুলি, যেগুলির কথা বিশদভাবে বলা হল সেগুলি সবই অসংঘটিত বিভাগের কর্মীদের জন্য। এই আইনের অধীনে বর্তমানে এই দেশে তিনটি রাজ্য— কেরালা, তামিলনাড়ু এবং দিল্লি এই প্রকল্পগুলি কাজে লাগাতে শুরু করেছে। অন্য রাজ্যগুলিও এই পদ্ধতি কাজে লাগানোর পথে এগিয়ে চলেছে।

এ সব ছাড়া নানা রাজ্য নানা শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য জনকল্যাণ ভাণ্ডারের আদর্শ কাজে লাগাচ্ছেন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। তামিলনাড়ু রাজ্য শ্রমিকদের জন্য ১১টি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি চালাচ্ছেন। এই শ্রমিকদের মধ্যে আছে— নির্মাণ শ্রমিক, ট্রাক-চালক, জুতো তৈরির শ্রমিক, হস্তচালিত তাঁত ও সিল্ক তৈরির শ্রমিক। একইভাবে কেরালা রাজ্যেও নানা শ্রমিক কল্যাণ ভাণ্ডার চালাচ্ছে— এইগুলি হল কৃষিকাজের শ্রমিক, কাজুবাদাম সংগ্রহের শ্রমিক, নারকেল ছোবড়ার কাজের শ্রমিক, জেলে ও তাল-রস সংগ্রহের শ্রমিক প্রভৃতি। এই আদর্শ (model) এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে অন্য কয়েকটি রাজ্য যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশ নিজেদের রাজ্যে এই আইন আনতে চাইছে। এই শ্রমিককল্যাণ fund সৃষ্টির জন্য যাতে তারা নিয়ম বহির্ভূত বিভাগের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে।

১৩.৭ বিশেষ সমস্যা

উন্নতিশীল দেশগুলিতে নিয়মসিদ্ধ বিভাগে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের একটি ছোটো কেন্দ্র আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (International Labour Organisation – ILO) হিসাব অনুসারে নিয়মসিদ্ধ বিভাগকে শহুরে বাড়তি শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে নিতে অবশ্যই অনেক বেশি হারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে— এই হার অন্তত বছরে ১০% হওয়া চাই। তার মানে যেহেতু উৎপাদনের তুলনায় কর্মসংস্থান বাড়ছে এই বিভাগকে তাই উৎপাদনও অনেক বেশি হারে বাড়াতে হবে। প্রচলিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের উন্নয়ন খুবই সম্ভাবনাহীন ভাল মনে হয়। এইভাবে বললে অনিয়মিত বিভাগে বেশি শ্রমিক কাজে লাগবার বোঝা চলবেই যদি শহরে কর্মসংস্থানের

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

সমস্যার জন্য অন্য কোনো সমাধান পাওয়া না যায়।

যাইহোক নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের এই উন্নতির অসুবিধাও আছে। নিয়ম বহির্ভূত বিভাগের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধাগুলির অন্যতম অসুবিধা হল গ্রাম-শহরের মধ্যে ‘migration’-এর সম্পর্ক এবং এই বিভাগে শ্রমিকদের কাজে লাগানো। গ্রামীণ এলাকা থেকে এই যে লোকজন চলে যাওয়া এটার একদিকে বেকারির নিম্ন হার এবং অনিয়মিত বিভাগে কাজ পাওয়ার জন্য অল্প সময়ের অপেক্ষা— (এই বিভাগে)। অতএব নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের আয়ের উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা শহরাঞ্চলের বেকারির সমস্যা জড়িয়ে দেয়। এই সমস্যা বৃদ্ধি পায় কারণ অনিয়মিত বা নিয়মসিদ্ধ বিভাগ যত শ্রমিক কাজে লাগাতে পারে তার চেয়ে বেশি শ্রমিক আকর্ষণ করে।

তা ছাড়া শহরাঞ্চলে নিয়মবহির্ভূত বিভাগের অত্যন্ত ঘন বসতি পরিবেশগত ফলাফলের সমস্যাটিও ভাববার বিষয়। নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের অনেক কাজ দূষণ ও অতিরিক্ত ভিড়ের সৃষ্টি করে— (সাইকেল রিক্সা ও ভ্যান রিক্সার জন্য) এবং পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে (ফেরিওয়ালা ও রাস্তায় বসে বিক্রেতারা)।

এর পরেও আছে বস্তি এলাকায় ক্রমবর্ধমান বসতি এবং নিম্ন আয়ের প্রতিবেশী। আবার এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অকিঞ্চিৎকর শহুরে পরিসেবা; এ সবই শহরাঞ্চলে বড়ো বড়ো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই অনিয়মিত বিভাগের উন্নতির জন্য যে-কোনো কার্যপ্রণালী এই নানান সমস্যা সমাধানে অবশ্যই সমর্থ হতে পারবে।

কারণ দক্ষতার ব্যবহার নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে; সরকার অঞ্চলে অঞ্চলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহজ করবেন। এই ব্যবস্থা শহুরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী হবে। এই ভাবে সরকার নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের গঠনের কাজ করতে পারেন। যাতে এই বিভাগে উৎপাদন, পরিসেবার কাজকর্ম থাকে, যেটা সমাজকে একটা মূল্যবান পরিসেবা দিতে পারে। বিশেষকরে এই সমস্ত উপায়গুলি আইনি কাজের উন্নতি করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বে-আইনি কাজের প্রতিনিবৃত্তি ঘটাতে পারে; এই কাজের জন্য চাই উপযুক্ত দক্ষতা অন্য সব ‘incentives’। এই উপায়ে যে সমস্ত কর বাকি পড়ে আছে সেগুলি আদায় হতে পারে।

মূলধনের অভাব নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কাজকর্মের প্রধান অন্তরায়। অতএব ঋণবোধ করার মতো অর্থের জোগান এই উদ্যোগগুলিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে এবং লাভও বাড়াতে পারে। এভাবেই আরও আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার একই রকম ফল দিতে পারবে। উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং উপযুক্ত অবস্থান (location) একটি বিস্তৃত নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কিছু পরিবেশগত প্রভাব দূর করতে পারে। সবচেয়ে প্রয়োজন আরও ভালো জীবনযাত্রার সুস্থ ব্যবস্থা। সোজাসুজি যদি এ ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে এই বিভাগের উন্নতি করতে হবে শহরাঞ্চলের প্রান্তিক এলাকায়; অথবা ছোটো ছোটো শহরে যেখানে জনগণ বসতি স্থাপন করবে (নতুন কর্মস্থলের কাছাকাছি) কিন্তু শহরাঞ্চলের ঘনবসতি থেকে দূরে।

যাইহোক ভারতবর্ষে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের কথা নির্দিষ্ট অর্থে সরকারি পরিসংখ্যানে ব্যবহার করা হয়নি অথবা National Accounts Statistics-এও (NAS) দেখানো হয়নি। যে terms গুলি ভারতীয় NAS-এ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল ‘সংগঠিত’ ও ‘অসংঘঠিত’ বিভাগ— (organised and unorganised sector). Organised বিভাগে সেই সমস্ত ব্যবসার আছে যাদের পরিসংখ্যান বাজেটের (budget) দলিলপত্রে বা রিপোর্টে পাওয়া যায়। অন্য দিকে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের উদ্যোগগুলি কাজকর্মের বা ‘data’ সংগ্রহের নিয়মিত আইন সংগত কোনো ব্যবস্থা থাকে না বা এখানে নিয়মিত ভাবে কোনো হিসাবও রাখা হয় না। অন্যদিকে unorganised বিভাগে অংশীদারী ব্যাবসাগুলি সমবায় সমিতির মাধ্যমে চলে; যেখানে কোনো সংঘবদ্ধতা বা ন্যায্যতা নেই। এক্ষেত্রে ‘trust’ এবং ‘private and limited company’ গুলি এর আওতায় পড়ে। অতএব নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগগুলি অসংগঠিত বিভাগের ‘Sub-set’ বলে বিবেচিত হতে পারে।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

এই ধারণার বোধগম্যতা সময়ের সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে বদল হয়ে গেছে ঃ

(১) **প্রান্তিক অথবা মৌলিক বিভাগ (Marginal or basic sector)** ঃ প্রাথমিক দৃষ্টিতে 'informal sector' ছিল 'marginal sector', এটা বলা হত যে এই বিভাগের অবস্থান সমগ্র অর্থনীতিতে (এর) অবদানের জন্য। পরে অনুমান করা হয়েছে অনুমোদনও করা হয়েছে যে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ এবং মৌলিক — প্রান্তিক নয়। এবং কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিভাগের অবদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এসব কাজই হচ্ছে দ্রুত বর্ধিত শ্রমিক-কেন্দ্রিক ব্যবসায়গুলির মাধ্যমে। এই ব্যবসায়গুলির কোনো কোনোটিকে বড়ো ব্যাবসার জন্য (formal enterprise) অ-লাভজনক বলে বিবেচনা করা হয়।

(২) **স্বল্প অথবা দীর্ঘ মেয়াদি phenomenon (Short or long term phenomenon)** ঃ নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগকে প্রথাগত ভাবে মনে করা হয় এই বিভাগ কোনো ক্ষণস্থায়ী সংগঠন, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এটি একটি অনেক বেশি স্থায়ী সংগঠন বলে স্বীকৃত হয়েছে— প্রাসঙ্গিকভাবে, সাম্প্রতিক প্রমাণ সাপেক্ষে পক্ষান্তরে বলা যায় যে ব্যাপারটা কেউ উপরে উল্লিখিত more 'traditional' দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে যে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কোনো চুক্তি করে না। পক্ষান্তরে প্রমাণ বলে — অন্তত আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় — এই নিয়ম বহির্ভূত বিভাগগুলিতে প্রসারণের একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং এই একটা সমন্বয়-সাধন ও সংস্কার পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইগুলি প্রসার লাভ করে।

(৩) **যে ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হয় (The type of labour employed)** ঃ এই, ধারণা কাজে লাগানোর জন্য প্রথম যে সরকারি রিপোর্টটি ILO (1992) প্রমাণ করে এর কতকটা সফল প্রয়োগ— নিয়ম বহির্ভূত এবং নিয়মসিদ্ধ বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনা করে একথা স্পষ্ট হয়। প্রথম বিভাজনটি তার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে অপর বিভাগটি থেকে কতটা অন্যরকম তা বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিভাগটিতে কাজে প্রবেশ করা সোজা, মূলধন অল্প, পরিবারে মালিকানা আছে, ক্ষুদ্র শিল্প, শ্রমিককেন্দ্রিক, পরিবর্তনযোগ্য প্রযুক্তি, অনিয়ন্ত্রিত কিন্তু প্রতিযোগীতামূলক বাজার, অনিয়মিত দক্ষতা অর্জন পদ্ধতি। যাইহোক উপযুক্তভাবে এটা বুঝতে পারা যায়নি যে স্ব-নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানে পরিবারের সদস্যরাও শ্রমিকের কাজ করতে পারে নানা ভাবে। পারিশ্রমিক প্রাপ্ত শ্রমিক (নিয়মিত ও অনিয়মিত) এবং শিক্ষানবিশরাও এখানে কাজ করে, এবং এসবই এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত।

(৪) **নিয়মসিদ্ধ বিভাগের সঙ্গে সংযোগ (Linkages to the formal sector)** ঃ সাম্প্রতিক কিছু প্রমাণ দেখাচ্ছে যে কোনো কোনো দেশে, নিয়মসিদ্ধ ও নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের সংযোগ বেশ গভীর এবং ব্যাপক, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। যাইহোক এখানে কিছু প্রশ্ন আছে, এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ কি শুধু মাত্র এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে মানুষ অপেক্ষা করে নিয়মসিদ্ধ বিভাগের কাজে প্রবেশের জন্য যেমন একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তিসূচক অবস্থা, যে অবস্থা নিশ্চয় আরামপ্রদ সম্ভব সূচক। এই অবস্থানের অবস্থাটা চিরস্থায়ী হয় না, যতক্ষণ না নিয়মসিদ্ধ বিভাগ শ্রমিকদের নিজেই কাজে লাগিয়ে নেয় অথবা এখানে কি থাকতে হবে ঃ যদি না বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই অবস্থা উন্নত হয়ে শহরের শ্রমিক শক্তির কর্মসংস্থান এবং আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

(৫) **উৎপাদনশীলতা এবং GDP-তে অবদান (Productivity and contribution to GDP)** ঃ প্রাথমিক স্তরে যখন এই নিয়ম বহির্ভূত বিভাগকে মোটামুটি একটা 'residual sector' হিসাবে দেখা হত— অর্থাৎ যে সমস্ত শ্রমিকরা নিয়মসিদ্ধ বিভাগে কাজ পেতে পারছে না তাদের জন্য একটা কম সংস্থানের উৎস এবং সেই সঙ্গে এই বিভাগের শ্রমিকদের তখন কম-উৎপাদনকারী শ্রমিক হিসাবে দেখা হতো। কিন্তু সম্প্রতি অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা দেখিয়েছে এটা সত্যি হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাচ্ছে Charmes (১৯৯০) প্রমাণ দেখাচ্ছে যে এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের প্রাথমিক সাধারণত ন্যূনতম বেতন পেলেও GDP-কে তাদের অবদান অনেক বেশি। তা ছাড়া Charmes (১৯৯০) প্রস্তাবে

দেখিয়েছে যে সাধারণত এই বিভাগের উৎপাদন গড়ে লোকপিছু GNP অনেক বেশি (অর্থনীতির ক্ষেত্রে)।

(৬) **ভূগোল (Geography) ঃ** (Informal sector) শব্দটির একটি ভৌগোলিক আকৃতি আছে— কারণ নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের ধারণা শহুরে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত — এটা একটা প্রবণতা, যেটা থেকেই যাচ্ছে। যাইহোক বর্তমানের গবেষণা প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছে যে এই বিভাগ অনেক বেশি ব্যাপ্তিশীল — ব্যাপ্তিশীল সমানভাব শহর এবং গ্রামাঞ্চলে। উদাহরণস্বরূপ King (১৯৯০) বলেছে। ৮০ দশকে মনে হয়েছে এই নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের ধারণাকে নতুন করে বদলাবার মতো কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে— 'as the ordinary economy cutting across rural and urban areas, agriculture and commerce, across survival skills and income generating strategies'।

(৭) **পূর্বসূত্রের গুরুত্ব (Importance of Contract) ঃ** প্রাথমিক স্তরে (Informal sector) নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ পুরোপুরি একটা বর্ণনামূলক ব্যাপার ছিল, এবং অনেকটা ধারণাবিহীন— এখন এই বিভাগের দিকে নজর অনেক বেড়েছে যাতে বিভাগটির ধারণাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যায়। এখন এটিকে বুঝতে হবে এই বিভাগ যে দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ Kabra (১৯৯০) — এই বিভাগের এক ঐতিহাসিক framework গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, since "any historical approach to the informal sector would hardly be able to capture its dinersity, varying degree of cohesion, linkages with the rest of the economy and future directions.........."

(৮) **প্রযুক্তিগত ভিত্তি (Technological Base) ঃ** নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগকে বোঝার বিষয়ে আর একটি জায়গায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সেটি হচ্ছে এই বিভাগের প্রযুক্তিগত বিভাগের জায়গা। এই জায়গাটি একেবারে ঐতিহ্যগত, এখানে কার্যত সাম্প্রতিক কালের গবেষণালব্ধ প্রমাণ দেখাচ্ছে যে এ অভিমতের কোনো সমরূপতা নেই। যদিও নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের উদ্যোগে (ব্যবসায়) খুব সাধারণ প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে এবং মূলধনও খুব অল্প, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিভাগে উদ্যোগ খুবই কর্মশীল (dynamic), এর উৎপাদনে যথেষ্ট নতুন নতুন পরিবর্তন থাকে, এদের কাজের পদ্ধতি ও উৎপাদনের জন্য নতুন পরিস্থিতির পণ্য বাজারের সুযোগকে এরা কাজে লাগায়।

(৯) **নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগ অথবা নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগসমূহ (The informal Sector or informal sectors) ঃ** অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে কেবলমাত্র নিয়মসিদ্ধ ও নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের জন্য ভাগ করে দেওয়া। যদিও বোধহয় বিশ্লেষণমূলক কাজের ভিত্তিতে বাঞ্ছনীয় তবুও স্পষ্টত এটা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় সরলীকরণ। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে উভয় বিভাগের উপাদান দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু এই ভাবে তাদের শ্রেণি-বিভাগ অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে এটি প্রস্তাব দেওয়া যায় যে এই সব ব্যবসায়গুলিকে কার্যসিদ্ধ ও নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের মধ্যে চরম ও একেবারে বিপরীত মেরুতে শ্রেণি-বিভাগ (on a continuum) করা যায়। এই বিকল্প উপস্থাপনা আগেকার স্থূল বর্ণনার চেয়ে অনেক উন্নত।

(১০) **কার্যধারার মধ্যস্থতা (Policy intervention) ঃ** নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের বিস্তৃত এবং নানা ধরনের কার্যাবলি, পেশা এবং ব্যক্তি বিশেষকে ক্রমাগত স্বীকৃতি দেওয়ায় একই রকম নীতির বদলে কাজের বিরাট পরিধি ও অনুক্রমের জন্য যুক্তি দিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এক মাপ সকলের উপযুক্ত হয় না। অর্থাৎ একই ধরনের প্রস্তাব সব ক্ষেত্রে খাটে না। বিশেষ শর্ত এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজে মাধ্যমগুলিকে (প্রদত্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও প্রদত্ত বিভাগের জন্য) কাজের ধারা অনুসারে সঠিক ভাবে স্থির করা দরকার।

১৩.৮ প্রশ্নাবলি

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

(১) শহুরে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের ধারণা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কী জানেন? বিস্তারিতভাবে বলুন।

(২) শহুরে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সূক্ষ্মভাবে বিচার করুন।

(৩) ভারতীয় অর্থনীতি এবং অনুক্রম এবং মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত বিভাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

একক—১৪ ❑ নগরোন্নয়নে ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঃ

গঠন

১৪.১. নগরোন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

১৪.২. নগরোন্নয়নে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

১৪.৩. নগরোন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

১৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি

১৪.৫. প্রশ্নাবলি

১৪.১. নগরোন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

সাধারণ অর্থে নগরোন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রাম রূপান্তরিত হয় শহরে এবং শহর রূপান্তরিত হয় নগরে। চিরাচরিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, মূল্যবোধের ও সামাজিক চর্চার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগরোন্নয়ন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনজীবিকার আমুল পরিবর্তনের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নগরোন্নয়ন প্রক্রিয়াতে গ্রামীণ জনসংখ্যার হ্রাস ও সমানুপাতিক হারে নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ঘটনা অনবরত ঘটতে থাকে।

নগরাঞ্চলের জনসমষ্টি আপাতদৃষ্টিতে বিশাল সংখ্যক, অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট এবং বিচিত্র শ্রেণিভুক্ত। এই জনসমষ্টির অধিকাংশই নানান ধরনের শিল্প, কলকারখানায় চাকুরি ও ব্যাবসা বাণিজ্যের কাজে যুক্ত থাকেন। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। যোগ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে। সেইকারণে, লেখাপড়া জানা উচ্চ শিক্ষিত কর্মহীন ছেলে মেয়েরা কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে ভীড় বাড়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন ঘটে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত হারে নগরায়ণের গতিও বাড়তে থাকে। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে তৎকালীন নগরবাসীদের জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ এবং নিকাশি ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য নানা রকমের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে কিছু প্রকল্প বিভিন্ন পৌরসভার মাধ্যমে এবং কিছু প্রকল্প নগরোন্নয়ন সংস্থা বা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়। অপেক্ষাকৃত পুরোনো শহরাঞ্চলের পুনরায় সংস্কারমূলক কাজকর্ম এবং বাসস্থানের সংকটমোচনের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে নগরায়ণের গতি এবং প্রচলিত নগরোন্নয়নমূলক প্রকল্প-এর কথা মাথায় রেখে উভয়ের মধ্যে আরও বেশি করে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সংযোজনার মাধ্যমে সুসংহত উপায়ে নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা রকমের উদ্যোগ

গৃহীত হয়। প্রশাসনিক জটিলতা, সম্পদের অপব্যবহার, অপচয় ও অপরিকল্পিত ভাবে বণ্টন-এর বিষয়ে স্বচ্ছতা আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি নানান উন্নয়নমূলক সংস্থা / বিভাগের সঙ্গে সুসমন্বয় স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রসূতি / গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, পরিচর্যা, বাসস্থান ও নিকাশি ব্যবস্থা, বস্তি অঞ্চল উন্নয়ন, প্রভৃতির মাধ্যমে শহরবাসীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া শহরাঞ্চলের নানাবিধ সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, নারীপাচার, স্বাস্থ্যহানিকর পরিস্থিতি প্রভৃতি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প রচনা করা হলেও বাস্তবে সেগুলি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। এমনকি শহরাঞ্চলের এখনও বহুমানুষকে নগরোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। নগরোন্নয়নের কাজে যুক্ত নানান সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে সংযোজন ও সমন্বয় স্থাপনের মাধ্যমে সুসংহত নগরোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ব্যাংক যেহেতু আর্থিক লেনদেন-এর কাজে যুক্ত এবং মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সিংহভাগ ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে, সেহেতু উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাংকের অংশগ্রহণ ও মতামত দানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাংকের ভূমিকা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য আঞ্চলিক ব্যাংকের কাজকর্মে গতির সঞ্চার হয়েছে। নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থে ব্যাংক যে ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে তার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) সংঘ গঠন ও যোগসূত্র স্থাপন ঃ

প্রায় প্রত্যেক শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চল থেকে এমনকি শহরাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে বহু মানুষের স্থানান্তর ঘটে। এদের মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত, শ্রেণিগত ও আচার-আচরণগত বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মতো। সমষ্টি সংগঠনের কাজে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সংঘ স্থাপন করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যদিও বেশির ভাগ নগরবাসীর কাছে নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এবং এলাকাভিত্তিক কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকে। তথাপি নিজেদের এলাকায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত থাকা প্রায় বেশির ভাগেরই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সকলের নিয়মিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাক্তিকেন্দ্রিক কাজ কারবারের সাথে ব্যাংক অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বা বিভাগীয় সুযোগ সুবিধাভিত্তিক কাজকর্ম করে থাকে। যা করতে গিয়ে স্থানীয় যুব সংগঠন, মহিলা সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, উন্নয়ন মূলক বা কল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠান বা উন্নয়নমূলক সংস্থার যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন ভাবে গড়ে ওঠা সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের নিয়মিত লেনদেন করার ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত সহযোগিতা করে থাকে। ফলে, নগরোন্নয়নের নানান কর্মসূচি রূপায়ণের গতি ত্বরান্বিত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংঘের পক্ষে সময়মতো প্রস্তাবিত কর্মসূচি রূপায়ণ করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, সমষ্টিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান-এর কাজকর্মে এমন অনেক মানুষকে যুক্ত করা হয় যাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান থাকে না।

বস্তিবাসী হিসাবে চিহ্নিত বহু মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সমষ্টিকেন্দ্রিক একাত্মতার বোধে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তাদের অংশগ্রহণ মজবুত হয়। মানুষের সাথে মানুষের সংঘবদ্ধতা, মানুষের সাথে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র স্থাপন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যাংকের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান / বিভাগের উদ্যোগে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের সঙ্গে ব্যাংকের যোগাযোগ ঘটানোর পর অনেকক্ষেত্রে ব্যাংকের উদ্যোগেই সেই যোগাযোগের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) অনুদান, বা ভরতুকি বণ্টন ঃ

নগরোন্নয়নের বেশির ভাগ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কোনো না কোনো ব্যাংকের মাধ্যমেই বিলি-বণ্টনের বন্দোবস্ত করা হয়। সাধারণ অর্থে প্রায় প্রতিটি কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত অনুদান বা ভরতুকির সাথে ব্যাংকে প্রদত্ত ঋণের সংস্থান থাকে। স্বনির্ভর ও কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত উপকারভোগীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরতুকি বা অনুদান বণ্টন করার আগে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিভাগ / সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে থাকে। এমনকি স্থানীয় পৌরপ্রধান বা প্রতিনিধির মতামতকেও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। এইভাবে অনুদানযুক্ত ঋণ প্রদানের ফলে ব্যাংকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ / প্রতিষ্ঠানের যেমন সুসমন্বয় গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি ব্যাংকের সঙ্গে স্থানীয় পৌরপ্রধান বা প্রতিনিধির সুসম্পর্ক বজায় থাকে। ফলে, ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের অর্থ পরিশোধ দেওয়ার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর দায়বদ্ধতা বাড়ে। ঋণ নিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনা করা বা খোঁজখবর রাখার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মীদের / প্রতিনিধিদের আগ্রহ বাড়ে। অর্থাৎ কেবলমাত্র ভরতুকি বা অনুদান বণ্টন করেই ব্যাংকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শহরাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া, অসহায়, দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার কাজে ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগতভাবে বড়ো ধরনের ব্যাবসা বা উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সহযোগিতা না থাকলে সাফল্য অর্জনের পথে নানান রকমের বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, প্রত্যেকটি উদ্যোগ বা ব্যাবসার ক্ষেত্রে সময়মতো মূলধনের বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একমাত্র ব্যাংক সেই মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারে। কখনো কখনো সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে মূলধন হিসাবে ব্যাংক-ঋণের অনুপাত নির্দিষ্টভাবে বলা থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ ঋণের অর্থ প্রয়োজন হবে তা স্থির করে। সম্ভাবনাময় উপকারভোগীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অনুদান বা ভরতুকি ছাড়াও ব্যাংকের ঋণ বণ্টনে কোনো বাধা থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) উপভোক্তা বা টার্গেট গ্রুপ নির্বাচন ঃ

নগরোন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় কোন্ শ্রেণীর মানুষের জন্য কী ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় তা নির্দিষ্ট করা হয়। ব্যাংক-নির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় পৌরপ্রধান বা প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাংকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সেই নির্দিষ্ট উপভোক্তা বা উপকারভোগী গোষ্ঠী (beneficiaries / target group) কে বেছে নেওয়া হয়। কখনো একটি বছরের জন্য আবার কখনো নির্দিষ্ট মেয়াদ কালের জন্য এই উপভোক্তা নির্বাচনের কাজটি করা হয়ে

থাকে। সাধারণত পৌরসভার মাসিক বা ত্রৈমাসিক সভায় ব্যাংক অন্যান্য সরকারি বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিক বা কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সেই উপভোক্তা নির্বাচনের কাজটি চূড়ান্ত করে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কথা মাথায় রেখে একটি আর্থিক বছরের জন্য উপভোক্তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুযোগসুবিধাগুলি ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার জন্য প্রকল্প ভিত্তিক উপভোক্তা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিভাগের / সংস্থার আধিকারিক বা কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি স্থানীয় পৌরপ্রধান বা প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। মাসিক বা ত্রৈমাসিক সভাতে এই ধরনের বিষয় নিয়ে ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করার ফলে বিগত বছরগুলিতে যে সব উপভোক্তা প্রকল্প নির্ভর কাজকর্ম করার জন্য নির্দিষ্ট সুযোগসুবিধা পেয়েছেন তাদের কাজের মূল্যায়ন করা সহজ হয়। এমন কি একই উপভোক্তা বা উপকারভোগী গোষ্ঠী বারবার একই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুযোগসুবিধা পাচ্ছে কিনা ব্যাংকের পক্ষে তা খতিয়ে দেখা সহজ হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের উপর ভিত্তি করে সম্ভাবনাময় উপভোক্তা (Potential beneficiary) নির্বাচনের কাজে ব্যাংকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে নিজেদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রকৃত উদ্যমী ও উৎসাহী উপভোক্তা ঋণ বা আর্থিক সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকার ফলে সফলভাবে নিজস্ব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ পরিচালনার কাজে মনঃসংযোগ করতে পারে। ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে সঠিক উপভোক্তার হাতে ঋণ বা অনুদান তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে, যাতে সফল উদ্যোগী ও স্বনিযুক্ত ব্যক্তি দিশা খুঁজে পায়।

(ঘ) সম্পদের নকশাকরণ ঃ

সরকারি ও বেসরকারি নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের প্রয়োজনে একটি এলাকায় কী ধরনের সম্পদ ও সম্ভাবনা থাকে তা খতিয়ে দেখা হয়। মুলত অসহায় ও পশ্চাৎপদ-শ্রেণির কল্যাণে কাজে লাগবে এমন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সম্পদ স্থানীয়ভাবে কতটা পাওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত করাকেই সম্পদের নকশাকরণ বলে। অন্যান্যদের মতো শহরাঞ্চলে বসবাসকারী বেশির ভাগ অসহায় অনগ্রসর মানুষ তাদের নিজস্ব প্রভাব মেটানোর জন্য হাতের কাছে তৈরি অবস্থায় পাওয়া সম্পদ বা সামগ্রীর জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে। তার চারপাশে কোথায় কী ধরনের সম্পদ বা সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার মানসিকতা থাকে না। শহরের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনস্রোতে সকলের সঙ্গে অভাবগ্রস্ত মানুষের বেশির ভাগটাই ভেসে চলে। ব্যাংকের মাধ্যমে নানান রকমের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অর্থ লেনদেন হয় বলে স্থানীয় সম্পদ সম্পর্কে বেশির ভাগ তথ্য ব্যাংকের কাছে থাকে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বছরে ব্যাংক ঋণ নিয়ে ওই এলাকায় কী ধরনের সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তারও তালিকা তৈরি করা হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কোথায় কী ধরনের সম্পদ আছে এবং সেখানে কী ধরনের নতুন নতুন সম্পদ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ব্যাংকের খতিয়ান থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে। তাদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের প্রকৃতি বিচার করে ব্যাংক নিশ্চিত হতে পারে ওই এলাকায় কী ধরনের সম্পদ রয়েছে সে সম্পর্কে। এই ধরনের নকশা বা নতি নির্ভর তথ্য ব্যাংক কখনও কোনোভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে না। উন্নয়নমূলক কাজের বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনায় তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দিয়ে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও নিপুণভাবে কর্মসূচি গ্রহণে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ও

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা সম্পদ-সম্ভাবনার সুষ্ঠু ব্যবহার ও কার্যকারণের জন্য উভয়ের মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তুলতে ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(ঙ) বাসস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন ঃ

শহরাঞ্চলে রাস্তা তৈরি করা, সেতু নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ, প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের সাথে একটি এলাকার পাকাবাড়ি, পীচ রাস্তা, উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ও যানবাহন-এর সুবন্দোবস্ত প্রভৃতির কারণে তফাত করা খুব সহজ হয়। পৌর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্ব আরোপ করা। বস্তি অঞ্চল উন্নয়নের আওতায় বাসস্থান ও গৃহমেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিত করাও সেই পরিকল্পনার অঙ্গ। পৌরসভার বিভিন্ন সভায় পৌরপ্রধান বা পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কোন্ কোন্ এলাকায় কতটা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হবে তা চূড়ান্তকরণ করা হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বাসস্থান নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সরকারি বিভাগের অধীন একই কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় দূর করার জন্য ওই বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে ব্যাংক বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। এমনকি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বাসস্থান নির্মাণের কাজে গতি সঞ্চার করার জন্য বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারি সংস্থা / বিভাগের সুসমন্বয় গড়ে তুলতে ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

(চ) সামাজিক সহায়তা ঃ

সাধারণভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কারণে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের আমানতের নামে ব্যাংক সাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে থাকে ও নিরাপদে গচ্ছিত রাখে। অন্যদিকে, সরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থার বা বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সামগ্রিক সুরক্ষাদানের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমেই আর্থিক লেনদেনের বন্দোবস্ত করা হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে জীবনহানি বা অঙ্গহানির পরিণামে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের সংকট মোকাবিলায় জীবনবীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের মাধ্যমেই যাবতীয় বীমাসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। আবার স্বল্প সঞ্চয়ের সংসাপত্র বা হুন্ডি ক্রয়বিক্রয়ের কাজেও ব্যাংকের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় সুযোগসুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাংক জাতীয় ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্বার্থে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য বিশেষকরে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত সামাজিক সহায়তামূলক প্রকল্পের যে-কোনো সুবিধা পেতে ব্যাংকের কারণে অযথা যাতে দেরি না হয় তার জন্য বিশেষভাবে তৎপর থাকে। শহরাঞ্চলে স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় আসা মহিলাদের গোষ্ঠী বা সমিতির মাধ্যমে দলগত বিমার সুযোগসুবিধা যাতে তারা পান তার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ব্যাংক তাদের সাহায্য করে থাকে। এ ছাড়া সামাজিক সুরক্ষা বিধানের জন্য গৃহীত নানা

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

রকমের প্রকল্পের ছাপানো হ্যান্ডবিল এবং ছোটো পুস্তিকা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতেও ব্যাংকের অসুবিধা হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে নগরোন্নয়নে ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যাবে। নানান কাজের ফাঁকে শহরাঞ্চলের অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য তাদের কাছে ব্যাংক পরিসেবা পৌঁছে দিতে আজকাল বহু ব্যাংক তাদের আমানতের ন্যূনতম সীমার নিয়মে শৈথিল্য এনেছে। সরকারি ও বেসরকারি নানান সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য অনেক সময় তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার হয়। ন্যূনতম সঞ্চয়ের সীমা কমানোর ফলে তাদের সেই সুযোগ গ্রহণের পথে উৎসাহ দিতেই ব্যাংক বিশেষভাবে তৎপর থাকে। এর ফলে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন বরাদ্দকৃত আর্থিক সুযোগসুবিধা সময়মতো পেতে ও প্রস্তাবিত উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে যেতে বিশেষ বাধা থাকে না।

১৪.২. নগরোন্নয়নে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

ব্যাবসায়িক ভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানকেই সাধারণ অর্থে ব্যাবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড়ো মাপের প্রতিষ্ঠান যা কিনা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বিপণন ও বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কাজে নিয়োজিত হয় এবং যাদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারী থাকে সেইসব প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। দিন বদলের সাথে তাল মিলিয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভাবনাকেও মুনাফা অর্জনের বাইরে কখনো কখনো মানুষের জন্য কিছু কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন, পারস্পরিক জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ, অন্যদিকে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উভয়ের ওপর নির্ভরশীল। আকারে বড়ো, এবং কর্মীর সংখ্যাও বেশি থাকার ফলে অনেক বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং লাভের অঙ্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা বড়ো ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বেশি থাকে। তাই নগরোন্নয়নের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আজকাল এই ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন— আই. টি. সি; অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানি, টাটা, লার্সেন ও টুব্রো সিমেন্ট কোম্পানি, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স, ভারত পেট্রোলিয়াম, ও. আর. জি. গ্রুপ অব সোশ্যাল রিসার্চ, বিড়লা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাদের মানুফা অর্জনের পাশাপাশি অর্জিত মুনাফার কিছুটা অংশ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে উদ্যোগী হয়। শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে উভয়ক্ষেত্রেই এদের কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়িত হয়। গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ-সম্ভাবনা বেশি হওয়ার কারণে শহরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একটি বড়ো অংশ নগরোন্নয়নের কাজেই উদ্যোগী হয়। তাদের গৃহীত নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—

— দাতব্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা।

— ন্যূনতম খরচে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক জিনিসপত্র সরবরাহ করা।

— অসহায়, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিশেষ করে বস্তিবাসীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

— বাসস্থান ও শৌচাগার নির্মাণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

— বেকার যুবক যুবতীদের জন্য শহরাঞ্চলে নানান সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বনের বন্দোবস্ত করা।

— দুর্যোগ কবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রীর ব্যবস্থা করা।

— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সাক্ষরতার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ।

— বিনোদন ও মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

— পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রভৃতি।

এ ছাড়াও বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের এবং খেলাধূলার জন্য বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকে। ফলে পিছিয়ে পড়া অসচ্ছল পরিবারের বহু মানুষ সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠান ও খেলা ধূলায় অংশগ্রহণ করেন। উৎপাদন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে খুব কম পরিশ্রমিকের বিনিময়ে শহরাঞ্চলের অভাবগ্রস্ত, আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির একটা বড়ো অংশের কর্মসংস্থান হয়। মজুরি ও খাদ্যের বিনিময়ে তাদের পরিবারের জীবন-জীবিকার সংস্থান হয়। বৃহদায়তনের কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এক-একটি বস্তি অঞ্চলকে যাবতীয় সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে দিয়ে মডেল বসতি অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। সেখানে উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা, শিক্ষা ও সাক্ষরতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে সুসমন্বয় গড়ে তোলা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি এলাকাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরার কাজে অনেকসময় অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে থাকে।

১৪.৩. নগরোন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সংঘ, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যুব সমিতি বা কল্যাণমূলক সংঘ প্রভৃতি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষ বিশেষভাবেই অবহিত। পাড়ার কিছু মানুষ দু-একজন শুভানুধ্যায়ী ও পরহিতাকাঙ্ক্ষী মানুষের উৎসাহে ও উদ্যোগে সংঘবধ্ব হয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পারিপার্শ্বিক সমস্যার সমাধান ও কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সেই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে এলাকার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থের ও সম্পদের মাধ্যমে বিবিধ কাজকর্মে যুক্ত হয় এবং সরকারি নানান প্রকল্পের সাথে যৌথভাবে কাজকর্মে উদ্যোগী হয়। এইভাবে ধাপে ধাপে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্রমে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সরকার বা অন্য কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বধ্বতার জায়গা তৈরি হয়।

নগরোন্নয়নের কাজে এই ধরনের বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা দিন দিন বৃধ্বি পেয়েছে। শহরের অনুন্নত এলাকায় বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলে সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের উদ্যোগে নানান রকম কাজ করে থাকে। সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম যেমন শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিসেবা দান, শৌচাগার নির্মাণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কাজে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নজর থাকলেও ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের

কাজের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা বিস্তৃত হয়েছে। ত্রাণ, পুনর্বাসনমূলক কাজকর্মের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তারে, আবাস ও পরিকাঠামো উন্নয়নে, দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির মানুষের সামগ্রিক মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরকারের সাথে যৌথভাবে নগরোন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনায় ও বাস্তবায়নের প্রত্যেকটি ধাপে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন উভয়ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও নগরোন্নয়নের কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তুলনায় গ্রামোন্নয়নের কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা অনেক বেশি। তবুও, দেখা গেছে গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটি বড়ো অংশের মুখ্য কার্য্যালয় শহরাঞ্চলে অবস্থিত। অন্যদিকে নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে কাজের সন্ধানে হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে বসতি স্থাপন করে শহরেই থেকে যাচ্ছেন। যার ফলে সরকারি নানান রকমের নগরোন্নয়নমূলক কাজকর্মে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও কর্মসূচি রূপায়ণের অংশীদার হিসাবে কাজ করার সুযোগ বেড়েছে। বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণ-এর ফলে যন্ত্রনির্ভর কাজকর্মের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে না হওয়ার কারণে প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তির নানান ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প দিয়ে শহরাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব না হওয়ার কারণে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বৃহদায়তনের বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ত্রিমুখী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নগরোন্নয়নের কাজে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নগরোন্নয়ন কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একজনের সাথে অন্যজনের কর্মপদ্ধতির তারতম্য ঘটে। এমনকি প্রতিষ্ঠান ভেদে তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীরও তারতম্য লক্ষ করা যায়। যখন যে ধরনের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকুল্যে কোনো প্রকল্প গৃহীত হয় তখন তাদের নির্দিষ্ট নিয়মনীতির ওপর ভিত্তি করেই বেশির ভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে থাকে। তবুও প্রাথমিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে অনেকক্ষেত্রে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। মূলত কর্মপদ্ধতিগত বিষয়ে যে ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তার কয়েকটি হল—

➡ উপকারভোগী জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কিছু সাধারণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

➡ স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি চিহ্নিতকরণ।

➡ স্থানীয়ভাবে যে ধরনের সম্পদ ও সম্ভাবনা পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্রমবিন্যাস করা।

➡ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসমন্বয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংহতি স্থাপন।

➡ স্থানীয় সংঘ বা সমিতি গঠন যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখা

এবং ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা।

➠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সঠিকভাবে রূপায়ণকে সুনিশ্চিত করতে স্থানীয় সংঘ, সমিতি বা মহিলা মণ্ডলীর নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যদের জন্য নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

প্রতিষ্ঠান ভেদে এই ধরনের কাজকর্মের তারতম্য থাকলেও উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। স্থায়ীভাবে কোনো কর্মসূচি গ্রহণের প্রাক্কালে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দক্ষ ও পেশাদারকর্মীর সংখ্যা সব প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে থাকে না। যার ফলে, বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তুলনায় ক্ষনস্থায়ী বা তুলনায় কম সময়ের এক-একটি প্রকল্পের দিকে বেশি ঝোঁকে। নগরোন্নয়নের সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

(ক) সচেতনতা বৃদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ ঃ

এক-একটি এলাকার মানুষের সচেতনতা বোধ, জ্ঞানবুদ্ধির স্তর এক-এক রকমের হয়। প্রতিষ্ঠানগতভাবে যখন উপকারভোগী জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হয় তখনই বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সেই জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতনতার স্তর চিহ্নিত করে থাকে। যার ওপর ভিত্তি করে এক-এক শ্রেণির মানুষের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে যেমন মহিলাদের জন্য, কিশোর-কিশোরীদের জন্য, বয়স্কদের জন্য যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সারাবছর ধরে এই কাজ করে থাকে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের দু-একটি শিবির করেই অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যস্ত থাকে। সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশির ভাগ মানুষের সমস্যার বিষয়ে যেমন কুসংস্কার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিচর্যা, প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারীপাচার রোধ, শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শৌচাগার ও পানীয় জলের সমস্যা এবং অন্যান্য নগরোন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ধরনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার জন্য এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ধরনের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। কিছু কিছু শহরাঞ্চলে আবার সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়বস্তুর তারতম্য ঘটে। দেখা গেছে, স্থানান্তরকরণ (Migration), মজুরি ও কর্মসংস্থান, বাসস্থান ও পরিকাঠামো, বস্তি অঞ্চল উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তি ঃ

বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে শহরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করার ফলে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জাতি ও পেশার মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সরকারি নগরোন্নয়নমূলক সংস্থা বা বিভাগের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে নগরোন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বনিযুক্তি ও দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ বিষয়ক নানা রকমের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ও তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অসুবিধায় পড়ে। সমষ্টিবাসীকে সংঘবদ্ধ করা ও তাদের মধ্যে সমষ্টিবোধ জাগিয়ে তুলতে সময় লাগলেও অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সমষ্টির প্রয়োজনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে শহরাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীদের স্বালম্বনের পথে উদ্‌বুদ্ধ করে চলেছে। যে ধরনের পদ্ধতি ও কর্মধারার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তাদের স্বনিযুক্তির কর্মসূচি গ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে তা নীচে উল্লেখ করা হল—

➠ শহরাঞ্চলের পশ্চাৎপদ-এলাকার ও বস্তি এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে বিষয় ও চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী চিহ্নিতকরণ।

➠ উদ্যোগী ও দক্ষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করা।

➠ সরকারি ও বেসরকারি নগরোন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন। তাদের বিভিন্ন স্বনিযুক্তি কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপভোক্তা বাছাইয়ের কাজে সহযোগিতা করা।

➠ স্থানীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের সাথে উদ্যোগী প্রশিক্ষনার্থীদের যোগসূত্র স্থাপন করা।

➠ বিভিন্ন স্বনিযুক্তির উদ্যোগীদের সংঘবদ্ধ করে একই বিষয়ের উদ্যোগীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক উদ্যোগী গোষ্ঠী বা সমিতি গঠনে উদ্‌বুদ্ধ করা। তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণের কাজকর্মে যুক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করা।

উপরিউক্ত কর্মধারা বা পদ্ধতি গ্রহণ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নানান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বনের পথ প্রশস্ত করে থাকে। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ সাধারণত সমষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হয়। যেমন— সেলাই, উল বুনন, মোটর গাড়ি মেরামতি, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের নানান বিষয়, কম্পিউটার চালানো ও মেরামতি, টেলিফোন মেরামতি, বিউটিসিয়ান, ফিজিওথেরাপি, বিভিন্ন মেশিন ও যন্ত্রপাতি মেরামতি, হাতের কাজ, তাঁত বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে স্বাবলম্বনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ ঃ

নগরোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা, জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও অভাবের তালিকা প্রস্তুত, স্থানীয়ভাবে কোথায়, কী ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ আছে তা চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনা ও তার বাস্তবায়ন এবং সময়ান্তরে বিভিন্ন কর্মসূচির মূল্যায়ন। এর পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির স্বার্থক রূপায়ণের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসমষ্টির অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যদিকে গ্রামীণ জনসমষ্টির একটি অংশ শহরে ইট-বালি ইত্যাদির জোগানদার হিসাবে, নির্মাণ কর্মের শ্রমিক হিসাবে এবং শিল্প-কলকারখানার অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতে আসেন। যাদের বেশির ভাগ হয় কোনো বস্তি অঞ্চলে অথবা ফুটপাথে দিন কাটান। এই শ্রেণির মানুষের নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান সচরাচর পাওয়া যায় না। এমনকি শহরাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মে এই শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ আশানুরূপ হয় না।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ কিছু কর্মসূচিতে ফুটপাথবাসী ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি, এই ধরনের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্যই কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সামগ্রিকভাবে শহরাঞ্চলের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং বস্তি অঞ্চল উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং সমষ্টিবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল। যেমন—

➠ স্থানীয়ভাবে উদ্যোগী ব্যক্তি বা নেতৃত্ব বেছে নেওয়া ও তাদের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলের জনসমষ্টিকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে যুক্ত করা।

➠ বিভিন্ন পাড়া বা অঞ্চলভিত্তিক যুবসংগঠন, মহিলাসমিতি বা উন্নয়নমূলক সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর দেওয়া নেওয়ার বন্দোবস্ত করা।

➠ বিভিন্ন নগরোন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে কাদের জন্য কী ধরনের সুযোগসুবিধা রয়েছে যে সামগ্রিক তথ্য সংশ্লিষ্ট শহরবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম চিহ্নিত করা ও তা কাজে লাগানো প্রভৃতি।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে শহরবাসীর অংশগ্রহণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এমনকি একবার সম্পাদনযোগ্য কোনো কাজ বা সময়ভিত্তিক অনুশীলনও নয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মতো সমষ্টিবাসীর অংশগ্রহণ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শহরাঞ্চলে সমষ্টিবাসীর অংশগ্রহণের ধরন বা প্রকৃতির তারতম্য থাকে। সামগ্রিকভাবে নগরোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমষ্টির অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে স্বেচ্চাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটি সদর্থক ভূমিকা থাকে।

(ঘ) সংযোজন ও সমন্বয় স্থাপন ঃ

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ ও বাসস্থানের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন বা সংকটমোচনের কাজে কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের নিজস্ব কিছু সীমাবধ্বতা থাকে। স্বেচ্ছাসেবী ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে এবং রাজনৈতিক চর্চার বাইরে অমুনাফা অর্জনকারী সংগঠন হিসাবে সব ধরনের মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সাধারণত কোনো সংশয় থাকে না। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অঙ্গ হিসাবে এলাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা বিভাগের সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নিয়মিত যোগাযোগ করতে হয়। সহভাগী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার সময় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই কোন্ প্রতিষ্ঠান বা সরকারি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা যাবে তার সম্ভাবনার ও যে ধরনের সুযোগসুবিধা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, তার খসড়া রচনার কাজ করে রাখে। শহরে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং উভয়ের সমন্বয়ে শহরাঞ্চল উন্নয়নের কাজে নতুন মাত্রা সংযোজনের জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন মূলক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং পৌরসভার সঙ্গে একযোগে কাজ করার ফলে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কাজকর্মের অনেক বাধা দূর হয়। এমনকি পৌরসভা, সরকারি বিভাগ বা সংস্থার

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

সাথে সমন্বয় স্থাপনের ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুযোগ সুবিধা এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বণ্টনের কাজে অসামঞ্জস্যতা ও উপর্যুপরি বণ্টনের সম্ভাবনা কাটিয়ে তোলা সহজ হয়।

(ঙ) কর্মসূচির মূল্যায়ন ও গতিপ্রকৃতি নিরুপণ ঃ

নগরোন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু বিষয় যেমন লক্ষ্য, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী, সুযোগসুবিধার ধরন, প্রকল্পের মেয়াদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এক-একটি সংগঠন এক-একটি ক্ষেত্রে নানান রকমের কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যেমন মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তি, শৌচাগার, স্বাস্থ্যবিধান, বাসস্থান নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনচেতনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণ করে থাকে। শহরাঞ্চলে এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের নিজস্ব প্রকল্পের সাথে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নানান রকমের উন্নয়নমূলক কাজের মূল্যায়ন ও গতিপ্রকৃতি নির্ণায়ক কাজকর্ম করে থাকে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিকাঠামোর সাহায্যে তাদের কর্মসূচির মূল্যায়ন করে থাকে। যেমন— মাসিক সভার মাধ্যমে উপভোক্তা স্তরে, কর্মচারী স্তরে, সংগঠনস্তরে এবং সংগঠনের প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন দিক নিয়ে চালু কর্মসূচির অগ্রগতি, ত্রুটি-দুর্বলতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে পেশাদারি সংগঠনের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন স্তরে সমীক্ষার মাধ্যমে ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন চলমান কর্মসূচির বিভিন্ন দিক চিহ্নিতকরণ এবং গতিপ্রকৃতি নিরুপণের কাজ করানো যায়। এমনকি ওই ধরনের পেশাদারি প্রতিষ্ঠান সরকারি নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মূল্যায়ন ও তাদের গতিপ্রকৃতির ধরন নিরূপণের মাধ্যমে সরকারের সহযোগী সংগঠনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। নিত্য নতুন সমস্যা ও সামাজিক নানান বিষয় নিয়ে নতুন কর্মসূচি গ্রহণের প্রাক্‌কালে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিভিন্ন দিক চিহ্নিতকরণের জন্য এবং প্রস্তাবিত এলাকার প্রাথমিক অবস্থা নিরুপণের সমীক্ষা (Base line Survey) করার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত নানা রকমের কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সমষ্টির অংশগ্রহণে তার সঠিক পথে এগিয়ে চলার পথে অনেক বাধা দূর হয়। সমষ্টিবাসীর কাছে গুণগত পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সময়মত মূল্যায়ন ও গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

(চ) সম্পদের সদ্‌ব্যবহার ঃ

বিশ্বায়ন, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে নগরজীবনের অর্থনীতিতে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। শহরাঞ্চলের সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হচ্ছে। শহরে, নগরে ও মহানগরের জীবনস্রোতে বিলাস-ব্যসনের ঢেউ লেগেছে। ভোগবাদের যুগে দ্রব্য-সামগ্রীর পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যবধান বাড়ছে। যার ফলস্বরূপ, নিত্যনতুন অপরাধ ও সামাজিক সমস্যার মতো উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকারি সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ্যে ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া, সরকারি অর্থানুকল্যে পরিচালিত নানা রকমের সহযোগিতা মূলক প্রকল্পের নিয়মনীতির বিষয়ে কঠোরতা আরোপিত হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র সরকারি সাহায্য-নির্ভর কর্মসূচি রূপায়ণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমষ্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অভাবের কথা মাথায় রেখে অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের কিছু উদ্যোগ

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

গ্রহণ করে থাকে। স্থানীয়ভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্তি ও সদ্‌ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ও শহরাঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনে তার সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

অন্যদিকে, শহরের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বহু মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে শিক্ষাবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবী মানুষ যেমন থাকেন, অন্যদিকে তেমনি পেশাদার মানুষ যেমন— ডাক্তার, আইনজীবি, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য বিষয়ের দক্ষ ব্যক্তিও থাকেন। বেশির ভাগ মানুষ তাদের নিজস্ব পেশা বা বৃত্তির বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কল্যাণের কাজে উদ্যোগী হয়ে থাকেন। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক এই শ্রেণির মানুষজনকে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট জনগণের উদ্যোগে নানান রকমের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এভাবে স্থানীয় মানবসম্পদের সদ্‌ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টিবাসীর কাছে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের স্বচ্ছল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে সরকারি বা বেসরকারি আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতার ধারা পরিবর্তন ঘটে। কখনো কখনো অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নানান উন্নয়নমূলক উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে সমষ্টির মানুষ তাদের নিজেদের কাছ থেকে চাঁদার মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করে তহবিল গঠনের পথে সহায়তা করে থাকেন। নানা ধরনের কুপন বিলি, বার্ষিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলার আয়োজন, প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থবান, ধনী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী নগরোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণে ব্রতী হয়।

নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী ভূমিকা থাকে। এক একটি প্রতিষ্ঠান যেমন দু-একটি ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রাখে। অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান আবার সুসংহত উপায়ে এক-একটি এলাকার সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কাজকর্মের ও পদ্ধতি প্রকরণের তারতম্য থাকলেও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নগরোন্নয়ন, বিশেষকরে বস্তি অঞ্চল উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমানে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সহাবস্থানের পাশাপাশি আজকাল উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে সহযোগী সংগঠন বা অংশীদারী সংস্থারূপে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত আকার নিয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণের জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমনকি সরকারি উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে প্রকৃত অসহায় ও পিছিয়ে পড়া শহরবাসীর কাছে কল্যাণমূলক উদ্যোগ পৌঁছে দিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যার ফলস্বরূপ শহরাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নানান রকমের কাজকর্মে যুক্ত হয়ে থাকেন। এলাকাভিত্তিক গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে স্বেচ্চাসেবী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বনিযুক্তির প্রকল্প ও উৎপাদনশীল উদ্যোগগুলিতে সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাবান বেকার যুবক-যুবতীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও হাতেনাতে কাজ শেখানোর সুযোগ দিয়ে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

M - 3 # D:\ Jobs-1 \ Netaji 07 \ **MSW-10B \ MSW10B-2** P6.5 # 4th Proof # 28-6-07

১৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি

(ক) D. Paul Chowdhury — Voluntary Social Welfare in India.
Sterling Publishers Pvt. Ltd. Jullandhar.

(খ) K. D. Gangrade — Social Transformation : Role of NGO,
Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi.

(গ) V. M. Kulkarni — Voluntary action in a developing Society.
Indian Institute of Public Administration.
New Delhi.

১৪.২. প্রশ্নাবলি

(ক) শহুরে সমষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝেন? শহুরে সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী?

(গ) 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠান' কথাটি ব্যাখ্যা করুন এবং শহুরে সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

MSW 11

একক ১ ☐ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

গঠন

১.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা

১.২ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

১.৪ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ

১.৫ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১.৬ অনুশীলনী

১.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা

রাব্ এবং সেল্‌জিঙ্কের মতে একটি সামাজিক সমস্যা হল, "মানবিক সম্পর্কের একটি সমস্যা যা সত্যই সমাজকে সন্ত্রস্ত করে অথবা অনেক মানুষের গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে বাধা প্রদান করে"। তারা আরও বলেছেন সংগঠিত সমাজ মানুষের মধ্যের সম্পর্ককে নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয় ; যখন সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ভুল করতে থাকে, যখন এর আইনগুলি লঙ্ঘিত হয় ; যখন এর মূল্যবোধ প্রজন্মান্তরে ভেঙে পড়ে ; যখন চাহিদার কাঠামোও বিঘ্নিত হয় ; তখন যে সব সমস্যা ঘটে তাকে সামাজিক সমস্যা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কিশোর অপরাধকে কেন্দ্র করে সমকালীন চিন্তা শুধুমাত্র অংশত প্রমাণ করতে পারে যে, বিচ্যুতি হল অপরাধের প্রবেশদ্বার। অথবা বিচ্যুতি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শনস্বরূপ। এটি আরও একটি ভয়ের কারণ যে সমাজ সঠিকভাবে তার যুব সম্প্রদায়ের কাছে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। একে অন্য কথায় সমাজের ভাঙন হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

সামাজিক সমস্যাকে অন্যভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ওয়ালশ্ এবং কার্ফের মতে সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সামাজিক আদর্শের থেকে বিচ্যুতি যা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফলে সমাধানযোগ্য হতে পারে। এই সংজ্ঞার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে।

১. এমন একটা অবস্থা যা আদর্শ অবস্থার থেকে তুলনায় হীনতর। অর্থাৎ যা অবাঞ্ছিত বা

অস্বাভাবিক এবং ২. গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় যা প্রতিকারের উপায়স্বরূপ।

মাদকের অপব্যবহার, অত্যধিক সুরাপান, সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অপরাধ ব্যক্তিগত সমস্যা নয় কিন্তু এগুলি সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এর বিশ্লেষণ ব্যক্তির/গোষ্ঠীর পরিবেশের মধ্যেই নিহিত থাকে। এর অপরপক্ষে, জনসাধারণের জন্য তাই যা সমাজকে সামগ্রিকভাবে বা সামাজিক জীবনের কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সমাজতাত্ত্বিকের উদ্দেশ্য হল কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতেও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় তা বোঝা, বিভিন্ন সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের আদর্শরূপ বোঝা এবং কীভাবে মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হন, ও কীভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য পুনর্গঠন ও পুনর্সংগঠিত করা প্রয়োজন তাও পর্যবেক্ষণ করা।

১.২ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

সামাজিক সমস্যা হল ব্যবহারিক বিন্যাস অথবা অবস্থা যা সামাজিক পদ্ধতির মধ্য থেকে উঠে আসে এবং যা আপত্তিকর অথবা অনভিপ্রেত বলে সমাজের অনেক সদস্যের দ্বারা বিবেচিত হয়। এবং যা সেই সদস্যরা মনে করে সংশোধনমূলক নীতি, পরিকল্পনা এবং পরিষেবা এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয়।

সামাজিক সমস্যা তখনই উদ্ভূত হয় যখন সম্প্রদায়ের বেশি সংখ্যক সদস্য যৌথভাবে যাকে আপত্তিকর বলে বিবেচনা করে। এভাবে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিন্দনীয় বলে মনে করে না সেগুলিকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মদ্যপান করাকে যদি সমাজ আপত্তিকর না মনে করে, তাহলে একে কখনোই সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না। কিন্তু যখন সমাজ মদ্যপানের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলিকে আলোচনা করে এবং চিহ্নিত করে, এর ফলাফল এবং খারাপ দিক নিয়ে গবেষণা করে, নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করে তখন একে সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, এমনকি যদি প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তিত নাও হয়।

সামাজিক সমস্যার পরিবর্তন ঘটে তখনই যখন কোনো বিশেষ ব্যবহারের আদর্শরূপের ভিন্ন বিশ্লেষণ হয়। যেমন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানসিক অসুস্থতাকে পাগলামি বলেই দেখা হত কিন্তু এখন এটিকে বিচ্যুত ব্যবহারের একটি রূপ হিসাবে দেখা হয় যার মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

গণমাধ্যমগুলি (যেমন, খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিয়ো ইত্যাদি) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনীয় তৎপরতা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক সমস্যাকে সমাজের মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিদ্বন্দ্বের সমস্যা ভারতের অস্পৃশ্যতার সমস্যার থেকে আলাদা।

সামাজিক সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে ভিন্নতর। সমকালীন সামাজিক সমস্যাই সমাজের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যাগুলিকে গোষ্ঠীবন্ধ পদ্ধতি এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রভাবের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এভাবে, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যাই আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুত ঘটনা।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যারই উদ্ভবের একটি সাধারণ ভিত্তি আছে।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভূত।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যার ফলাফলই সামাজিক। অর্থাৎ তারা সমাজের সব অংশকে প্রভাবিত করে।

★ সামাজিক সমস্যার দায়ও সামাজিক। অর্থাৎ, এর সমাধানের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থা থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাসমূহ যে-কোনো ধরনের সমাজেই ঘটে—সরল (ক্ষুদ্রাকার, বিচ্ছিন্ন, সমরূপ, যার মধ্যে দৃঢ় গোষ্ঠীঐক্য থাকে এবং যা খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়) এমনকি জটিল (যেখানে নৈর্ব্যক্তিক গৌণ সম্পর্ক দেখা যায়, নামহীন ব্যক্তি, একাকীত্ব, উচ্চহারে সচলতা, প্রবলমাত্রায় বিশেষীকরণ এবং যেখানে পরিবর্তন হয় দ্রুত)। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে যেখানেই সম্পর্ক প্রভাবিত হয় কতগুলি গোষ্ঠীবন্ধ মানুষের মধ্যে, যেখানে মানিয়ে চলার প্রবণতা কম এবং দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে সেখানেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

রিয়েনহার্ট সামাজিক সমস্যার গঠনে তিনটি উপাদানের ওপর আলোকপাত করেছেন।

(১) স্বার্থের পৃথকীকরণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তার কার্যাবলি ঃ

মানুষের সমাজেও যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার স্বার্থের সংঘাত হয়, সেখানে যত বেশি অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ততই ত্রুটিপূর্ণ সমন্বয় ঘটে। এই নীতিটিতে যন্ত্রাংশের সঙ্গে মানবিক সমাজের মিল পাওয়া যায়। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অপরাধ সেই সামাজিক সমস্যা যা বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে গড়ে ওঠে।

(২) সভ্যতার উন্নতি বা সামাজিক পরিবর্তনের পরিসংখ্যার ত্বরান্বিতকরণ ঃ

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক নবপ্রবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যন্ত্রের নবপ্রবর্তনের ফলে অনেক প্রচলিত কর্মক্ষেত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রব্রজন ঘটেছে এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে। অর্থাৎ বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ফলে যে কাঠামোগত ও কার্যকলাপের অপসমন্বয় ঘটেছে তার থেকেই নানা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে।

(৩) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টির উন্নতি ঃ

প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য যখন থেকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির উন্নতি ঘটেছে তখন থেকে যেসব বিষয়বস্তুকে আগে সরল মনে করা হত তা এখন মানুষ ও সমাজের প্রাকৃতিক নানান অবস্থার ফলস্বরূপ বলে অভিহিত করা হয়।

১.৪ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ

ক্লারেন্স মার্শাল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরনের রূপের উল্লেখ করেছেন।

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভূত।

(ii) যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে।

(iii) যেগুলির উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য। এবং

(iv) সমাজের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে যেগুলি সৃষ্টি হয়।

ফ্যুলার এবং মাইয়ার্স তিন ধরনের সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন—

(ক) প্রাকৃতিক সমস্যা ঃ যদিও এই সমস্যাগুলি সমাজকে প্রভাবিত করে তবুও এর কারণসমূহ মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যেমন—বন্যা বা খরা।

(খ) উন্নতিসাধক সমস্যা ঃ এই সমস্যাগুলির প্রভাব সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকলেও এর সমাধান সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। যেমন—অপরাধ, দারিদ্র্য এবং মাদকাসক্তি।

(গ) নীতিগত সমস্যা ঃ এই সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে কোনো ঐক্যমত নেই। যেমন—জুয়াখেলা বা বিবাহবিচ্ছেদ।

১.৫ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যদিও সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত মনোগত একটি বিষয় তবুও এগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা যায়। সমস্ত ধরনের সামাজিক সমস্যার বিশ্বজনীন পর্যালোচনার জন্য কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(ক) সামাজিক অসংগঠন আলোচনা পদ্ধতি ঃ সমাজের একটি অবস্থাকে বলে সামাজিক অসংগঠন। এই অবস্থায় কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বা সামাজিক স্থিতাবস্থা বা বিধিবৎ বা অবিধিবৎ আদর্শ কাঠামোটি ভেঙে পরে। এই সময়ে সহযোগিতার, সাধারণ মূল্যবোধ, ঐক্য, নিয়মানুবর্তিতা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করার সুযোগের অভাব ঘটে।

শক্তির, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদির সামাজিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক অসংগঠন ঘটে। এর ফলে, পূর্ববর্তী কাঠামোবিন্যাস প্রযুক্ত থাকে না এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত রূপগুলিও আগের মতো কার্যকরী থাকে না। সমাজের এই অরাজক অবস্থা, যার থেকে নীতিহীনতা, ভূমিকা দ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্ব, নীতিভ্রষ্টতার সৃষ্টি হয়। এবং এগুলি বাড়লেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিবারের অন্তর্বর্তী এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে প্রচলিত নিয়ম ছিল সেগুলির অবলুপ্তি ঘটছে। এর ফলে, অনেক মানুষ অসুখী হয় ও নৈরাশ্যে ভুগতে শুরু করে। এটি একটি সামাজিক অসংগঠনের উদাহরণ। যেখানে জীবনের প্রাথমিক কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় যার জন্য ঐতিহ্যবাহী নীতিসমূহ ভেঙে পড়ে। এর ফলে অসন্তোষ ও মোহমুক্তি ঘটে।

(খ) সাংস্কৃতিক বিলম্বন আলোচনা পদ্ধতি ঃ সাংস্কৃতিক বিলম্বন এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে সাংস্কৃতিক কিছু অংশে পরিবর্তন দ্রুত হয় কিন্তু তুলনায় অন্য সংযুক্ত অংশে একই হারে পরিবর্তন ঘটে না। ফলে, ঐক্যসাধনে এবং সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের জন্য বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত হারে পরিবর্তিত হয় অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায়। সাংস্কৃতিক বিলম্বন তত্ত্বে মনে করা হয় যে বিশেষত আধুনিক সমাজে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দ্রুত হারের তুলনায় রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, পরিবারগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ধীরে হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক বিলম্বন কী ভূমিকা নেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পায়নের দ্রুতহারের জন্য কিছু মানুষ জাতি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে তারা অন্য নীচু জাতিভুক্ত মানুষের সঙ্গে কাজ

করতে চাইতেন না এবং সেক্ষেত্রে দরিদ্র ও বেকার থাকতেও তাদের আপত্তি ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ সে কারণে সাংস্কৃতিক বিলম্বনের শিকার বলা যেতে পারে।

(গ) মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব আলোচনা পদ্ধতি : মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যবহারের সাধারণ নীতি। এই মূল্যবোধের প্রতি গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ আবেগমথিত থাকে এবং এই মূল্যবোধ মেনে চলার ক্ষেত্রে গভীর সদর্থক দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে। এবং প্রত্যেক কাজ ও ক্রিয়াকলাপকে তারা ওই মূল্যবোধের সাপেক্ষে বিচার করে থাকে। গোষ্ঠীর দ্বারা স্বীকৃত মূল্যবোধকে ওই গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য মেনে চলবেন এটাই মনে করা হয়। সুতরাং মূল্যবোধ হয় ব্যবহারের একটি সাধারণ নীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সাম্য বিচারব্যবস্থা বা নীতিপ্রণয়ন, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, সচলতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আবেগ ইত্যাদির কথা। মূল্যবোধ দ্বন্দ্বের প্রবক্তারা যেমন—ওয়ালার, ফুলার, কিউবার ও হার্পার মনে করেন যে, সামাজিক সমস্যার উৎস ও উন্নতির জন্য মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জরুরি। ওয়ালার যেমন উল্লেখ করেছেন সাংগঠনিক ও মানবিক মূল্যবোধের কথা। সাংগঠনিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোড় দেয় তেমন অন্যের কষ্টের মীমাংসার সুরাহার কথা বলে।

(ঘ) ব্যক্তিগত বিচ্যুতির আলোচনা পদ্ধতি : সামাজিক নীতির অননুগমনকেই বিচ্যুতি বলে। এই ব্যবহার অস্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গো তুলনীয় নয় কারণ অস্বাভাবিক ব্যবহার মানসিক রোগের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যারা সামাজিক নীতির থেকে বিচ্যুত হন তারা যে মানসিক অসুস্থতারই শিকার হবেন এমন কোনো কথা নেই। সামাজিক সমস্যার আলোচনায় ব্যক্তিগত বিচ্যুতিতত্ত্ব মনে করে যে, যেসব নীতি ভেঙে পড়ছে এবং এর ফলে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা আলোচনার দরকার আছে। এই তত্ত্বে বিচ্যুতিকারীর ব্যবহারের পেছনে প্রেরণার আলোচনা দরকার বলে মনে করা হয় কারণ এর ফলেই সামাজিক সমস্যা ঘটে।

(ঙ) বিধিশূন্যতার তত্ত্ব : মার্টনের দ্বারা প্রযুক্ত এই তত্ত্বে বলা হয় যে বিধিশূন্যতা এমন একটি সামাজিক অবস্থা যেখানে আপেক্ষিকভাবে মূল্যবোধ, নীতির অভাব বা অস্পষ্টতা আছে। মার্টন বলেছেন, "the social problem arises not from people failing to live upto the requirements of then social statuses but from the faulty organization of these statuses into a reasonably coherent social system." বলতে একদিকে সামাজিক ঐক্য যৌথ আদর্শের ঐক্যসাধন বোঝায় অন্যদিকে বিধিশূন্যতা হল অস্পষ্টতা, নিরাপত্তাহীনতা, নীতিহীনতা পূর্ণ একটি অবস্থা। মার্টনের মতে লক্ষ্য ও উপায় এই দুই-এর মধ্যে অসংগতি ও ফলস্বরূপ যে চাপ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উপায়ের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার ঘাটতি ঘটে তাকেই বিধিশূন্যতা

বলা যায়। মার্টনের মতে মানুষ এই অসংগতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় এক সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উপায় অথবা দুটিকেই বাতিল করে দিয়ে।

উপসংহার : শেষে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক-এর ভূমিকা হলো সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতা গড়ে তোলা, সামাজিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা, তত্ত্ব গঠন করা, এই সমস্যাসমূহের প্রভাব আলোচনা করা এবং এর কোনো পরিবর্তন সম্বন্ধে অন্বেষণ করা যাতে সমস্যার সমাধান করা যায়।

১.৬ অনুশীলনী

(i) সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিন। এর প্রকৃতি ও কারণ ব্যাখ্যা করুন।

(ii) সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনা করুন।

একক ২ ☐ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা, বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল, বিচ্ছিন্নতা, বাল্যবিবাহের সমস্যা, পণপ্রথা

গঠন

২.১ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা

২.২ বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল এবং বিচ্ছিন্নতা

২.৩ বাল্যবিবাহ

২.৪ পণপ্রথা

২.৫ অনুশীলনী

২.১ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা

সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী হল পরিবার। এটি সমাজের সরলতম এবং প্রাথমিক একটি রূপ। প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার হল বিশ্বজনীন। পরিবারব্যবস্থা চিরস্থায়ী এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিব্যাপক। ম্যাকাইভারের মতে—পরিবার হল "a group defined by sex relationship sufficiently precise and ending to provide for the procreation and upbringing of children."

বিবাহ বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত এক সম্বন্ধ গড়ে তোলা যায় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বা অনেক পুরুষ ও এক মহিলা বা অনেক মহিলা ও এক পুরুষের মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হল স্থায়ী যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে ভবিষ্যতে পিতৃ-মাতৃত্ব প্রদান সম্ভব হয়। বিবাহ হল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যাতে তাদের মধ্যে সমাজস্বীকৃত ও সমর্থিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের মিথস্ক্রিয়া গড়ে ওঠে এবং যে সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সন্তানদের সমাজে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিবাহকে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে বলতে হয় এটি একটি এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দু-য়ের বেশি ব্যক্তির মধ্যে সমাজস্বীকৃত উপায়ে পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রাক্ শিল্পভিত্তিক বা কৃষিপ্রধান সমাজে বেশিরভাগ দ্রব্যাদির উৎপাদন সংগঠিত হত পরিবারের

পিতামাতা, সন্তানাদি ও অন্যান্য সদস্যের মধ্য দিয়ে। যেহেতু এই সময়ে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনকেন্দ্র ছিল পরিবার (মাঝে মাঝে কিন্তু বেশি উৎপাদন হত কাছাকাছি এলাকায় থাকা বাজারের জন্য) সেহেতু ওই সময়ের পরিবার ছিল ভোগ্য উৎপাদনকারী একক বা উৎপাদনের প্রাথমিক একক।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলি ধীরে ধীরে তাদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলে, পরিবারগুলি বাইরের কর্মসংস্থানের ওপর বেশি নির্ভর হতে থাকে যার ফলে তারা ক্রমশ তাদের শ্রম বড়ো বড়ো জোতদারের কাছে বিক্রি করতে শুরু করে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সংগঠনে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে কলকারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। মানুষ আগে যে দ্রব্যাদি তাদের পরিবারের ভেতরেই উৎপাদন করত তা তারা তাদের অর্জিত আয়ের মাধ্যমে কেনার আশা করতে শুরু করে।

ভারতেও সনাতনী যৌথ পরিবার ছিল উৎপাদন ও ভোগের একটি একক। বর্তমানে পেশার বিভিন্নতায়, যৌথ পরিবারের নানা সমস্যায় তারা ভাগ্যান্বেষণে পরিবারের বাইরে কাজ খুঁজতে শুরু করছে। আজকের পরিবার শুধুই ভোগের একটি এককে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে, পরিবারগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক কাজ হল ভোগের একক হিসাবে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণের ফলে মেয়েরা সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক মহিলা শুধুমাত্র গৃহকর্ত্রী হয়ে গেছেন।

অনেক পশ্চিমি দেশে, যৌন সম্পর্কের নীতি বেশ শিথিল হয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় সেখানে প্রাক্‌বিবাহ যৌন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের প্রথামাফিক আদর্শের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহারের একটা বড়ো ফাঁক ধরা পড়ে। এই পরিবর্তনের একটি কারণ হল এই যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশ ক্রমশ বাড়ছে এবং যৌন ভূমিকায় (sex roles) ছোটো ছোটো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটেই চলছে ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে। মূলত সেইসব মহিলারাই বাড়ির বাইরে কাজ করতে আসেন যাদের স্বামীরা তাদের সাহায্য করতে পারেন না বা অনিচ্ছুক। আজও, কর্মরত মহিলারা বেশিরভাগই আসেন উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। ভারতে, মেয়েদের শিক্ষার ওপর বিয়ের বয়সে বৃদ্ধি, মেয়েদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান, সামাজিক স্বীকৃতি বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে ইত্যাদি ব্যাপারে আরও বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে ; এর ফলে পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে।

ভারতে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলি পরিবার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। তবে পরিবারের কাঠামো বা কার্যাবলি বা স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করেছে। মিলটন সিঙ্গার পাঁচটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন যেগুলির প্রভাব পরিবারের ওপর সবচেয়ে

বেশি। এগুলি হল শিক্ষা, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বিবাহব্যবস্থায় পরিবর্তন বিশেষ করে বিয়ের বয়স এবং আইনি ব্যবস্থার ফলে পরিবারের ওপর প্রভাব পড়েছে।

হয়তো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল বিশেষ করে পশ্চিমি দেশগুলির ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের হারে নাটকীয় বৃদ্ধি। শিল্প সমাজে নগর এলাকার বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান হারের প্রতিফলনস্বরূপ—

(১) ধর্ম থেকে বিবাহের বিচ্ছিন্নতা।

(২) নারী জাগরণ।

(৩) মূল্যবোধের পরিবর্তন যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত খুশির ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

পরিবারের বিশেষজ্ঞরা বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ক্রমবর্ধমানতার কথা ভেঙে বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে "সেরিয়াল ম্যারেজ" (serial marriage) অ্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের ওপর ব্যক্তিগত, নৈতিক বিচার যাই হোক না কেন, অনেকেই একে সামাজিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক ফল বলে মনে করতে শুরু করেছেন। এর বৃদ্ধির জন্য যে উপাদানগুলি দায়ী সেগুলি হল, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী জাগরণ, মহিলাদের পরিবারের বাইরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ছোটো পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা। শিল্পোন্নত সমাজে, নববিবাহিত দম্পতি কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চান না। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত মালিকানায় উপদেষ্টা (counsellor) আছেন যারা কোনো বিবাহবিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছুক দম্পতিকে ওই সময়ের মধ্য দিয়ে পার হতে সাহায্য করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিবাহবিচ্ছেদ এখন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেতে চলেছে। বিবাহ ও পরিবারের আরও একটি বিকল্প হল অবিবাহিত থাকা। এই পরিস্থিতিও এখন আর সামাজিক কলঙ্ক হিসাবে গণ্য হয় না।

সমাজান্তরে পরিবারের কার্যাবলির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারের পূর্বতন কার্যাবলিকে গ্রহণ করেছে সেগুলি হল—ধর্ম, শিক্ষা, বৃদ্ধাবাস। এগুলি পশ্চিমি দেশগুলির পক্ষে যতটা সত্যি ভারতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তবে আধুনিক যুগের নানা পরিবর্তন প্রায় প্রত্যেক সমাজকেই এখন প্রভাবিত করছে। সে কারণে পরিবার, যা কিনা সমাজের ভিত্তি তা এই ধরনের প্রভাব থেকে কখনোই বিমুক্ত নয়।

২.২ বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল এবং বিচ্ছিন্নতা

আধুনিক পরিবার ব্যবস্থা (সবচেয়ে আকর্ষণীয় সমস্যা যার) সম্মুখীন হয় তা হল এর অস্থায়িত্ব। সনাতনী পরিবার ছিল স্থায়ী ব্যবস্থা, যার ভাঙনের কথা খুব কমই ভাবা যেত এবং যা খুব সহজসাধ্যও

ছিল না। সনাতনী পরিবার সারা বিশ্বে একটি একক হিসাবে প্রতিভাত হত। পরিবারের বাইরে মহিলাদের কোনো আশ্রয় ছিল না। পরিবারের সদস্যদের পেশা স্থিরীকৃত থাকত এবং প্রজন্মান্তরে তা প্রবাহিত হত। এই সমাজে সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রও সীমিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সদস্যদের ওপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ অনেক কমে এসেছে। যুবক প্রজন্ম তাদের জীবনে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রভাব পছন্দ করে না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যেরও অভাব ঘটছে। একে অপরের ওপর বিশ্বাসও কমে আসছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশের ফলে পরিবারে সন্তানদের উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস বা ভরসাও কমে আসছে। বিবাহের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। যৌন সম্পর্কে সনাতনী আনুগত্যও বিপরীতভাবে প্রভাবিত করছে। প্রাক্ বিবাহও বহির্বিবাহ সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন অনৈক্যও আছে। পারিবারিক পেশা বা শিল্পের কোনো ক্ষেত্র আর নেই। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা আলাদা আলাদা পেশায় নিযুক্ত। সনাতনী পরিবার ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ যৌথ অংশগ্রহণ, বিশেষীকৃত বিভিন্ন সংস্থার বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রাথমিক চরিত্রেও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিক পরিবারের কাঠামোগত ও কার্যাবলির হ্রাসমানতার ফলে। যেমন—রাষ্ট্র প্রাক্ জন্মসংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছে, দামি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারখানা ও অফিসে কর্মসৃষ্টি হচ্ছে, অবসরকালীন আমোদ-প্রমোদের জন্য ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠছে। যদি মানুষ পরিবার ব্যবস্থার বাইরে শিক্ষার ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা পায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক পরিবার ব্যবস্থাই পরিবারের ভাঙনের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে।

বিবাহবিচ্ছেদ কেন হয় ?

বিবাহিত দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে চলার পরই তার ফলস্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা শক্ত বিবাহবিচ্ছেদের সঠিক কারণগুলি কী কী—কারণ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার চরম ক্ষেত্রেও অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। তবে বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর কিছুদিকের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের হারের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ কোর্টে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য উপযোগী যে কারণগুলির উল্লেখ করা হয় তা বিবিধ। তার মধ্যে মুখ্য হল—যৌন অনৈতিকতা, নৃশংসতা, অসহযোগিতা, বন্ধ্যাত্ব, যৌন রোগ ইত্যাদি। এগুলি যদিও বিবাহবিচ্ছেদের বহির্কারণ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যার ওপর আধুনিক পরিবার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিবাহ ঘটে, কখনোই আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়। আধুনিক পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী এবং

ব্যক্তিকেন্দ্রিক যা পরিবারের ভিত্তির শক্তিকে শিথিল করে দিয়েছে। আধুনিক পরিবারের চাহিদা সম অংশীদারিত্ব, যা কিনা পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থাকে কম স্থায়ী করে তুলেছে। পরিবার হলো জীবনে প্রয়োজন স্থিতিশীল ভিত্তি, ত্যাগ করার মানসিকতা, ব্যক্তিগত সদয়তা, সামাজিক দায়িত্ব পালন। এবং যেহেতু ক্রমশ এইসব গুণের অবনতি হচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদও ক্রমশই বাড়ছে।

(২) সামাজিক সংরক্ষণশীলতার হ্রাসমানতা ঃ পরিবারের স্থিতিহীনতার একটি বড়ো কারণ পরিবারের কার্যাবলির পরিবর্তন। অর্থনীতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক চাপের ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে দম্পতির মধ্যে একে ওপরের সঙ্গে মানিয়ে চলার নিরন্তর চেষ্টা থাকত। আজকে সেই প্রয়োজনীয়তা ও চাপ দুটোই কমে এসেছে। কলকারখানা নির্ভর উৎপাদন পরিবারের অর্থনৈতিক একক হিসাবে চলার ক্ষেত্রকে বাতিল করেছে। ফলে মহিলারাও এখন আয় করেন এবং পুরুষ সঙ্গীটির ওপর আর তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নন। সুতরাং যখনই তিনি দেখেন যে তার পছন্দ অনুযায়ী তার পুরুষটি চলছেন না তখনই তিনি তার থেকে আলাদা হওয়ার কথা ভাবতে পারেন। এই সময়ের নগরজীবনে যেহেতু কেউ কারো কথা তেমনভাবে না তাই সমাজও এইসব ক্ষেত্রে মহিলাটির ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। যেহেতু পরিবার ব্যবস্থা নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকার জন্য সেহেতু আধুনিক পরিবার, যার সম্পর্কের ভিত্তি তেমন মজবুত নয়, তা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে। পূর্বে অর্থনীতিক কারণে মহিলারা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল ছিল যা এখন আর একইভাবে লক্ষ করা যায় না। তা ছাড়া পেশায় বাণিজ্যিকীকরণের ফলে মহিলা, পুরুষ উভয়কেই বস্ত্র, খাদ্য ও আমোদ-প্রমোদের জন্য পরিবারের ওপর নির্ভরশীল করে রাখেনি। শিল্পোন্নত সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যতই মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে ততই পরিবারের স্থিতিহীনতা বাড়বে।

হিন্দু বিবাহ আইনের ১৯৬৫-এর সেকশন ১৩-তে বলা হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়—(i) ব্যভিচার, (ii) নৃশংসতা, (iii) বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা/ছেড়ে চলে যাওয়া, (iv) ধর্ম পরিবর্তন করা, (v) মানসিক রোগ যা চিকিৎসাসাধ্য নয়, (vi) কুষ্ঠরোগ, (vii) যৌনসংক্রমক রোগ, (viii) সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া, (ix) মৃত্যু হতে পারে এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি, (x) আইনগতভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার সুপারিশ সত্ত্বেও পৃথকভাবে না থাকা (xi) বিবাহোত্তর অধিকার বলবৎ না করা।

১৯৭৬-এর সংশোধিত বিবাহ আইনে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই ছিল আইনত বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার বৈধ পথ। সেকশন ১৩ এবং ১০(১) (ক) দুটিতেই বলা হয় যে বিবাহবিচ্ছেদের আর্জি জানানোর দু-বছর আগে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেই আইনত বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

বিবাহোত্তর বনিবনা না হলেই যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তা দূর করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে—

(১) যে-কোনো ধরনের অপমানজনক মানসিকতা দূরে সরাতে হবে।

(২) অপ্রয়োজনীয় উত্তেজক উপাদানকে সরিয়ে দিতে হবে।

(৩) নতুন আনন্দদায়ক জিনিস খুঁজতে হবে।

(৪) পরস্পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে শিশুর জন্মদান।

(৫) নিজের জীবনসঙ্গীকে বোঝা।

(৬) নিজের সঙ্গীটির সঙ্গে পরিবারের সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করা কিন্তু অন্তহীন তর্ক না করা।

(৭) পারস্পরিক ভালো লাগার দিকগুলি খুঁজে বের করা এবং একসঙ্গে কোনো পরিকল্পনা তৈরি করা।

(৮) অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ছেড়ে দেওয়া। নিজের খুশির জন্য সঙ্গীটির চাহিদা বিসর্জন না দেওয়া, যাতে তার মধ্যে কোনো দুঃখের জন্ম না হয় তা দেখা।

(৯) পরিবারের ভালো জিনিসটিকে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া। শুধু নিজের কথা না ভাবা।

২.৩ বাল্যবিবাহ

ভারতে বাল্যবিবাহ প্রায় এমন একটি প্রথা হিসাবে প্রচলিত যে সাধারণ মানুষ এই প্রথাপালন অবশ্য কর্তব্য হিসাবে পালন করে। একটি জনপ্রিয় গবেষণায় দেখা গেছে যে গত ৩৫ বছরে এই রীতি পালনে তেমন কোনো তফাৎ ঘটেনি, বিশেষ করে রাজস্থানের মতো অঞ্চলে যেখানে খুব অল্প বয়সে নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিয়ে হয়। এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই রীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। যদিও সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এই সামাজিক অন্যায় প্রতিকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। বাল্যবিবাহের কুফল প্রচারের মাধ্যমেও এই প্রথাপালনে শিথিলতা আনা যেতে পারে। শিক্ষার প্রসার ও গণমাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষের মনে এই বিষয়ে চেতনা ক্রমশ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাল্যবিবাহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য নানান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রচার চালাচ্ছে এবং এই সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজারও চেষ্টা তারা চালাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল না। এই সময়ে নানা ধরনের বিবাহব্যবস্থার প্রচলন ছিল। যেমন—গন্ধর্ব বিবাহ (ভালোবাসা বিবাহ), অসুর বিবাহ (জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা) ইত্যাদি। তবে, বাল্যবিবাহ রীতি কোনোভাবেই ওই সময়ে দেখা যায়নি। মনে করা হয় যে মধ্যযুগ থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক যুগে বিশেষ করে ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে যে একটি মেয়ের বিয়ে হতে পারে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বেড়ে ওঠার পর। এবং তার বাবার বাড়িতে থাকাকালীনই তার শারীরিক বৃদ্ধি হওয়া উচিত। সেখানে উল্লেখ করা আছে যে একটি পুরুষের উচিত সম্পূর্ণভাবে বেড়ে ওঠা মহিলাকেই বিয়ে করা। অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে একজন নারীর তখন বিয়ে করা উচিত যখন সে তার বাল্যকাল পেরিয়ে এসেছে।

ভারতে ১৮৬০-এর দশকে মনে করা হত যে মেয়েদের ৮ অথবা ৯ বছর বয়সের আগেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুগান্তকারী পথ দেখিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ তাদের সামাজিক-সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৮৬০-এর শেষভাগে কিছু সাফল্য এসেছিল যখন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে (Indian Penal Code) ১০ বছরের কম বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংযোগ আইনত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। তবুও ১৮৮০-এর আগে অবধি বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে জনসাধারণের চোখে ধরা পড়েনি। সম্মতি দানের বয়স সংক্রান্ত বিলের মাধ্যমে এই প্রথাটি জনসাধারণের চোখে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে ধরা দেয়। ১৮৮৬-তে হিন্দু ইনফ্যান্ট ম্যারেজ-এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করা হয়। মিরাটের জনসাধারণের দ্বারা তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এই আইন প্রণয়ন করেন ১৯২৭ সালে। সেখানে বলা হয় যে-কোনো মেয়ের ১২ বছর বয়স না হওয়া অবধি তার বিবাহ সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালে চাইল্ড ম্যারেজ রেস্‌ট্রেন্ট অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহের সঙ্গো সংযুক্ত অনৈতিক দিক যেমন বিবাহিত জীবনের ফলে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ের জীবনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

এই আইনে বলা হয়—

(১) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বলতে বোঝায় ২১ বছর বয়সের কম এবং মেয়ের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা ১৮ বছরের নীচে।

(২) বাল্যবিবাহ বলতে বোঝায় এমন বিবাহক্ষেত্র যেখানে দম্পতির মধ্যে যে কোনো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক।

তবে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে এই দুটি প্রস্তাবমতো কোনো বিবাহ না হলে, এই আইনে তা অবৈধ বলা যায় না। কারণ এই আইন অনুযায়ী এই প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে বৈধতা বা অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

বাল্যবিবাহের ফলে শিশু তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন—স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার এবং বিবাহের জন্য সঙ্গী বাছার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার। বাল্যবিবাহের ফলে স্বাস্থ্যহানি এবং শিক্ষার ক্রমহ্রাসমানতা মহিলাদের সমস্যাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করেছে। রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থা এবং তার মধ্যে শিথিলতা, অস্পষ্টতা, দ্বন্দ্ব, বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্য, সম্মতিদানের বয়স এবং বিবাহের বৈধতা সমালোচনাযোগ্য সারা দেশব্যাপী এই প্রথার প্রসারের জন্য।

২.৪ পণপ্রথা

একটি মেয়ে যখন বিয়ের পর তার বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীর বাড়ি যায়, তখন যে উপহার দেওয়া হয় তাকে পণ নামক প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি একটি মোটা দামের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নানান ধরনের হিংসাত্মক ব্যবহার (যখন কন্যাভ্রূণ হত্যা, আত্মহত্যা, বধূনির্যাতন, বধূ হত্যার মতো সব ঘৃণ্য অপরাধ। গ্রাম ও শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পণপ্রথা একটি সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বিবাহের নিয়ম যেমন, জাতি অন্তর্বিবাহ, গোত্রবহির্বিবাহ এবং অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহকে ভুলভাবে বিশ্লেষণের ফলে পণপ্রথা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই নিয়মগুলির ফলে বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রী নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে জাতির মধ্যে বিবাহ ও গোত্রের বাইরে বিবাহই কাম্য।

পণপ্রথার প্রচলনের জন্য কোন প্রথাগুলি দায়ী তা এককথায় বলা শক্ত। কিন্তু আমরা একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। এর মধ্যে কতগুলি বিবাহের নিয়মকানুন, জাতি, ক্রমোচ্চবিন্যাস, পিতৃতন্ত্র, পিতৃপুরুষ, মহিলাদের হ্রাসমান মর্যাদা, আধুনিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ত্রুটিপূর্ণ অহংকার চেতনা, কিছু মানুষের অর্থনীতিক উন্নতি। যেহেতু পণপ্রথা একটি জটিল গতিময় সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে সেহেতু এর দ্রুত সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা দরকার। শুধুমাত্র আইন প্রণয়নে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আইন ব্যবস্থারও নানান ত্রুটি থাকায় তা অতিক্রম করা সবসময় সম্ভবপর নয়। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আন্দোলনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এই সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে

হাতেকলমে দেখাচ্ছে কীভাবে খুন, আত্মহত্যা, অত্যাচার এবং হয়রান করার মতো ঘটনা পণপ্রথার সঙ্গো সংযুক্ত। কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক বয়কটও হয়ে থাকে।

এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে যা দরকার তা হল এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা কারন এর ফলে বাস্তবে বহু পরিবার, হাজার হাজার মহিলার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সমাধানযোগ্য ও নিবারক সূত্র খোঁজার প্রয়োজন যা দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানসূত্র হল নতুন ভাবাদর্শের মূল্যবোধের প্রণয়ন যেখানে মহিলাদের এবং তাদের পিতামাতাকে সম্মান করা হবে। দেখানো দরকার যে বিবাহযোগ্য বয়সের ছেলেরা বাজারিদ্রব্য নয়, যে তাদের বাবা-মায়েরা পণের বিনিময়ে তাদের ছেলে বিক্রি করবেন। সমতাবাদী মূল্যবোধই জাতিভিত্তিক (উচ্চ/নীচ) বিবাহের (hypergamy) একমাত্র প্রতিকল্প। অন্তর্জাতিভিত্তিক বিবাহকে ইন্ধন জোগানো উচিত এবং দাবি করে সুবিন্যস্ত বিবাহব্যবস্থা (arranged marriage) উঠে যাওয়া উচিত।

এইসব নিরাবক স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থার মধ্যে যেগুলি আসবে তা হল—পণের কারণে মৃত্যুর বা পীড়নের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, যারা পণপ্রথার শিকার তাদের আইনি ও সামাজিক সংরক্ষণ করা। টেলিভিশন, রেডিয়ো, খবরের কাগজে এমন কিছু খবরকে তুলে ধরা যাতে এধরনের অপরাধ সচরাচত ভবিষ্যতে না ঘটে। রাস্তার ধারে নাটকের আয়োজন করে এই ধরনের ঘটনাকে তুলে ধরা দরকার। রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, অন্যান্যরা যাতে কোনোভাবে পণ দিতে বা নিতে না পারেন তার দিকে লক্ষ রাখা। এটি একটি আবর্তচক্রে পর্যবসিত হয়েছে। যে মানুষ তার মেয়ের জন্য পণ দেন তিনি তার ছেলের বিয়ের সময় আরও বেশি পণ নিতে আগ্রহী থাকেন এবং এভাবে এই পণপ্রথা চলতেই থাকে। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানে ওপরের আলোচিত সূত্রগুলিই একমাত্র উপায় এই অপরাধ থেকে মুক্তির।

১৯৫৬-এর দি হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট মেয়েদের তাদের বাবার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছে ; কিন্তু খুব কম সময়ই মেয়েদের এই অধিকার দেওয়া হয় বা তারা তাদের ভাগ চান। এই আইনটি সম্পূর্ণই একটি আতিশয্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৬১-এর দি ডাউরি প্রহিবিশন অ্যাক্ট (The Dowry Prohibition Act of 1961) পণপ্রথার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। কোনো মেয়ে বাবা-মা-র সম্পত্তির অধিকার চায় না কারণ তাদের বাবা-মায়েরা তাদের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করেন। ১৯৬১-এর আইনটি পণপ্রথা রোধের জন্য গৃহীত। কিন্তু তবুও পণপ্রথা সর্বব্যাপী। এর আগে পর্যন্ত যেসব সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মে পণপ্রথা ছড়িয়ে পড়েনি, সেখানেও বর্তমানে পণপ্রথার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

২.৫ অনুশীলনী

(১) বর্তমানের ভারতীয় সমাজে পরিবারের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।

(২) বিবাহবিচ্ছেদ কী? এর কারণ ও ফলাফল কী কী?

(৩) পণপ্রথা কী? এর বিভিন্ন ধরনগুলি কী কী? ভারতে এর প্রসার কতটা?

একক ৩ ❑ সামাজিক নির্ভরশীলতার সমস্যা ঃ বার্ধক্য, অক্ষম, গৃহহীন

গঠন

৩.১ বৃদ্ধদের সমস্যা

৩.২ অক্ষমদের সমস্যা

৩.৩ গৃহহীনদের সমস্যা

৩.৪ অনুশীলনী

৩.১ বৃদ্ধদের সমস্যা

ভারতে বিধিবদ্ধভাবে ৫৫ বছর বয়সকেই বার্ধক্য হিসাবে ধরা হতো। যে সময় চাকুরিরতরা তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিতেন। পরবর্তীকালে এই বয়সের উর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয় ৫৮ বছরে। পশ্চিমীদেশগুলিতে, কোনো ব্যক্তিকে বৃদ্ধ বলা হয় যখন তার বয়স হয় ৬০-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে। জীবনের গড় বেঁচে থাকার সময়সীমার ওপর নির্ভর করে কাকে বার্ধক্য বলে। জীবনের গড় বেঁচে থাকার সময়সীমায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যাতে বৃদ্ধ বয়সের বিধিবদ্ধ সীমা বৃদ্ধি পায় ৬০ বছরে।

বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যর সঙ্গো মিলে যায়। বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ সামাজিক বিষয় হিসাবে কখনও কম কখনও বেশি হয়েছে। তবে এই সামাজিক বিষয়টির উপস্থাপনে সবসময়ই একটি দ্বন্দ্ব দেখা গেছে পর্যবেক্ষণকৃত প্রমাণ ও সমস্যা হিসাবে প্রত্যক্ষকরণের মধ্যে। এই দ্বন্দ্বটি থেকেই গেছে কারণ এটি একটি রাষ্ট্র, নাগরিক ও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি প্রত্যক্ষরূপ। বিশেষত এই কারণে যে বৃদ্ধদের প্রয়োজনকে প্রায়ই উপস্থাপিত করা হয়েছে অন্যের ওপর চাপ হিসাবে এবং সে কারণেই এটিকে এমন একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে যার আশু সমাধান দরকার। যাদের কাছে বার্ধক্য একটি সমস্যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এইরকম :

(i) বৃদ্ধ মানুষদের আয়ু ও তাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পেনশন ব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরি করে বিশেষত বর্তমান কর ব্যবস্থা থেকেই যখন তা মেটানো হয়।

(ii) যেহেতু বৃদ্ধদের মধ্যে যারা অতিবৃদ্ধ যাদের বয়স ৭৫-৮০-এর মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা হল সেবা, যা রাষ্ট্র ও পরিবার অনেক সময়ই মেটাতে পারে না।

(iii) প্রত্যেকটি বৃদ্ধ প্রজন্মে আগের তুলনায় পরিসেবা ও আয়ের চাহিদা বেশি। এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এমন একটি চাপ যা তাদের ওই ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মান, স্বার্থপরতার সঙ্গে খাপ খায় না।

(iv) পরিবার যা আগে বৃদ্ধ মানুষের সেবা করত তা ক্রমশ ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠায় এই বৃদ্ধদের পক্ষে সেখানে ওই একই সেবা ও সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া পরিবারে কর্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধও এখন অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে।

(v) পরিবারের মধ্যে মহিলারই সামাজিক সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তারা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করায় তাদের হাতে সেবা করার মতো সময়ের অভাব ঘটছে। আজ খুব কম মহিলাই সেবাই ধর্ম এই নীতি মেনে চলবেন।

নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটে গেছে বিগত ১০০ বছরে—যা চোখে দেখা যায়নি, অশ্রুতপূর্ব, তবুও খুব কাছাকাছি। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল দীর্ঘ আয়ু। বিশ্ব জুড়ে আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি হওয়ায় বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে।

ভারতের অবস্থা ঃ ভারতে গড় আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি ঘটেছে হয়েছে ২০ বছর থেকে ৬২ বছরে। উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা, নিম্নগামী প্রজনন হার সমাজে বৃদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ফ্রান্সে বৃদ্ধ জনসংখ্যা ৭% থেকে ১৪%-এ পৌঁছাতে ১২০ বছর লেগেছিল সেখানে ভারতে বৃদ্ধ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে মাত্র ২৫ বছর।

বয়স্ক নাগরিকদের পরিসংখ্যানগত রূপরেখা (২০০১)

- ৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনসংখ্যা।
- ৯০%-এর কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই।
- ৩০% বৃদ্ধ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন।
- ৩৩% বৃদ্ধ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার অল্প ওপরে (প্রান্তিক) বসবাস করেন।
- ৮০% বৃদ্ধ জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন।
- ৭৩% বৃদ্ধ নিরক্ষর, যারা শুধু কায়িক শ্রম করতে সক্ষম।
- ৫৫% বৃদ্ধারা বিধবা।
- ভারতে প্রায় ২,০০,০০০ জন শতায়ু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন।

ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধদের জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে, কারন

- আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি।
- স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও চিকিৎসা পরিসেবায় উন্নতি।
- উন্নত পুষ্টিযুক্ত খাবার।
- মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।
- নিম্নগামী প্রজনন হার।
- উন্নত সচেতনতা

এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান সমাজে পরিসেবামূলক গোষ্ঠীর হাতে। এই পরিসেবামূলক গোষ্ঠীই ঠিক করবে ফাঁকগুলি কোথায় এবং ভবিষ্যতে পরিসেবা, প্রতিরোধ ও নিপীড়ন কীভাবে মেকাবিলা করা যায়।

১৯০১ থেকে ২০২৫ ; ১২ মিলিয়ন থেকে ১৭৭ মিলিয়ন ঃ

- ১৯০১—আমাদের ছিল ১২ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ১৯৫১—আমাদের ছিল ১৯ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ২০০১—আমাদের ছিল ৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ২০২৫—আমাদের ১৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী হতে পারে।

মূল বিপদসংকেত

অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারা, মানসিক চাপ, একাকীত্ব, কিছু মাত্রায় বিচ্ছিন্নতা পারিবার জীবন থেকে এগুলি সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে জীবনযাত্রার পরিবর্তন, মানসিকতা, মূল্যবোধ ও প্রজন্মান্তরের ফারাক।

সমস্যার মূল বিষয়সমুহ

- সম্মানপ্রাপ্তি।
- স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিসেবার সুযোগপ্রাপ্তি।
- অর্থনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তাহীনতা।
- বৃদ্ধদের নিপীড়ন।
- হিংসা।
- জীবনের গুণগতমান।
- গ্রহণ না করা।
- অস্বীকার করা।

● অবসাদ।

● একাকীত্ব।

● পরিবার জীবন থেকে কিছু মাত্রায় বিচ্ছিন্নতা।

বৃদ্ধদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের খসড়া

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিজ্ঞানসম্মত অনুমান অনুযায়ী ২০২৫-এ ১.২ বিলিয়ন বৃদ্ধ বিশ্বে বাস করবেন। তাদের মধ্যে ৭১% উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করবেন। এবং ১৯৫০-২০২৫-এর মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অতিবৃদ্ধদের (৮০ বছরের বেশি যাদের বয়স) সংখ্যা ৬০ + বৃদ্ধদের সংখ্যার দ্বিগুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দ্বিগুণ হারে ৬০ + জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হল আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, জন্মহারের হ্রাসমানতা এবং স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি ইত্যাদি।

আমাদের দেশের গড় আয়ুষ্কাল এই শতাব্দীর শুরুতে যা ছিল ২৩ বছর তা ১৯৫১-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ এবং তার তিনদশক পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮ বছর বয়সে। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তা ৬০ ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের দেশে বৃদ্ধ মানুষের জনসংখ্যা যা ১৯৮১-তে ছিল ৪৩ মিলিয়ন তা ইতিমধ্যেই ৫০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে এবং আশা করা যায় যে পরবর্তীতে তা ৭৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।

গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি। এটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বোঝানো যায় ঃ

১৯০১ সালে ছিল ১২ মিলিয়ন বৃদ্ধ মানুষ

১৯৫১ সালে ছিল ১৯ মিলিয়ন

১৯৯৯ সালে ছিল ৭০ মিলিয়ন

২০২৫-এর মধ্যে ১৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ মানুষ বসবাস করবে।

একদিকে যেমন সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি অন্যদিকে জীবনচর্চার গুণমান ক্রমহ্রাসমান। শিল্পায়ন, প্রব্রজন, নগরায়ন এবং পশ্চিমিকরণের ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। পূর্বতন যৌথ পরিবার, যা ছিল প্রকৃতিগতভাবে সহকারী ব্যবস্থা তা ভেঙে পড়ছে। বর্তমানের দ্রুত জীবনযাত্রা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

WHO-এর কার্যপ্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ

নতুন যে কার্যপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বৃদ্ধদের জন্য তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেসব বৃদ্ধদের অসুস্থতা আছে তাদের ওপর জোর দিতে গিয়ে সেইসব দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নশীল প্রক্রিয়া যার জন্য এই ধরনের অসুস্থতা হয়েছে, তা খেয়াল রাখা হয়নি। এজন্য ১৯৯৫-এর জানুয়ারিতে ৯৫-তম কার্যনির্বাহী

বোর্ড-এর সেশনে এই HEE প্রক্রিয়াটিকে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য এই দুয়ের ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি বয়স ও বার্ধক্য প্রক্রিয়ার ওপর, বিশেষত বিশ্বজুড়ে বার্ধক্য প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জগুলিকে মাথায় রেখে।

১৯৯৮-এ WHO-এর এক্সপার্ট কমিটি এর ওপর বিবেচনা করে। ১৯৯৯ সালকে বৃদ্ধদের বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং WHO এর পক্ষ থেকে তার সদস্য দেশগুলিকে বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১. জীবনচক্রের দৃষ্টিভঙ্গি : জীবনচক্রের সমস্ত অংশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধানতা বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য অবস্থাকে নির্দেশ করে। অল্প বয়স থেকে জীবনযাত্রার ধরণ স্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে যা খুব সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে যে রোগ সবচেয়ে বেশি হয় তা হল হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসার যা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফলে ঘটে।

২. কোহর্ট দৃষ্টিভঙ্গি : দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বার্ধক্যের ওপর গবেষণা জরুরি। জীবনচক্রের অন্যান্য পর্বের তুলনায় খুব কমই বার্ধক্য সম্বন্ধে জানা যায়। এর কারণ গবেষণায় স্বাস্থ্য কীভাবে গঠিত হয় এবং কোন উপাদানগুলি তাকে রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা জানা হয় না।

৩. স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দৃষ্টিভঙ্গি : বিশ্ব বার্ধক্য অবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অকার্যকরী কোনো প্রক্রিয়া সক্ষম নয়। পরিসংখ্যানগত ক্ষেত্রে বয়স ও রোগ সম্বন্ধে, বয়সকে সমস্যা হিসাবে দেখানো হয়। এর ফলে মনে কার হয় যে বয়স বেড়ে চলা মানেই তা সমস্যার জন্ম দেবে। এই ধরনের নঞার্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবকারী স্বাস্থ্য পরিসেবা ও নীতিকে প্রভাবিত করবে। আড়াআড়ি গবেষণায় দেখা গেছে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে বৃদ্ধদের মধ্যে। এর থেকে এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে যাতে বৃদ্ধরা স্বাস্থ্যবান থাকেন ও ব্যক্তিগত এবং বহিরাগত সম্পদ আহরণে সক্ষম থাকেন।

৪. সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি : একটি কার্যকরী জীবনচক্র দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় প্রোথিত হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রতিদিনের জীবনের প্রক্রিয়াগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই শেখা হয় যা জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সমবয়সিদের চাপ, সনাতনী ঐতিহ্যের সঙ্গো সমাজের আত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাহায্যের অভ্যাস, ছোটোদের ও পরিবারের কর্তব্য হল বিশেষ কিছু প্রভাব সৃষ্টি করা যা জীবনকে গড়তে ও অতিবাহিত করতে সাহায্য করে। এগুলির পরিষ্কার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে এবং এগুলির উন্নতিতে বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকা সম্পর্কেও পরিকল্পনা করা যায়।

৫. লিঙ্গাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি : স্বাস্থ্য পরিসেবা ও গবেষণাকে কার্যকরী হতে হলে লিঙ্গাভিত্তিক

স্বাস্থ্যভেদ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সাধারণত পুরুষদের মৃত্যু আগে হয় আবার মহিলারা রোগের ও অক্ষমতার শিকার বেশি হয়। মহিলারাই বেশিরভাগ পরিসেবা দিয়ে থাকেন এবং তাদের সাহায্য করাই স্বাস্থ্যনীতির সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

৬. আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ যারা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং যারা বৃদ্ধ হতে চলেছেন, দুজনের কাছেই বার্ধক্য জরুরি। বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন হল আন্তঃপ্রজন্মের সম্পর্কের পুনর্গঠন করা। যদি বৃদ্ধদের জন্য নতুন কোনো ভূমিকার উদ্ভাবন করতে হয় তাহলে আন্তঃপ্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন। যদি দুই প্রজন্মের মধ্যে বিরোধ কমিয়ে ঐক্য আনতে হয় তাহলেও কিছু নীতি নির্ধারণ দরকার।

৭. নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ যখন একটি জনসম্প্রদায়ের বয়স বাড়তে থাকে তখন একঝাঁক নীতি সামনে চলে আসে। এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হল অনৈক্য, সম্পদের বন্টন, মধ্যস্থতা সম্পর্কে নীতি, মৃত্যু সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় ঢিলেমি বা তাড়াহুড়ো এবং দীর্ঘমেয়াদ সাহায্যকারী ব্যবস্থা যাতে দরিদ্রের, অক্ষম বৃদ্ধের মানবাধিকার রক্ষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা তার সদস্য দেশগুলিকে এই জটিল সমস্যা মোকাবিলা করতে আহ্বান জানিয়েছে সব বৃদ্ধ মানুষদের অধিকার তুলে ধরা ও প্রচারের মাধ্যমে।

৮. মূল কার্যক্রমের উপাদান ঃ AHE বর্তমানে একটি প্রণালীবদ্ধ বিশ্ব স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য ব্যবস্থার প্রচেষ্টা করছে। যাতে ১৯৮৭ সালে এক্সপার্ট কমিটির দ্বারা মনোনীত নির্দেশগুলি পালন করা হবে। এই কমিটি অনুমোদিত উপাদানগুলি হল—তথ্যের প্রচার সমর্থন করা, গবেষণার বিষয়বস্তু জানিয়ে গবেষণা চালানো, অনুশীলন, নীতি নির্ধারণ। এই উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময়ই একে অপরের ওপর আবৃত।

৯. তথ্যের ভিত্তি শক্তিশালী করা ঃ গত কয়েক দশক ধরে বার্ধক্যজনিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে যার মধ্যে বার্ধক্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য বিশেষভাবে যোগ করা হচ্ছে। বিচার-বিবেচনাকারীদের, প্রশাসকগণদের এবং পরিসেবা দানকারীদের, পেশাদারদের প্রয়োজন সবসময় যেসব নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে খবর রাখা। এমনকি স্বাস্থ্য বিষয়ক যেসব গবেষণা চলছে তারও খবর রাখা। AHE বর্তমানে কিছু তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে যেখানে বার্ধক্যের গতিপ্রকৃতি, স্বাস্থ্য এবং যেসব গবেষণা বা নিরীক্ষা চলছে তার খবর এবং পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশে পরিসেবার মূলকেন্দ্রটি কী ঘিরে সে সম্বন্ধে তথ্য থাকবে। ইলেকট্রনিকস যোগাযোগের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা এই তথ্যকে সংগঠিত করবে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ আন্তর্দেশীয় একটি গবেষণায় ৩৫টি সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে উন্নত ও

উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধ মানুষদের গৃহভিত্তিক পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং (NIA)-এর আর্থিক সহযোগিতায় AHE-র কর্মচারীরা এই গবেষণা চালান। NIA, AHE-কে বিশ্বজুড়ে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তা একত্রিত করতেও সাহায্য করছে। এই তথ্যে জানা যাবে একবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে রোগের প্রকোপ বার্ধক্যের ওপর চেপে বসে।

স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের ওপর একটি ইলেকট্রনিকস লাইব্রেরি আছে যেখানে ওই বিষয়ে গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধেও জানা যায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সহযোগে এই লাইব্রেরিটি পরিচালিত হয়। একটি ডাকযোগে সমীক্ষার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণের ভিত্তিগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। AHE একটি লিঙ্গভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারও তৈরি করছে যেখানে বিভিন্ন সমাজের পুরুষ ও মহিলার বার্ধক্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা তথ্য থাকবে।

১০. তথ্যের প্রচার ঃ বার্ধক্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য কতগুলি কাঠামো বৃদ্ধদের মধ্যে, পরিসেবাদানকারীদের মধ্যে, পেশাদারদের মধ্যে, নীতি নির্ধারকদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। AHE-এ বিষয়ে কতগুলি রীতিবদ্ধতা মেনে এই প্রচার করছে যা ছাড়া এই প্রচার কখনোই সম্ভব নয়।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ যারা স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য বিষয়ে তথ্য পেলে সবচেয়ে উপকৃত হবেন তাদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা ও তথ্য ছড়িয়ে দিতে হবে। কতগুলি বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সাহায্যকারী কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে AHE কতগুলি স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য সম্বন্ধে নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে।

এই নির্দেশিকায় শারীরিক কার্যপ্রক্রিয়া, স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, পিঠের ব্যথা কমানো ও নিয়ন্ত্রণ এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণে অক্ষম যারা তাদের এ বিষয়ে পরামর্শ জানানো হয়েছে।

পরিসেবাদানকারীদের কাজ হল এইসব মানুষের জীবনের গুণগত উন্নতিসাধন। সেজন্য AHE স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ সাও পাওলো, ব্রাজিলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই পরিসেবাদানকারীদের জন্য বৃদ্ধদের পরিবারের মধ্যে কীভাবে সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংস্কৃতিই ঠিক করে একজন ব্যক্তি কীভাবে বার্ধক্যের দিকে এগোবে বা বার্ধক্যকে গ্রহণ করবে। বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে মাথায় রেখে AHE কতগুলি পজিশন পেপার সংগঠিত করেছে। এই পত্রগুলি বিশেষজ্ঞরা প্রস্তুত করেছেন তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা থেকে। AHE এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে এই নির্দেশিকা সহজভাবে বোঝা সম্ভব হয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ

ম্যাগাজিন (জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৭)-এর বিশেষ সংখ্যায় "অ্যাকটিভ অ্যাজিং" সংক্রান্ত আলোচনা এইরকম একটি পদক্ষেপের উদাহরণ বহন করে।

AHE-এর মূল ভাবনা—যেমন লিঙ্গা বিষয়ক আলোচনা, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি—এই ধরনের নিয়মিত পরিবর্তন প্রয়োজন। দি অ্যাজিং অ্যান্ড হেলথ প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে গবেষণাপত্রের জন্য যে বিষয়গুলি মনোনীত করেছে সেগুলি হল—মহিলা বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য, বৃদ্ধ মহিলাদের হৃদ্‌রোগ, বার্ধক্যে লিঙ্গাপ্রভেদ, বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যে নীতি নির্ধারকদের তথ্য প্রদান প্রমুখ। The WHO Health Cities Movement বার্ধক্য বিষয়ে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করেছে—যার আরও ব্যাপক প্রসার দরকার। AHE এই ধরনের অভিজ্ঞতা ধরে রাখার ওপর একটি নিরীক্ষা চালায় যা পরবর্তীতে Journal of Cross-cultural Gerontology-তে প্রকাশিত হয়।

১১. সমর্থন করা

অনেক দেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বার্ধক্য যে একটি সমস্যা সে বিষয়ে সীমিত ধারণা আছে। এ ছাড়াও অন্যান্যরা মনে করে বার্ধক্যের সঙ্গো বহু অসমাধানযোগ্য সমস্যা আছে। সর্বোপরি, বৃদ্ধ মানুষদের পরিবারের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি এবং অর্থনীতির প্রতি যে বিরাট অবদান আছে তা তেমন মূল্য দেওয়া হয় না। সুতরাং সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা দুটি অংশে আছে ঃ

- AHE সরকারের সঙ্গো একযোগে কাজ করে, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং গণমাধ্যমের উচিত জনমতকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করা।

- AHE চেষ্টা করছে যাতে বৃদ্ধ মানুষরা নিজেরাই তাদের সম্বন্ধে নীতি গ্রহণ করতে পারে আঞ্চলিক, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ জেনিভায় অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। এ ছাড়াও একটি বড়ো অংশের জেরেন্টোলজিক্যাল রিসার্চ কমিউনিটি আছে। এই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে খুব কমই সংযোগ ছিল। AHE, Swiss National Research Programme on Ageing এবং American Association of Retired Persons-এর স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৯৬-তে Geneva International Network on Ageing (GINA) গঠিত হয়েছে। GINA বর্তমানে স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য বিষয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলছে (যেমন International Day of Older Persons যাপন করা ইত্যাদি) যার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষণীয়। অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতেও GINA-র কার্যধারার প্রতিরূপ গড়ে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যধারার পাশাপাশি, AHE আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে যেখানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম AHE-তে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এইভাবে AHE-র বক্তব্য

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে কিছু কিছু বিশেষ দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। এভাবে AHE নিজস্ব কর্মধারা প্রতিষ্ঠা করছে এবং স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তায় একটি রীতিবন্ধ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। ১৯৯৯ ছিল আন্তর্জাতিক বৃন্ধবর্ষ। AHE অনেকগুলি কার্যধারার পরিকল্পনা করছে যেখানে বৃন্ধ জনসংখ্যার স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। AHE বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র পাওয়া সংস্থা যা রাষ্ট্রপুঞ্জ, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে একযোগে বৃন্ধদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৯৯৯ জুড়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই সঙ্গে এও ঘোষণা করা হয়েছে যে ৭ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে উদ্‌যাপন করার পাশাপাশি ওই বছর হেলদি অ্যাজিং ও উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯৯৩ থেকে গৃহীত বার্তা ১৯৯৯-এর ১ অক্টোবর "অ্যাকটিভ অ্যাজিং" ধারণাটির মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করা গেছে। এর জন্য ১৯৯৭ থেকে জেনিভা ও রিও দি জেনেরি এবং অন্যান্য শহরে অনেক প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল।

১২. গবেষণার বিষয়বস্তু জানিয়ে গবেষণা চালানো

AHE-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার গবেষণা রোগ সংক্রান্ত গবেষণাপদ্ধতি আলোচনা থেকে সরে এসে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাতে সীমাবন্ধ হয়েছে। এর জন্য পূর্ববর্তী তিনটি কার্যধারার উপাদান জরুরি। এ সম্ভব শুধুমাত্র যদি তথ্যের ভিত্তিকে আরও জোরদার করা যায় এবং তথ্যের সম্প্রচারের মাধ্যমে জ্ঞানের মধ্যে ফাঁকগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়। এবং সমর্থনের মাধ্যমে, নতুন ভোক্তাদের উৎসাহিত করে এই কাজ সম্ভবপর করে তোলা যায়। বিশেষত তিনটি ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে—

(ক) মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যার পরিবর্তনের ধারার আলোচনা করে।

(খ) জনসংখ্যার বার্ধক্যের কাঠামো আলোচনা ও আড়াআড়ি গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা।

(গ) স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের নির্ণায়কগুলি চিহ্নিত করা।

AHE বহু বিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন দেশের পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। AHE-এও মনে করে যে বার্ধক্য সম্বন্ধীয় গবেষণার বিষয়ে নতুনত্ব আনা দরকার যাতে বিশ্বের বৃন্ধ জনসংখ্যার জনস্বাস্থ্য বিষয়ে একটি জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়।

এও মনে করা হচ্ছে যে, ২০০০ সালের প্রথমদিক থেকে AHE নতুন গবেষণা বিষয়ের সূচনা করতে চলেছে। এর জন্য প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বেলাগাজিও-তে দি রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ পর্যালোচনার ওপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কতগুলি কর্মশালার আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিষয়ের ওপর যার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে বার্ধক্য

বিষয়টি। এই বিষয়গুলির প্রচার হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণও আহ্বান করা হচ্ছে। AHE ডেলফির স্টাইলের অনুরূপভাবে নিরীক্ষা চালাচ্ছে যাতে বার্ধক্যে স্বাস্থ্য বিষয়কে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে।

১৩. প্রশিক্ষণ :

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বার্ধক্যের গতি ও প্রেক্ষিত থেকে বলা যায় যে আগামী দুই তিন দশকের মধ্যে ১.২ বিলিয়ন বৃদ্ধকে পরিসেবা দিতে সক্ষম হবে যে-কোনো দেশ। সেজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। AHE সমস্ত সমাজকর্মী ও পেশাদারদের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণের মূল ভিত্তি হিসাবে বার্ধক্য বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছে। তাছাড়া AHE বার্ধক্যের মহামারিবিদ্যা সম্বন্ধেও স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য বিষয়ক পেশাদারদের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

কার্যধারার উদাহরণ : AHE, সুইজারল্যান্ড, ট্যুইনিশিয়া এবং মেক্সিকোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গো সহযোগিতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের বৃদ্ধদের সেবা বিষয়ে, প্রশিক্ষণের খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। বৃদ্ধদের অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে এই খসড়া তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক দেশে যাতে বার্ধক্যের মহামারিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় সে বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কতগুলি স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করেছে AHE লন্ডন ইউনিভার্সিটির পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। ১৯৯৭-এ এই ধরনের প্রথম স্বল্পমেয়াদি কোর্স হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ইউনিভার্সিটি অফ জেনিভার সঙ্গো সহযোগিতায় AHE শারীরচর্চার শিক্ষকদের জন্য বৃদ্ধ বয়সের শারীরিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গো একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

১৪. নীতি প্রণয়ন :

বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য শিবিরের প্রথম লক্ষ্য হল সদস্য রাষ্ট্রের কাজকর্মে বৃদ্ধ জনসম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ নীতি প্রণয়নে সাহায্য করা। পূর্বের সমস্ত শিবিরও এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে।

AHE ধীরে ধীরে সহযোগী দেশগুলির বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃদ্ধ জনসম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্য নীতি গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটিরও লক্ষ্য এ বিষয়ে উপায় ঠিক করা। ১৯৯৯ থেকে শুরু করে দেশভিত্তিক আন্তঃক্ষেত্র বিশেষে কর্মশালার আয়োজন করছে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার আঞ্চলিক শাখাগুলি যাতে স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য নীতি গঠন করা যায়। এই কর্মশালায় নীতি প্রণয়নের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ যেখানে যেখানে সম্ভব করা হয়েছে আগে থেকে পাওয়া জাতীয় নিরীক্ষা পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে।

কার্যধারার উদাহরণ : জুলাই ১৯৯৬-এ ব্রাজিলীয় সরকারের সহায়তায় AHE আন্তর্জাতিক

আলোচনা সভার আয়োজন করে যার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য প্রক্রিয়া বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা। ১৯৯৭-এ AHE বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সহায়ক কেন্দ্রের সহায়তায় "অ্যাজিং, হেলথ অ্যান্ড দি হোম এনভাইরনমেন্ট" এর ওপর আলোচনার আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল এই আলোচনা প্রসূত বক্তব্যের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের জন্য উপযোগী নীতি গঠন করা যাতে বৃদ্ধরা তাদের স্বাধিকার বজায় রাখতে পারে।

১৯৯৭-এ জার্মান মিনিস্ট্রি অফ হেলথ-এর সহযোগিতায় হ্যানোভার, জার্মানিতে AHE একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই আলোচনার বিষয় ছিল "পপুলেশন অ্যাজিং হেলথ কেয়ার কস্ট অ্যান্ড পলিসি ডেভেলপমেন্ট"-এর উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের তথ্যভিত্তি তৈরি করা।

AHE চেষ্টা করছে বিশ্বকেন্দ্র গঠন করা যেখানে বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়নকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। এর প্রথমকেন্দ্র গঠনের জন্য ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাপিনোসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছক ঃ

An Integrated Programme for Older Persons

লক্ষ্যসমূহ ঃ এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হল সমস্ত বয়সের জন্য উপযোগী সমাজ গঠন করা যেখানে বৃদ্ধ মানুষদের জীবনের গুণমান উন্নত করা হবে এবং তাদের ক্ষমতায়িত করা হবে। এর উদ্দেশ্য হল সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সচেতনতা গড়ে তোলা যাতে এই বৃদ্ধ মানুষদের তাদের প্রয়োজনে কিছু উপযোগী কাজে ব্যবহার করা যায়। এই স্কিমে ১৮৬টি বৃদ্ধাবাস, ২২৩টি ডে কেয়ার সেন্টার, ২৮টি মেডিকেয়ার ইউনিট এবং কিছু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই ৪০০টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে চালু হয়ে গেছে।

● **অন্নপূর্ণা প্রকল্প ঃ** গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্পটি চালু করে ২০০০-২০০১-এ। এই প্রকল্পে ৬৫ বছর বয়সের ওপরে বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের, যারা ন্যাশনাল ওল্ড অ্যাজ পেনশন স্কিমে পেনশন পাচ্ছেন না তারা পেনশন পাবেন। এই প্রকল্পে প্রতি মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য পাবেন।

২০০২-২০০৩ থেকে এই প্রকল্পটিকে রাজ্য সরকারের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম যার মধ্যে ন্যাশনাল বেনিফিট স্কিম উভয়ই সংযুক্ত। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঠিক করবে কীভাবে প্রকল্পটি রূপায়িত করা যায়। অর্থাৎ এই প্রকল্পের রূপায়ণ নির্ভর করে রাজ্য সরকারের ওপর।

● পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ/ঐচ্ছিক সংগঠন।

বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী/বৃদ্ধমানুষদের জন্য বহুবিধ পরিসেবা কেন্দ্রে সাহায্যার্থে প্রকল্প ঃ

লক্ষ্য

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলা ও বৃদ্ধ মানুষদের জন্য বহুবিধ পরিসেবা প্রদানের জন্য ঐচ্ছিক সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

● জরুরিভিত্তিতে খাদ্যগ্রহণ প্রকল্প ঃ

অশক্ত, বৃদ্ধ ও প্রান্তিক ব্যক্তি যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য সংকটাপন্ন অবস্থায় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এটি শুরু হয় ২০০১ সালের মে মাস থেকে। এই প্রকল্পটি ওড়িশার রাজ্য সরকার আটটি বিশেষ অনুন্নত জেলায় চালু করেছে। যেমন—বোলাঙ্গির, কালাহান্ডি, কোরাপুট, মালকানগিরি, নাওয়ারঙ্গাপুর, নৌপদা, রায়াগাডা এবং সোনপুর। এসব এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্টের স্বীকৃতি পেয়ে খাদ্যশস্য (চাল) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য যে দাম সেই দামে সরবরাহ করে। ১৪,৪০০.০০ মে. টন চাল ২ লক্ষ উপকৃতকে ৬ টাকা করে প্রতি মাসে দিয়ে থাকে।

৩.২ অক্ষমদের সমস্যা

কোনো ব্যক্তির পা/হাত বা কোনো অঙ্গ আকস্মিকতায় বা প্রকৃতিগত কারণে বিকল হয়ে গেলে, তাকে অক্ষম বলা যায়। এদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং তা পূরণ করা যায় তখনই যখন প্রত্যেকটি নাগরিক, ঐচ্ছিক সংগঠন ও সরকার একসঙ্গে সে বিষয়ে সচেতন হবেন যে এটি তাদের যৌথ দায়িত্ব।

যে-কোনো শিল্পোদ্যোগ বা কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির এটি একটি প্রাথমিক কর্তব্য যে তারা তাদের বিপুল অর্থভাণ্ডারকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে ব্যবহার করতে পারেন যা বিকলাঙ্গ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা ঘোষিত "Rights of the Disabled"-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে অক্ষমদের প্রয়োজন নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ তাদের অধিকার।" ১৯৮১ সালকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক অক্ষমদের বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রতি বছরের মার্চ মাসের তৃতীয় রবিবারকে 'ওয়ার্ল্ড ডিসএবেল্ড

ডে' হিসাবে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল বিকলাঙ্গাদের প্রয়োজনগুলি কী কী ও তাদের সমস্যাগুলি কোথায় সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ যেন সচেতন হয়।

যে-কোনো সুস্থ মানুষের মতোই বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের দেখতে হবে যে তাদের যেন প্রতিস্থাপনের পথ থাকে ও উন্নতি হয়। এটি আমাদের নৈতিক কর্তব্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে। শুধুমাত্র তাদের দরকার একটা সুযোগের, যার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে পারবে যে তারাও যে-কোনো মানুষের মতো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। একটু সাহায্য পেলেই এই অক্ষম মানুষেরা তাদের দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারে। তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার সাহায্যে তারা জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যোগান দিতে পারে। সুতরাং তাদের ভরসা প্রদান করলেই তারা সমাজের মূল ধারায় যোগদান করতে পারবে।

সমাজকল্যাণমন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত একটি ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভেতে দেখা গেছে যে ১.৮% ভারতীয়র মধ্যে কোনো-না-কোনো অক্ষমতা আছে। ১০%-এর বেশি অক্ষম মানুষদের একের বেশি ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে। প্রত্যেক অক্ষমতাকে আলাদাভাবে দেখলেও শারীরিক অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৫.৪৩ মিলিয়ন, দৃষ্টির অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩.৪৭ মিলিয়ন, শ্রবণশক্তির অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩.০২ মিলিয়ন এবং কথা বলার অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ১.৭০ মিলিয়ন। এই গবেষণায় অন্ধ, বিকলাঙ্গ এবং মূক ব্যক্তিদেরই নেওয়া হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন বা অন্যান্য বিকলাঙ্গ যারা তাদের এই সমীক্ষায় বাদ রাখা হয়েছে।

যারা বংশানুক্রমিকভাবেই অক্ষম তাদের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় ৫% দৃষ্টিহীন গ্রামীণ এলাকায় এবং প্রায় ৮% দৃষ্টিহীন শহর এলাকায় আছে। শ্রবণশক্তিহীন এমন বংশানুক্রমিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে ৩০% গ্রামীণ এলাকায় এবং ২৮% শহর এলাকায় পাওয়া গেছে। কথা বলার ক্ষেত্রে যারা অক্ষম তাদের বংশানুক্রমিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১৭% গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৭% শহর এলাকায় থাকেন।

বংশানুক্রমিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে এর অনুপাত পুরুষের তুলনায় কম, মূকদের বাদ দিয়ে। বয়সের সঙ্গে এর ব্যাপকতার হার বৃদ্ধি পায়। মূকদের বাদ দিলে ৬০ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যেই এর ব্যাপকতা বেশি। মূকদের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় ৫-১৪ বছর বয়সিদের মধ্যে। যেসব মানুষের লোকোমোটর অক্ষমতা আছে (১ লক্ষ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে) তাদের মধ্যে ৮২৮ জন থাকে গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৭ জন থাকে শহর এলাকায়। যাদের হাত বিকল বা প্যারালাইসিস হয়েছে বা হাত/পায়ের সন্ধিস্থলে কোনো অক্ষমতা আছে, বা যাদের নকল হাত/পা লাগানো আছে এদের

প্রত্যেকেরই লোকোমোটর অক্ষমতা আছে। দেশের অক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা স্থিতিশীল নয়। প্রত্যেক বছর এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনুমান করা যায় যে প্রত্যেক বছর ৩ মিলিয়ন ব্যক্তি ওই জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়ে থাকে।

অক্ষম মানুষদের কল্যাণমূলক কাজকর্ম ২০০৪-০৫-এ অক্ষমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ হিসাবে (PWD) ২২৫.৫৪ কোটি টাকা ধার্য হয়। যার মধ্যে ৯৭.৩৭ কোটি ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে খরচ হয়ে যায়। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)-এর মাধ্যমে অক্ষমতা সম্বন্ধে কার্যপ্রক্রিয়া চালু করার কথাও ভাবা হয়েছে। এই কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেসব শিশুর বিকলাঙ্গতা আছে তাদের বিশেষভাবে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে এই শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি কার্যকরী করা হয় জাতীয় ও অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এরা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাভুক্ত ব্যক্তিদের যেমন দৃষ্টিহীন, মূক, বধির ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানান কোর্স চালু করেছে যেখানে এই ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে ১৩.৫৭ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

পার্সন্স উইথ ডিসএবিলিটি (PWD) অ্যাক্ট ১৯৯৫ এখনও চালু হওয়ার অপেক্ষায়। যে-কোনো ধরনের অক্ষম মানুষের পুনঃস্থাপনের জন্য শ্রমশক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচটি কমপোজিট রিহ্যাবিলিটেশন কেন্দ্র (CRCs) গঠিত হয়েছে শ্রীনগরে, লখনউতে, ভোপালে, গুয়াহাটিতে এবং সুন্দরনগরে। যাদের হাড় গঠনের ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে বা মেরুদণ্ডের অক্ষমতা আছে তাদের জন্য আঞ্চলিক পুনঃস্থাপন কেন্দ্র (RRCs) গঠন হয়েছে চণ্ডীগড়ে, কটকে, জব্বলপুরে এবং বেরিলিতে। ১৩৩টি জেলাভিত্তিক পুনঃস্থাপন কেন্দ্র (DDRCs) তৃণমূল স্তরে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। DDRC-গুলি চালুও হয়েছে।

Assistance to the Disabled for Purchase/Fitting of Aids and Appliances প্রকল্পটির জন্য ৩৯.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে যার মধ্যে ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে ১.১৮ লক্ষ উপকৃতদের জন্য খরচ হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল লিম্বস ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অক্ষম মানুষদের জন্য নকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করে থাকে। Science and Technology Project in Mission Mode নামে একটি প্রকল্পও চালু করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক বরাদ্দ উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারকে ব্যয়সাপেক্ষ করে তোলা।

মেকানিক্যাল হাত, ইনটারপয়েনিটং ব্রেইল স্লেট, ব্রেইল মাইক্রোমিটার, প্লাস্টিক অ্যাসফেরিক লেন্স প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

দীন দয়াল ডিসএবেল্ড রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম সেইসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আর্থিক অনুদান দেয় বিশেষত যারা কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে কাজ করে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের শ্রমশক্তির উন্নতিকল্পে স্পেশ্যাল স্কুল তৈরি করার ক্ষেত্রেও আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। ২০০৫ সালে ৩৪.২৯ কোটি টাকা ৫০২টি ঐচ্ছিক সংগঠনকে এই ধরনের প্রকল্পের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২০০৪-এর জুন পর্যন্ত UNDP-এর একটি প্রকল্প Support to Children with Disabilities চালু ছিল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সমাজকে সচেতন করা, একত্রিত করা এবং ক্ষমতায়িত করা যাতে এলাকার স্কুলগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওই এলাকার সমস্ত অক্ষম শিশুকে ওই প্রকল্পের ভেতরে আনা যায়। National Scholarship for Persons with Disabilities নামে একটি প্রকল্প ২০০৩-২০০৪-এ চালু ছিল। ওই প্রকল্পের অন্তর্গত ৩১৩টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরুষ ও মহিলা ছাত্রদের যারা অক্ষম কিন্তু প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষাভিলাষী।

এখন স্থির করা হয়েছে যে যেসব শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধী, মূক ও বধির তাদের নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হবে। আগে ম্যাট্রিক পাস করার পর এই ধরনের স্কলারশিপ দেওয়া হত। অনুপদ্রুত অঞ্চল বা পিছিয়ে পড়া এলাকায় এ ধরনের ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃতির কথাও ভাবা হচ্ছে।

অক্ষমতার নানান ধরন ঃ

- সেরিব্র্যাল পালশি।
- বধিরতা
- কুষ্ঠ
- মানসিক প্রতিবন্ধী
- বহুবিধ অক্ষমতা
- শারীরিক প্রতিবন্ধী
- স্প্যাসটিক

৩.৩ গৃহহীনদের সমস্যা

যে-কোনো সামাজিক বিষয়ের মধ্যে গৃহহীনতা একটি বিশেষ সমস্যা। সমাজের কোনো অসুবিধার

বহিঃপ্রকাশেই গৃহহীনতা ঘটে থাকে বলে ভাবা হয়। তবুও এই সমস্যাকে যতদূর সহজভাবে বোঝা দরকার। এমনকি গৃহহীনতা ধারণাটির সংজ্ঞা দেওয়াও কষ্টসাধ্য। এবং এজন্য এই ধারণাটির পরিমাপও সহজসাধ্য নয়।

দি. ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং অ্যান্ড আর্বান ডেভালপমেন্ট গৃহহীন বা গৃহহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে (১) যে ব্যক্তির স্থায়ী প্রাত্যহিক পরিমিত রাত কাটানোর ব্যবস্থা নেই তাকে গৃহহীন বলা যায়। (২) যে ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে রাত কাটানোর জায়গা আছে, (ক) যা জনগণের বা ব্যক্তিগত জায়গা, যা অস্থায়ীভাবে রাত কাটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। (খ) একটি প্রতিষ্ঠান যা কতগুলি ব্যক্তির রাত কাটানোর জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করে। (গ) একটি জনসাধারণের বা ব্যক্তিগত জায়গা যা মানুষ ব্যবহার করে নিয়মিত/প্রত্যহ রাত কাটানোর জন্য।

গ্লোবাল আরবান রিসার্চ ইউনিটের (GURU) একটি সমীক্ষা "Attitudes to and Interventions in Homelessness : Insights from an International Study." তে গৃহহীন মানুষের সম্বন্ধে সাধারণ কতগুলি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যাবে—

(ক) দি ভিলেন ঃ বিশ্বজুড়ে গৃহহীন মানুষদের অপরাধী হিসাবে দেখা খুবই সাধারণভাবে হয়ে থাকে। অপরাধী হিসাবে এই গৃহহীনদের খুব সহজে সাব্যাস্তও করা যায়। তবে বেশিরভাগ দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক গৃহহীনরাই অপরাধী হন, এরকম দেখা যায় না বিশেষত হিংসাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে। সাধারণ মানুষের নঞর্থক আচরণের জন্যই তাদের অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

(খ) দি বেগার ঃ জনমানসে আরো একটি সাধারণ ভাবনা হল যে এই গৃহহীন মানুষরা সবাই ভিক্ষাজীবী যদিও দেখা গেছে যে কলকাতা শহরের গৃহহীনদের মধ্যে মাত্র ৮% ভিক্ষাজীবী। ভারতে বেশিরভাগ গৃহহীন মানুষই অস্থায়ী কর্মী যারা শহরে অনেক দূর যাতায়াত করে তাদের কর্মস্থলে পৌঁছায়। ঘানায় যদিও সাধারণ ধারণায় গৃহহীনদের ভিক্ষাজীবীই ভাবা হয় তবুও তাদের মধ্যে মাত্র ৩%-ই ভিক্ষাবৃত্তি করেন।

(গ) মানসিক অসুস্থতা ঃ গৃহহীনদের সম্বন্ধে আরো একটি সাধারণ বোধ যে তারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা ব্যক্তিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। পেরুতে যারা রাস্তায় থাকেন, যাদের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা নেই তাদের সরকারিভাবে মানসিক অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ঘানার টামালে অঞ্চলে অক্সফ্যামের এক কর্মীর মতে গৃহহীন মানুষ আদতে মানসিকভাবে অসুস্থ যাদের সচলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

(ঘ) দি ইম্মর‍্যাল ঃ গৃহহীন মহিলাদের ওপর এই চিহ্নিতকরণের তকমা সাধারণভাবে লাগানো হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় গৃহহীন মহিলাদের সম্বন্ধে একটি শব্দ "তুনাসুসিলা" ব্যবহার করা হয় যার অর্থ 'যে মহিলার কোনো নৈতিকতা নেই'। বাংলাদেশেও যেসব অল্পবয়সি বিধবা বা ডিভোর্সী গৃহহীন মহিলাদের দেখা যায় তাদের দেহব্যবসায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাদের প্রকৃত যৌন ক্রিয়াকলাপের বিষয় না জেনেই।

(ঙ) দি ট্রানজিয়েন্ট ঃ গৃহহীন মানুষরা সাধারণভাবে সবসময়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করেন। এজন্য তাদের ট্রানজিয়েন্ট বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের "মালুন্ডা" বলা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় এদের গেলানডাগান বলা হয়। চিনে এদের বলা হয় "মাঙ্গালিউ" যার অর্থ হল দিশাহীনভাবে ভবঘুরে জনসম্প্রদায়। এদের "লিউলাঘান" শব্দের সাহায্যেও চিহ্নিত করা হয় যার অর্থ ভবঘুরে। তবে দেখা গেছে যে মানুষ সাধারণভাবে এক জায়গাতে থাকে। যদি তারা ভবঘুরে হয় তবে তা কোনো সামাজিক চাপের কারণেই।

(চ) দি লোজার ঃ এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় কোনো একাকী বসবাসকারী পুরুষের জন্য। বস্তুত সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন, কোনো বন্ধনহীনতা থাকলে তবেই কেউ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় অনেক গৃহহীন পরিবার দেখা যায় যারা একসঙ্গে থাকে। এমনকি সবচেয়ে দরিদ্রতম অবস্থাতেও গৃহহীনদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় থাকে। তারা সব সময়ই একে ওপরের খোঁজখবর রাখে।

(ছ) দি হেল্পলেস ঃ অনেক ধর্মীয় সংগঠন গৃহহীন মানুষদের কোনো সামাজিক চাপের শিকার মনে করে। বহু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা গৃহহীন মানুষদের ছবি দেখিয়ে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহহীন মানুষদের অনেক সময়ই আশ্রয়হীন অসহায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের আচরণ ভঙ্গুরতার সঙ্গে গৃহহীনতাকে এক করে ফেলে, যার ফলে গৃহহীন মানুষ সাধারণভাবে নিজের চেষ্টায় বাঁচার চেষ্টাটুকু যা করেন তাও গুরুত্ব পায় না। যেসব শিশুরা রাস্তায় বেড়ে ওঠে তাদের পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকা শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বহু ফুটপাতে বেড়ে ওঠা শিশু তাদের বাবা-মা তাদের যেমনভাবে রাখে, তার থেকে অনেক ভালোভাবে নিজেদের রাখতে পারে।

গৃহহীন মানুষের উপর বেশিরভাগে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল দেখা যে,

(১) কেন গৃহহীনতা ঘটে ?

(২) বিশেষত কারা গৃহীনতার ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখোমুখি হয়।

কোনো ব্যক্তিকে গৃহহীন করার ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলি থাকে ঃ

● **দারিদ্র্য ঃ** যেসব মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে তাদের গৃহহীন হওয়ার বিপদ বেশি থাকে।

● **মদ ও ড্রাগের অপব্যবহার ঃ** প্রায় ৩৮% গৃহহীন কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর অপব্যবহার করে থাকে। এই নিয়ে বিতর্ক আছে যে ড্রাগের ব্যবহার গৃহহীনতার কারণ বা ফলাফল কি না। তবে এ ধরনের নেশা যখন হয় গৃহহীনতার পরিবর্ত কিছু ঘটতে পারে না।

● **মানসিক প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতা ঃ** সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গৃহহীনদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কোনো না কোনো মানসিক অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতা আছে। আগেকার দিনে এই ধরনের মানুষদের মানসিক হাসপাতালে রাখা হত। ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর মেন্টালি ইল III-এর মতে ক্যালিফোর্নিয়া শহরে প্রায় ৫০,০০০ মানসিকভাবে অসুস্থ গৃহহীন থাকে কারণ ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৮-এর মধ্যে আঞ্চলিক পরিসেবা কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে অ্যাসারটিভ কমিউনিটি ট্রিটমেন্ট ও পাথ প্রোগ্রাম এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহহীন এবং মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

● **প্রতিপালন সেবার পটভূমি ঃ** যারা প্রতিপালিত হন এমন গৃহহীন জনসংখ্যা অপ্রতিপালিত গৃহহীন জনসংখ্যার প্রায় ৮ গুণ।

● **গৃহের পীড়ন থেকে পালিয়ে আসা ঃ** যারা পরিবারের ভেতরে যৌন, শারীরিক ও মানসিক পীড়নের ফলে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, তারা অধিকাংশই গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই ধরনের নিপীড়িত শিশুদের মধ্যে ড্রাগের নেশার প্রকোপও বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় অর্ধেক গৃহহীন নারী ও শিশু পরিবারে পীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্যই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

● **জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ব্যক্তি ঃ** এক সময় যারা কারাগারে বন্দি ছিল তারা পরবর্তীতে সমাজ পরিবার ও বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের হাতে খুব কমই সম্পদ থাকে। তাদের অপরাধের রেকর্ড থাকার জন্য কোথাও চাকরি পাওয়াও সম্ভব হয় না। এবং বহুদিন ধরে মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা না হওয়ায়, কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাদের অধিকাংশই গৃহহীন হয়ে পড়ে।

● **যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ ঃ** যে-কোনো যুদ্ধের সময় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে আবার বাড়িঘর তৈরি করা ব্যয়সাপেক্ষও হয়ে ওঠে। আবার যদি ওই সরকার পরাজিত হয় তাহলে নাগরিকদের সাহায্য করাও সম্ভবপর হয় না।

● **গণহত্যায় যারা বেঁচে থাকে ঃ** উদাহরণ ঃ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যারা বেঁচে গেছেন, অন্তরীণ জাপানি আমেরিকানরা।

গৃহহীনতার কারণ ঃ

● **ব্যক্তিগত ইচ্ছে ঃ** কেউ কেউ ইচ্ছে করেই স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা গড়ে তোলেন না। যেমন— যারা ভ্রমণকারী বা যাদের নিজস্ব ধর্মীয় বা আত্মিক বিশ্বাস আছে (যেমন ভারতের যোগীরা)। বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এমন আছেন যারা ইচ্ছে করে স্থায়ী ঠিকানা গড়তে চান না। এও মনে করা হয় যে যারা চান যে তারা গৃহহীন থাকবেন, আসলে তাদের কোনো মানসিক অসুস্থতা আছে বা এমন জীবনযাত্রাই বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাদের চাহিদা সামাজিকভাবে স্বীকৃত যা কিনা কোনো স্থায়ী আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে সমর্থন করে না।

● **ড্রাগ ও মদের নেশা ঃ** যেসব ব্যক্তিরা কোনো স্থায়ী চাকরি বজায় রাখতে পারেন না বা বহুদিন ধরে ড্রাগ বা মদের নেশায় আচ্ছন্ন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরাই গৃহহীন। এর একটা কারণ এই যে মদের বা ড্রাগের নেশা থাকার জন্য এরা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। অন্যথায় এই পরিবার বা বন্ধুবান্ধব তাদের থেকে সহায়তার জাল তৈরি করতে পারতেন।

● **আয়ের অসাম্য ঃ** কারো কারো হাতে অধিকমাত্রায় সম্পদ ও অন্যদিকে আয়ের অনৈক্য বাড়ি তৈরির বাজার বা বাড়ি ভাড়ার হারকে এমন উচ্চতায় পৌঁছে দেয় যে বাড়িতে থাকার খরচ আকাশ ছোঁয়া হয়ে পড়ে।

● **বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়া ঃ** সাধারণভাবে সম্পদ ও আয়ের বণ্টনের অনৈক্যের এক ফল হল বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়া। তাছাড়া এই কারণে বিংশ শতাব্দীতে বাড়ির আয়তনও ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে।

● বেঁচে থাকার জন্য চাকরির অভাব।

● **প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঃ** হাজার হাজার নিউ ওরলিয়েন্ডস বা লুইসাজার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ক্যাট্রিনা হারিকেনের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েন বারবার।

২০০২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া কোস্ট ইউনিভার্সিটিতে একটি গবেষণাপত্রে রবার্ট ই. ব্রিক্নার গৃহহীনতার প্রাথমিক কারণ অন্বেষণ করে সেগুলিকে একটি তালিকাভুক্ত করেন। এগুলি ক্রমিক না হলেও এগুলি কতগুলি বর্গের ভাগ বলা যেতে পারে।

১. বেকারত্ব

২. পর্যাপ্ত আয়ের অভাব (চাকরি চলে যাওয়া, বেকারত্ব ইত্যাদি)।

৩. গৃহের অভাব (উঠে যাওয়ার জন্য, বাড়ি তৈরি করতে না পারার জন্য ইত্যাদি)।

৪. শিকার হওয়ার ফলে (প্রাকৃতিক কারণে, অপরাধী হওয়ার জন্য, অপ্রকৃতিস্থ কারণের জন্য ইত্যাদি)।

৫. স্বাস্থ্যের সমস্যা।

৬. ব্যক্তিগত ইচ্ছে।

৭. পরিবার ভেঙে যাওয়ার জন্য (ডিভোর্স বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বা পালিয়ে আসার জন্য)।

৮. মানসিক অসুস্থতা।

৯. কোনো ধরনের বস্তুর নেশা।

১০. জীবনঘাতক এমন জীবনযাত্রার অভ্যাস (কোনো নেশার বস্তুর কথা বাদ দিয়েও)।

উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহ ঃ বর্তমান সময়ে গৃহহীনদের সংখ্যা বিশ্বজুড়ে ক্রমশই বাড়ছে। কিছু তৃতীয় বিশ্বের দেশ যেমন ব্রাজিল, ভারত, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গৃহহীনতা ক্রমশ বাড়ছে। এসব জায়গায় মিলিয়নের বেশি শিশু রাস্তায় থাকে এবং কাজ করে। চিন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্সেও গৃহহীনতা একটি সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। তার কারণ মূলত প্রব্রজনকারী শ্রমিকদের জন্য যারা স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুলতে পারেন না এবং যাদের ক্ষেত্রে আয়ের অনৈক্য থাকায় শ্রেণিভেদ অত্যন্ত তীব্র।

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ভারত সম্পর্কে খুব সহজ সাধারণীকরণে পৌঁছানো যায়—বলা হয়ে থাকে ভারতের অস্তিত্ব তার গ্রামেই। যদিও এ কথা সত্যি নয় কারণ ব্যাপক হারে শিল্পায়ন, নগরায়নে, প্রাকৃতি সম্পদের বিকাশ, উন্নয়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক অগ্রাধিকার এবং আরও নানা কারণের জন্য ব্যাপক হারে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরের দিকে প্রব্রজন ঘটছে।

১৯০০ সালে মাত্র ১১টি শহর ছিল যেখানে জনসংখ্যা ছিল ১ মিলিয়ন কিন্তু ২০০০ সালে প্রায় ৩০০টি শহর গড়ে ওঠে। ২০১০-এর মধ্যে আরও প্রায় ৫০টি শহর গড়ে উঠবে যেখানে ১৫ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা হবে।

আজ ভারতে প্রায় বিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের বাস যার মধ্যে ১৬৪ মিলিয়ন বা ২৩% শহরে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারত প্রধানত গ্রামভিত্তিক দেশ হলেও এর শহরভিত্তিক জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান।

যদি বম্বের কথাই বলা যায় তাহলে ২০ বছর আগে যেখানে ৪,০০,০০০ দখলকারী থাকত ৪.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে সেখানে আজ ৪.৫ মিলিয়ন দখলকারী আছে ৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে। সুতরাং দেশ যেখানে ৫০% অগ্রসর হয়েছে সেখানে শহর বেড়েছে ১০০% এবং দখলকারীদের সংখ্যা বেড়েছে ১১০০%-এর বেশি।

প্রব্রজন ঃ শহরে মানুষ আসে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এবং বিশ্বে এমন প্রব্রজন তেমন চোখে পড়ে না। মানুষ অনেক কারণে শহরে আসে—চাকরির খোঁজে, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে। শহরে চলে আসার আরও একটি প্রধান কারণ গ্রামীণ দারিদ্র্য।

একটি অর্থনৈতিক সক্রিয় জীবন চালানোর পক্ষে গ্রামের মানুষদের কাছে তেমন সম্পদ থাকে না। যারা শহরে চলে আসে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ পুরুষ ও মহিলাই চাষি বা চাষক্ষেত্রে শ্রমিক। প্রব্রজনকারী শহরে পা রাখার পরই আশ্রয় নেয় দখলদারি হিসাবে রাস্তার ধারে বা প্রান্তিক কোনো এলাকায়। জনসাধারণের চোখের সামনে তারা তাদের আত্মীয়দের কাছে থাকে এই আশা নিয়ে যে কর্তৃত্বের চোখে একদিন তারা পড়বে যে তারা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জায়গা অধিকার করে আছে।

● এর উত্তর কোথায় ?

গৃহহীনতার সমাধান বিশেষ করে নিম্ন আয়ভোগী পরিবারের ক্ষেত্রে তৈরি বাড়ি প্রদানে নয় কিন্তু তাদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ইচ্ছেকে জাগিয়ে তুলে নিজেদের বাড়ি ও পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলায়।

সরকার অনেক সময়ই যা অনুভব করে না তা হল যে মানুষ নিজেই একটি বড়ো সম্পদ। একজন মানুষ তার অর্থনৈতিক ভিত্তি যত জোরদার করবে, সমাজে তার অবস্থান তত উন্নত হবে এবং একটি স্থায়ী বসবাসের জায়গা গড়ে তোলার পক্ষে তা সহায়ক হবে। এমনকি সে শহরে তার বসবাসের ঠিকনাও বদলাতে পারে।

যেসব কার্যধারায় এই কথাটি মনে রাখা হয় না যে মানুষের প্রব্রজনের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে সেগুলিই পরবর্তীতে অকৃতকার্য হয়। শুধুমাত্র একটি বাড়ি তৈরি করে দিলেই হয় না কারণ সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজের চেষ্টায় বাড়িটিকে আরো উন্নত করতেও সক্ষম হয় না বা ঐ অবস্থায় রাখতেও সক্ষম হয় না।

মানুষের মধ্যে সেই দক্ষতা, প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণের ক্ষমতা, একটি বাড়ি তৈরির ঐকান্তিকতা থাকে। প্রয়োজন মাফিক বাসস্থান গড়ে নেবার।

গ্রাম থেকে আগত পরিবারগুলি শহরের কোন কোন অঞ্চলকেও গ্রামীণ রূপ দেয় যা সরকারী আধিকারিক এবং পরিকল্পনাবিদদের মনে রাখা উচিৎ গৃহহীনদের জন্য নীতি নির্ধারন ও প্রকল্প রচনার সময়।

ধর্ম, লোকনীতি, সামাজিক সংগঠন, জীবনচর্চা আধুনিক শহরে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি শহুরে জীবনে বৈচিত্র্য দান করে। গ্রামীণ রূপকে বজায় রাখা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ শহুরে প্ল্যানারদের কাছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদরা বিবর্তনের ধীরগতিকে

বুঝতে পারেন না যা বিশেষভাবে দখলদারিদের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে জানা দরকার। সুতরাং এই ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া বেশিরভাগই উন্নত দেশে ব্যবহৃত পদ্ধতির নকল হয়ে যায় যদিও আবহাওয়া ও সংস্কৃতির তফাৎ দুই দেশের মধ্যে অনেক বেশি।

সুতরাং পরিকল্পনাবিদ ও সরকারি আধিকারিকদের নিজেদের ভুলগুলো বোঝা উচিত এবং পরিকল্পনায় নতুন দিগন্ত নিয়ে আসা দরকার। এর ফলে প্রব্রজকদের সনাতনী থাকার ক্ষেত্রের কাঠামোর সঙ্গে তাদের প্রচেষ্টাকে মেলানো দরকার।

ঘরবাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে নানান দিকের কথা ভাবতে হয়। সেজন্য স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের তাদের পেশাদার জীবনের বাইরে এসে আবেগ, মনস্তত্ত্ব, ঐকান্তিক ইচ্ছে, সামাজিক পরিসেবা, মধ্যবর্তী রাজনীতি প্রভৃতিকে মাথায় রেখে শুধুমাত্র পেশাদারি অংশগ্রহণ করলে চলবে না।

এই সমস্যাকে তার সামগ্রিকতায় দেখতে হবে। একটি পরিকল্পনা করলেই এক্ষেত্রে চলবে না। দরকার, বিশেষ আচরণ (বা আচরণের বদল)—এক নতুন ধরনের ভাবনা। পুরো বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দরকার।

ঐকান্তিক ইচ্ছে, আন্তঃসম্পর্ক, পেশা, স্বনির্ভরতা সম্প্রদায়ে থাকার পক্ষে উপযুক্ত দক্ষতা, উন্নতিসাধন এই শব্দগুলির স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদের শব্দকোশে যেমন আছে, তার পাশাপাশি আদর্শ, মৌল কাঠামো, অর্থ, পরিসেবা ও জমি এই শব্দগুলিও রাখতে হবে।

উপসংহার

বাড়ি তৈরি শুধু একটি কারিগরি সমস্যা নয়। এটি একটি সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাও। এর জন্য দরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং দরকার বিকেন্দ্রীকরণ, বিপ্রাতিষ্ঠানিকতা যা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। স্বনির্ভর বাড়ি তৈরির প্রকল্প শুধুমাত্র আশ্রয়ই দান করে এমন নয় মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ও সম্পদ তৈরি করতেও সাহায্য করে। একটি বাড়িকে একটি আশ্রয়ে পরিণত করতে সাহায্য করে।

এই সমস্যার গভীরতা যাই থাকুক না কেন, বা সম্পদ যতই সীমিত হোক না কেন, গৃহহীনদের আশ্রয়দান অসমাধানযোগ্য সমস্যা নয়। এটি একটি চ্যালেঞ্জ।

৩.৪ অনুশীলনী

(১) ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধ মানুষদের যে সমস্যা আছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

(২) অক্ষম মানুষদের ধারণা, রূপ ও তাদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের ব্যাখ্যা করুন।

(৩) গৃহহীনতা কাকে বলে? এটি কেন হয়? এর সম্ভাব্য সমাধানগুলি কী কী?

একক ৪ ❑ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যলোচনা, সমস্যার রূপরেখা, মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা, সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান (Problem of women : historical revised problem of atrocities against women, policy to combat the problem)

গঠন

৪.১ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

৪.২ সমস্যার রূপরেখা

৪.৩ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা

৪.৪ সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নারী-পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট। কিন্তু সম্ভবত কোনো যুগেই তারা সমমর্যাদা ও সমসুবিধা ভোগ করেনি। তবু কালভেদে তাদের অবস্থানগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। স্বভাবতই বলা যায় সমস্যার ধরন, ব্যাপ্তি ও গভীরতায় কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে বিভিন্ন কালে। উপনিষদের যুগে নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে লক্ষ্যণীয় কোনো বৈষম্য ছিল না। এমনকি ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই উপনয়ন দেওয়ার বিধি ছিল। বৈদিক যুগেও আধ্যাত্মিক কাজে, সাধন পথে, বিদ্যাচর্চায় নারী যুক্ত থেকেছে। ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মবাদিনী, সিদ্ধি, তাপসী ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহার যেহেতু এই যুগেই শুরু হয়েছে তাই অনুমান করা যায় যে এই যুগে নারী সম্মান ভোগ করেছে। উসন্তীর মতো বেদজ্ঞা এবং জবলার মতো সত্যনিষ্ঠা ও সাহসিনী নারী বৈদিকযুগের সমাজে বাস করেছেন। উপনিষদের কালে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর নামও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এভাবেই আমরা দেখি যে, সুপ্রাচীনকালে নারী নৃত্য, গীত, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। অপলা, উর্বশ্রী, লোপামুদ্রা, কুন্তীও যথেষ্ট খ্যাতনাম্নী তাদের বিভিন্ন গুণের জন্য। ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়

শিক্ষাতেই তারা শিক্ষিতা ছিলেন। বৌদ্ধযুগেও যথেষ্ট শিক্ষিতা নারী ছিলেন। যেমন—শুভা, অনুপমা, চিত্রলেখা, সুমেঘা ইত্যাদি।

এরপর ক্রমশ নানান সামাজিক সমস্যার প্রভাবে শিক্ষা সমেত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজ সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। তাদের 'অবলা' হিসাবে চিহ্নিত হওয়া শুরু হল। বিবাহসমেত নানান প্রথা এর জন্য দায়ী। 'পতি পরমেশ্বর' ভাবনার বীজ রোপিত হল সমাজে। পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ এসব প্রথাও সমাজে প্রচলিত হয়ে নারীর অবস্থানগত অধোগতি নিশ্চিত করল।

বর্তমানকালে নারীর অবস্থান মিশ্রিত। একশ্রেণির নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে, চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হয়ে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অবস্থানগতভাবে ভালো জায়গায় রয়েছেন। আর এক শ্রেণির নারী কিছু কিছু সুবিধা ও অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে আবার কিছু কিছু বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হয়ে দিনাতিপাত করছেন। কিন্তু সিংহভাগ নারী—বিশেষত গ্রামাঞ্চল ও শহরের বস্তি অঞ্চলের নারী অবস্থানগতভাবে তৃতীয় এক শ্রেণিতে রয়েছেন। এই শ্রেণিটি হল অশিক্ষা, কুসংস্কার, নির্যাতন, অবহেলা, মর্যাদাহীনতা, সামাজিক ও আর্থিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের শিকার, ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া শ্রেণি। যদিও নারীকে সর্বযুগেই কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চলতে হয়েছে তবুও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে তা ক্রমশ যেন জটিল আকার নিচ্ছে।

৪.২ সমস্যার রূপরেখা

মহিলাদের সমস্যাগুলি প্রধানত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক যেগুলি তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি বা বিকাশকে রোধ করে।

সমস্যাগুলির ধরন হল ঃ

(১) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সমস্যা (Problem of illiteracy & lack of education)

(২) সামাজিক বৈষম্য ও অধঃস্তন মর্যাদা (Social discrimination and inferior status)

(৩) নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি ও নিরাপত্তার সমস্যা (Controlled movement & problem relating to safety)

(৪) পেশাগত ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য (Wage discrimination)

(৫) অর্থনৈতিক পর নির্ভরতা (Economic dependence)

(৬) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতাভোগ (Enjoying limited political power)

(৭) পণ বা যৌতুকপ্রথা (Dowry)

(৮) বাল্যবিবাহ (Child marriage)

(৯) হীনমন্যতা (Inferiority complex)

(১০) প্রশাসনিক ও পরিচালন কাজে সীমিত অংশগ্রহণ (Limited participation in Administrative and managerial role)

(১) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা ঃ পুরুষের তুলনায় ভারতে মহিলাদের শিক্ষার হার অনেক কম। মহিলাদের লেখাপড়া শেখার খুব একটা দরকার আছে বলে মনে করা হয়নি। তারা ঘরে থেকে সংসারের কাজ করবে বা সন্তান লালনপালন করবে। এটিই ছিল সাধারণ ধারণা। ফলে তাদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে প্রায় সর্বত্র। মহিলারাও যে অফিস কাছারিতে কাজ করে, অর্থ উপার্জন করতে পারে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, নিজের ও সংসারের দায়িত্ব নিতে পারে, নিজেদের ভাবনাচিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে এগিয়ে দিতে পারে এই ধারণার অভাবেই মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। ফলে সমাজের ওপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সকলস্তরেই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা একটি সমস্যা হিসাবে মহিলাদের গ্রাস করেছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে নীচে একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

টেবিল ঃ ১

সাক্ষরতার হার—বিভিন্ন সময়ে

গণনা বর্ষ	মহিলা	পুরুষ	ব্যক্তি
১৯৫১	৮.৮৬	২৭.১৬	১৮.৩৩
১৯৬১	২৮.০৩	৪০.৪০	২৮.০৩
১৯৭১	৩৪.৯৬	৪৫.৯৬	৩৪.৪৩
১৯৮১	৪৩.৫৭	৫৬.৩৮	৪৩.৫৭
১৯৯১	৫২.২১	৬৪.১৩	৫২.২১
২০০১	৫৩.৬৭	৭৫.২৬	৬৪.৮৪

টেবিল ঃ ২

৬-১৪ বছরের মেয়ে যারা স্কুলে যায় না তাদের হিসাব ঃ

প্রদেশ	শতকরা সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৭%
উত্তরপ্রদেশ	৫২%
রাজস্থান	৫৯%
বিহার	৬২%
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৫%
মধ্যপ্রদেশ	৪৫%

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যে দশকেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর সাক্ষরতা/শিক্ষার হার যথেষ্ট কম। ২০০১ সালেও সেই ব্যবধান প্রায় ২২ ভাগ। শিক্ষাক্ষেত্রেও কন্যা শিশু বা মেয়েরা যথেষ্ট সংখ্যায় বঞ্চনার শিকার।

(২) সামাজিক বৈষম্য ও অধঃস্তন অবস্থান ঃ সমাজে নারী পুরুষ সকলেরই সমান মর্যাদা, সমান স্বাধীনতা ও সমান অধিকার ভোগ করার বিধান আছে ভারতের জাতীয় সংবিধানে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের 'মানব অধিকার' ঘোষণাপত্রে। কিন্তু বাস্তবে ভারতবর্ষে বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে মহিলারা সেই মর্যাদা, স্বাধীনতা বা অধিকার তেমনভাবে পান না। সমাজের সকল স্তরে আজও মহিলাদের মর্যাদাহানি, স্বাধীনতা ও অধিকারহানি করা হয়। যা মহিলাদের বিকাশের বা অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় খাওয়াপরা থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বৈষম্যের কারণে একজন কন্যা সন্তানকে একজন পুত্র সন্তানের থেকে আলাদা করে দেখা হয়। কন্যা সন্তানের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে উদাস থাকা হয়। মহিলাদেরকে অধঃস্তন, কম জোরি, দুর্বল ভাবা হয়, যা মহিলাদের বেড়ে ওঠার পথে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মহিলা বলেই সমাজে তাকে হেয় ও দুর্বল হয়ে থাকতে হয়। শুধুমাত্র মহিলা বলেই সে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটাতে বা প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে না এই বিধি উন্নয়ন সহায়ক নয়।

(৩) নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি ও নিরাপত্তার সমস্যা ঃ মহিলাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তাদের চলাফেরা, গতিবিধির ওপর। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপরে চাপানো হয়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। পর্দাপ্রথা, শুধু গৃহস্থালির কাজে আটকে রাখা মহিলাদের বিকাশের পথে একটি বিরাট বাধা। মানুষের বিকাশকে বাস্তবায়িত করতে হলে তার ভিতরের শক্তি সম্ভাবনার প্রকাশ উপযোগী পরিবেশের জোগান দেওয়া জরুরি। বিভিন্ন

কাজে যুক্ত থেকে, নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি তার জ্ঞান, দক্ষতা ও গুণের প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় মহিলা সেই সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও অনুভব করেন ভারতের মহিলা সমাজ। স্বাধীনভাবে চলাফেরা, সামাজিক সুবিচার, সামাজিক নিরাপত্তা এগুলি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার। কেন সে এসব থেকে বঞ্চিত হবে ? নিজের মত ও বক্তব্য প্রকাশ স্থান, কালের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ নয়। কিন্তু এই স্বাধীন মত ও বক্তব্য প্রকাশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাও দরকার।

(৪) পেশাগত ও পারিশ্রমিকের বৈষম্যগত সমস্যা ঃ এ দেশের প্রচলিত প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গি হল সমস্ত কাজ মহিলাদের জন্যে নয়, তার যোগ্যতা বা দক্ষতা থাকলেও। কিছু বিশেষ বিশেষ কাজ বা পেশা মহিলাদের জন্যে অলিখিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজের অধিকার জন্মায়। কিন্তু উপযুক্ত মানসিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মহিলারা সাধারণভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমাজে পেশাগত বৈষম্য যেমন আছে তেমনি আছে একই কাজের জন্য পারিশ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন হার। একই কাজের জন্য পুরুষদের একরকম পারিশ্রমিক আর মহিলাদের আর এক ধরনের পারিশ্রমিক। সাধারণত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই বেতন বৈষম্য বিশেষভাবে বর্তমান। পেশা ও পারিশ্রমিকের এই বৈষম্য মহিলাদের অমর্যাদা প্রদান করে। সেহেতু এই বৈষম্য সমস্যা অচিরেই দূর করা প্রয়োজন।

(৫) অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ঃ ভারতীয় মহিলাদের জীবনে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা আর এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সব স্বাধীনতার মূলকথা। সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ না করা মহিলার সংখ্যা বিস্তর। সুতরাং স্বনির্ভর না হয়ে পরনির্ভর হয়ে আমৃত্যু অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় অধিকাংশ মহিলাকে।

(৬) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতা ভোগ ঃ রাজনৈতিক আঙিনায় মহিলাদের বিচরণও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে আইন করে ৩৩ ভাগ মহিলার সদস্যপদ নিশ্চিত করা গেলেও ক্ষমতার উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলিতে (বিধানসভা, লোকসভা এবং রাজ্যসভা) তাদের যোগদানের হার একেবারে নগণ্য। নীতি নির্ধারণের, পরিকল্পনা গ্রহণের এই পীঠস্থানগুলিতে তাদের ভূমিকা কোনোভাবেই উল্লেখযোগ্য নয়।

(৭) পণ বা যৌতুক ঃ বিবাহের সময় বা আগে-পরে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক বা পণ দেয়। এই পণ বা যৌতুক দেওয়ার রীতি কী শহরে কী গ্রামে সকল সমাজেই বিদ্যমান। বরপক্ষকে এই পণ 'টাকায়' অথবা বস্তুসামগ্রীতে দেওয়া হয়। যেটি ব্যয়সাপেক্ষ ও সামাজিকভাবে অপমানজনকও। এভাবে

মেয়েপক্ষের কাছ থেকে পণ গ্রহণ মহিলাদের কাছে অপমানকর। মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং সংসার জীবনে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপেই এই ধরনের বৈষম্য তৈরি করা অত্যন্ত মর্যাদাহীন কাজ। এই পণের কারণে মহিলাদের বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে নানা গঞ্জনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ছেলেপক্ষ তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পণ সামগ্রী না পেলে বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অনেক সময় পণ সামগ্রী ও পণের টাকা না জোগাড় করতে পারলে মহিলার বিবাহ আটকে যায়। অনেক মহিলাকে সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হয়। নানা সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় এই পণপ্রথার কারণে।

(৮) বাল্যবিবাহ (Child marriage) ঃ অল্পবয়সে বিবাহ আর একটি বড়ো সমস্যা মেয়েদের কাছে। সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও কার্যত এই ব্যবস্থা সমাজের সর্বস্তরে এখনও বিদ্যমান। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ১৮ বছরের আগেই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন এই ঘটনা একেবারে বিরল নয়। কোনো মেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিণত হওয়ার আগেই বিবাহ হলে পরবর্তীকালে নানা সামাজিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। সুতরাং অল্পবয়সে বিবাহ ও পরিবার গঠন মেয়েদের কাছে এক কঠিন সমস্যা।

(৯) হীনমন্যতা ঃ সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিপদক্ষেপে একটি মেয়েকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় যে, সে ছেলেদের থেকে সবদিক দিয়েই দুর্বল এবং আলাদা। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধানিষেধ থাকে অনেক। এর ফলে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে কিছু ত্রুটি থেকে যায় এবং অনেকেই কিছুটা হীনমন্যতার শিকার হয়। তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভা থাকলেও অনেক সময় তা ঠিকঠাকভাবে বিকশিত হয় না। হীনমন্যতা এমন এক সমস্যা যা মানুষকে তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। একজন কন্যা বা মহিলা সাধারণত এই সমস্যার শিকার।

(১০) প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অনেক কম ঃ

রাষ্ট্র, প্রদেশ, জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তরের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের হার অত্যন্ত কম। এই অবস্থা প্রমাণ করে যে মহিলারা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি থেকে যায়।

এদেশের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ যথাযথভাবে থাকলে মহিলাদের পক্ষেও তাদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলিকে নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে সমাধানের সঠিক পথ বার করা সম্ভব হত।

৪.৩ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা

নারীর ওপর নির্যাতনও নতুন কোনো সমস্যা নয়। নির্যাতনের ঘটনা ও বৈচিত্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পণ ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে নিয়মিত। এক্ষেত্রে, ধনী-নির্ধন, গ্রামীণ-শহুরে হিসাবে কোনো পার্থক্য নেই। যৌন-নির্যাতনের ঘটনা ও ধরনও ক্রমবর্ধমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, জল-স্থল-আকাশপথের যানবাহন, বসবাসের এলাকা, হাটবাজার, সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান এবং এমনকি নিজের বাড়ির সদস্য ও আত্মীয়বর্গের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে উদ্‌বেগজনকভাবে। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর না হওয়ার কারণেও শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হয় বহু মহিলাকে। নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকর্ত্রীর হাতেও নির্যাতনের শিকার হতে হয় অধিকাংশ কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের। সাধারণ শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার মহিলাদের কর্মস্থল হল মূলত অসংগঠিত কিছু ক্ষেত্র। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বাড়ির সহায়িকার কাজ। এইসব কাজে যুক্ত মহিলারা নানা রকমের নির্যাতন ভোগ করেন। দেহব্যবসায়ের সঙ্গো যুক্ত হয়ে পড়া বা হতে বাধ্য হওয়া মহিলাদের নির্যাতনের ধরন ও মাত্রা আরও অসহনীয়। এভাবে আমরা দেখি যে নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ ঘটে চলেছে জীবন জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নির্যাতনের যে সামান্য খবর প্রকাশ্যে আসে তাই পীড়াদায়ক। আর যা সাধারণের অগোচরে থেকে যায় তার পরিমাণ অনুমান ক্ষমতার বাইরে।

৪.৪ সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান

মহিলাদের সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতবর্ষে নানা নীতি ও আইনি বিধান তৈরি হয়েছে। যেমন হিন্দু কোড বিলে মহিলাদের জন্যে ৬টি বিষয়ে আইনি সহযোগিতা ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে—(১) বিবাহ (২) বিবাহবিচ্ছেদ (৩) সম্পত্তির উত্তরাধিকার (৪) পোষ্য বা দত্তক (৫) অর্থনৈতিক কাজের অধিকার (৬) সর্বসাধারণের (Public) স্থানে প্রবেশ অধিকার। মহিলারা যাতে এইসব সুযোগ ভোগ করতে পারে প্রশাসন সে বিষয়টি দেখার ব্যাপারে সজাগ থাকবে। ১৯৫৮ সালে মহিলা শিশু শ্রমিক বন্ধ করার জন্যে এবং যৌন কর্মী হিসাবে কিশোরী, মহিলাদের বাধা দেওয়ার জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন তৈরি হয়। ধর্ষণ ও বলাৎকার বিষয়ে সরকার ক্রিমিনাল আইন প্রণয়ন করেন। ধর্ষণ অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে সশ্রম কারাদণ্ডের চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। মহিলাদের বিরক্ত করার (eve-teasing) ক্ষেত্রেও শাস্তিযোগ্য আইনি বিধান রয়েছে। অর্থ জরিমানা ও কারাবাস অপরাধীর জন্যে প্রাপ্য। নারী পাচার আর একটি অপরাধযোগ্য কাজ। সরকার এক্ষেত্রেও আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন অপরাধীর শাস্তির জন্য। কর্মস্থল বা অন্য কোথাও মেয়েদের প্রতি যৌন হয়রানি করা হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। সম্প্রতি

এই বিধান আরও কড়াকড়ি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। অশোভনীয় আচরণ করা, তাদের বিরক্ত করা ইদানীংকালে বেড়ে যাওয়ায় প্রশাসন এ ব্যাপারে অনেক তৎপর হয়েছে। যারা এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করা বিশেষ প্রয়োজন। শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থায় এই সমস্যা প্রতিহত করা যাবে না। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে। তাহলেই নারীদের অনেক সমস্যা সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে। মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই আরও বেশি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সকলের জন্যে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার সুযোগ সকলকে নিতে হবে। এই বিধান অনুসারে পণ প্রথার বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পণ দেওয়া ও পণ নেওয়া অপরাধ। কোনো পক্ষ পণের ব্যাপারে জোরজুলুম করলে বা পণ নিচ্ছে জানতে পারলে পুলিশ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে। এক্ষেত্রেও হাজতবাস ও জরিমানা দুই শাস্তিই হতে পারে। মহিলারা পরনির্ভরতা কাটিয়ে স্বনির্ভর হলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সবরকম অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা পেলে তাদের বিরুদ্ধে যেসব সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে, সমাজে বৈষম্যকে বজায় রাখছে সেগুলো দূর হবে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মর্যাদা ও সমান অধিকার আদায় করার জন্য শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা (অর্থনৈতিক) এই দুটি অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র নীতি প্রণয়ন বা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সবসময় হয় না। দরকার সামাজিক চেতনা, শিক্ষা ও উদার মানসিকতা।

৪.৫ অনুশীলনী

(১) মহিলাদের সমস্যা বলতে কী বোঝেন? মহিলাদের সমস্যার বিশদ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিন।

(২) মহিলাদের সমস্যা ও মহিলাদের ওপর নির্যাতন কি এক? দুটির বিষয়ে আলোচনা করুন।

(৩) মহিলাদের সমস্যার আইনি বা নীতিগত বিধান বিষয়ে তোমার বক্তব্য আলোচনা করুন।

৪.৬ প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থ

(১) নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান—রোকেয়া কবির

(২) ভারতীয় মহিলা—যশোধরা বাকচি সংকলিত।

(৩) নারী মুক্তি আন্দোলন—প্রতিবেদন বেজিং কনফারেন্স

একক ৫ ❑ নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যা। তার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা ও কারণ। পাচার নিবারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা (Problem of trafficking of women & girls, its nature, extent, magnitude & causes. Social, economic & legal measures for prevention)

গঠন

৫.১ নারী পাচার সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা

৫.২ কারণসমূহ

৫.৩ সমস্যা নিরসনে আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

৫.৪ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ নারী পাচার সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা

কিছু অসাধু মানুষ অসদ্ উপায়ে সহজে অনেক বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য দুঃস্থ অল্পবয়সি মেয়ে থেকে মাঝবয়েসি মহিলাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করে। একেই নারী ও মেয়ে পাচার বলা হয়। এ কাজ শুধু একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না। অনেক মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারা একটি চক্র বা গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে, যাকে 'পাচার চক্র' বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্তরে কাজটি সংগঠিত হয়। একদল মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে, গ্রামে ঘুরে ঘুরে সম্ভাব্য মেয়ে ও মহিলাদের শনাক্ত করে। এই আড়কাঠির দল সেই খবর কোনো একটি চক্রের কাছে পৌঁছে দেয়। তারপর নানা অছিলায় এরাই তাদের সঙ্গে, তাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে পরিচিত হয় এবং অভাবী পরিবার ও গরিব মেয়েটিকে নানাভারে প্রলোভন দেখায়। কখনও ভালো বিয়ের, ভালো খাওয়া-পরার, ভালো চাকরির আবার কখনও বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার। যারা এই প্রলোভনের শিকার হয় সেইসব মহিলা বা মেয়েদের সাধারণত কোনো সাময়িক আশ্রয়ে রাখা হয়। পাচার হওয়ার আগে তাদের তোলা হয় নির্দিষ্ট কিছু বাড়িতে। এখানে অনেক সময় তাদের সঙ্গে যৌন অত্যাচার বা শারীরিক পীড়নও করা হয়। তারপর সুযোগমতো তাদের পাচার করা হয় দেশের/রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। মানুষের দারিদ্র্যের, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষ এই ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ মহিলা পাচার শুধু দেশের মধ্যে সীমাবন্ধ নয়। এটি এখন আন্তর্জাতিক একটি সমস্যা। আর এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ছড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের ভিড়ে। এদের জাল রাজ্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশেও বিস্তৃত, প্রসারিত। সমস্যাটি গভীরতায় অনেক বেশি ভয়াবহ। বিশাল আন্তর্জাতিক চক্র, মাফিয়া ডন, শিক্ষিত বড়ো মাথা অসাধু ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত।

মূলত এদের বাধ্য করা হয় যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে। যার আয়ের সিংহভাগই পাবে তার মালিক যে তাকে অর্থের বিনিময়ে কিনেছে। কোথাও আবার তাদের বাধ্য করা হয় গৃহকর্ম বা অন্য কোনো কাজে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে। নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণের শিকার হতে হয় তাদের। অনেক সময় স্থানীয় পাচারকারী থেকে রাজ্য, দেশ হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ কিছু হাত ঘুরে এইসব পাচার হওয়া মেয়েরা পৌঁছে যায় বিদেশেও। এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, দুবাই ও আরব দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়েরা পাচার হয়ে যায় 'চেইন সিস্টেমে'। সুতরাং এই জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে মহিলাদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই মেয়েদের ভালো খাওয়া-পরা, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার লোভ দেখিয়ে, কাজের লোভ দেখিয়ে, সু-পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ও সামাজিক নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে পাচার করা হয় মোটা অর্থের বিনিময়ে। ছোটো, বড়ো, মাঝারি বিভিন্ন আকারের নানা চক্র এ কাজে যুক্ত রয়েছে। কোনো চক্র আঞ্চলিক স্তরে কাজ করে। কোনো চক্র জেলা বা গোটা দেশে কাজ করে। আবার কোনো চক্র আন্তর্জাতিক স্তরে চক্র হিসাবে কাজ করে। সকলেরই উদ্দেশ্য এদের অসৎ উপায়ে অর্থ রোজগার করা। নারীকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে, তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ না ঘটতে দিয়ে মানুষ হিসাবে সবরকম অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে কিছু দুষ্কৃতি মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য নারীকে ব্যবহার করছে তাদের ব্যাবসার পণ্য হিসাবে, যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও গভীরতা অনেক ব্যাপক। এই সুদূরপ্রসারী পাচার চক্রের হাল হকিকত আজ পর্যন্ত যেটুকু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে তাতে এটি আন্তর্জাতিক স্তরের অপরাধগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে চিহ্নিত।

৫.২ কারণসমূহ

নানা কারণে ভারতবর্ষে নারী বা মেয়ে পাচার সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে প্রধানত নিম্নলিখিত কারণগুলিই এই সমস্যার জন্য দায়ী ঃ

(১) দারিদ্র্যতা ঃ দারিদ্র্যতা মহিলা পাচারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। যেহেতু এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে তাই সেই সুযোগ নিয়ে, স্বচ্ছল জীবনের মিথ্যে প্রলোভনে ভুলিয়ে অল্পবয়েসি মেয়ে থেকে শুরু করে নানা বয়সের মহিলাদের অর্থের বিনিময়ে

পাচার করা হয়। আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার লোভে পাচার হওয়া মেয়েদের অনেকে এদের চক্রান্তের শিকার হয়।

(২) নিরক্ষরতা এবং অচেতনতা ঃ নিরক্ষরতা এবং অচেতনা হল এই সমস্যার পিছনে আরও একটি বড়ো কারণ। এই ধরনের মানুষকে সহজেই ষড়যন্ত্রের শিকার করা যায়। পাচারকারীরা এই সুযোগটিই নিয়ে থাকে পাচারের ক্ষেত্রে।

(৩) সে মহিলা; সে দুর্বল ঃ লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে মহিলারা দুর্বল—মানসিক ও শারীরিকভাবে। সুতরাং বাড়ির অভিভাবকরা যেমন তার ওপর জোর খাটায় তেমনি পাচারকারীরাও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

(৪) যৌন ব্যবসা একটি লাভজনক ও চাহিদাজনক ব্যাবসা ঃ প্রাচীনতম একটি পেশা যৌন ব্যাবসা যার চাহিদা আধুনিক যুগে নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই চাহিদাকে বাড়াতে। এই ব্যাবসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই লাভজনক ব্যাবসার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে নারী পাচার/নারীর জোগান অত্যন্ত জরুরি। তাই সুপরিকল্পিতভাবে নারী পাচারের গোপন ব্যাবসা চলছে দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে অত্যন্ত উদ্‌বেগজনকভাবে।

৫.৩ সমস্যা নিরসনে আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ঃ

(ক) সামাজিক পদক্ষেপ ঃ সামাজিকভাবে মহিলাদের পুরুষের সমান মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদেরকে বা অন্যরা মহিলাদেরকে দুর্বল, হেয়, অসমান না ভাবে। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে সামাজিক বৈষম্য যেন কোনো ভাবেই তৈরি না হয় তা দেখা দরকার। এ বিষয়ে তাদের সুযোগ ও অধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বোধ বা চেতনা জাগ্রত করা দরকার। নারী পুরুষের মধ্যে সব ধরনের সামাজিক বৈষম্য দূর হলে নারীর আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জন্মাবে। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য দূর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। নিরক্ষরতা বা অশিক্ষা দূর করা, শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা এবং সচেতনতার হার বৃদ্ধির মাধ্যমেও এই সমস্যার নিরসনে সাহায্য করা সম্ভব।

সামাজিক সমতা, সামাজিক স্বীকৃতি, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার পেলে নারী পাচার নিবারণের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং সরকার ও সমস্ত জনসাধারণকে এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে। এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ তাকে দিতে হবে। পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে নারী পাচার প্রতিরোধ কমিটি তৈরি করে গ্রামে গ্রামে নারী পাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা আর একটি সামাজিক কাজ।

(খ) অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ঃ দারিদ্র্য নারী পাচারের আর একটি বড়ো কারণ। অন্যের ওপর

নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে হলে তার নিজের ইচ্ছার তেমন মূল্য থাকে না। তাই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। শিক্ষার মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের কাজের উপযোগী করে তোলা দরকার। কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে স্বাধীনভাবে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হলে আপনা থেকেই নারী পাচার কমে আসবে। সুতরাং মেয়েদের অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের অন্য নানা ধরনের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে চালানজনিত সমস্যার মোকাবিলায় সাহায্য করবে।

(গ) **আইনি ব্যবস্থা ঃ** নারী পাচাররোধের উপযোগী কিছু আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নারী পাচার নিবারণে আরও কঠোর শাস্তির জন্য পাচারকারীর বিরুধে আইনি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা দরকার। এটি ক্রিমিনাল আইনের আওতায় রয়েছে, তবুও অপরাধী মানুষেরা সেভাবে দৃষ্টান্তযোগ্য সাজা পাচ্ছে না। প্রশাসনের এ ব্যাপারে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার সেভাবে প্রচার ও প্রতিরোধের কড়া ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। জনমত তৈরি করা, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নারী পাচার কমিটি করে আইনি ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা জরুরি। আইন প্রণয়ন করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু আইন প্রণয়ন করে গরিব মেয়েদের সবরকম সুযোগসুবিধা, শিক্ষার ব্যবস্থা, আর্থিক উন্নতি ঘটানোর ব্যবস্থা করা হলে যে কারণে নারী পাচার অনেক সহজ একটি ব্যাপার তা রোধ করা সম্ভব হয়।

আইনি ব্যবস্থা দরকার অপরাধ নিবারণে, অপরাধীর বিরুধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে। তেমনি আইন করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত পরিচিত বা অপরিচিত কোনো নারী বা পুরুষের কথার ওপর বিশ্বাস করে এরকম ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে বা মহিলা বাড়ি ছাড়ার আগে স্থানীয় পুলিশ প্রশানকে সব তথ্য জানাবে এবং তাদের সম্মতিতে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও যেতে পারবে। এতে অন্তত প্রশাসন একটু খোঁজখবর নিয়ে বা এর সত্যতা যাচাই করার কিছুটা সুযোগ পাবে।

সাপ্রেশন অফ ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট ১৯৫৬ চালু হয় সারা ভারতে। এই আইনের ফলে, মহিলা ও মেয়ে পাচারও একটি ক্রিমিনাল অপরাধ বলে গণ্য হয়। এর আগে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল সাপ্রেশন অফ ইম্‌মরাল ট্রাফিক আইন, ১৯৩৩ চালু হয়েছিল। এই আইনে মূল্যবান সামগ্রী, মহিলা, শ্রমিক, ইত্যাদির চোরাচালান অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে ইম্‌মরাল চোরাচালান আইনের ফলে অপরাধীর জরিমানা ও স্বশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের অপরাধ গুরুতর ক্রিমিনাল অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

৫.৪ অনুশীলনী

(১) নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ব্যাখ্যা করো। এর কারণ কী আলোচনা করো।

(২) নারী পাচার সমস্যা সমাধানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা কী নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে করো ?

(৩) এই সমস্যা সমাধানে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ?

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Personal laws & women—Malladi subhamma

(২) The law of the land—Prabha Krishnan

একক ৬ ❑ ভারতে গণিকাবৃত্তির সমস্যা

গঠন

৬.১ ভূমিকা

৬.২ ধারণা

৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৬.৪ প্রকারভেদ

৬.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

৬.৬ আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা

৬.৭ শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশামূলক অবস্থা

৬.৮ গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক কাজ

৬.৯ সমস্যার কারণের পেছনে যুক্তি

৬.১০ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আইনি ব্যবস্থা

৬.১১ সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হস্তক্ষেপ

৬.১২ অনুশীলনী

৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ ভূমিকা

ভারত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। বর্তমান ভারত যে সামাজিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে তার মধ্যে অনৈতিক পাচার অন্যতম। আমাদের দেশ ছাড়াও অন্য দেশগুলিও বর্তমানে নানা কারণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত এর বিস্তৃতি এতটাই যে এর বিপদসংকেত ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ ও সরকারের মধ্যে। আমরা জানি, সামাজিক পাপের উপস্থিতি ব্যক্তির পরিবারের ও সমাজের খুশি ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে আগের সময়ের তুলনায় বর্তমানে এই সমস্যাটি সবার নজর কেড়েছে।

৬.২ ধারণা

গণিকাবৃত্তি বলতে বোঝায় অর্থ ও জিনিসের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করা। এই ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে আরও কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যাক।

(i) গণিকাবৃত্তি হল বাছবিচারহীন কামুকভাবে নিজের দেহ উৎসর্গ করা।

(ii) গণিকা এমন এক ব্যক্তি যিনি সমলিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের লালসা তৃপ্তিকেই তার জীবিকা করেছে। (Eliss)

(iii) গণিকাবৃত্তি হলো বাছবিচারহীনভাবে মূল্যের বিনিময়ে, আঞ্চলিক আর্থিক ব্যবস্থার জটিলতার ওপর নির্ভর করে যিনি তার যৌনতায় অন্যকে অবাধ প্রবেশ করতে দেন। (International Encyclopaedia of Social Science)

(iv) কোনো মূল্যের বিনিময়ে বাছবিচারহীনভাবে যৌনসহবাসের জন্য যে মহিলা নিজেকে উৎসর্গ করে তাকে গণিকা বলে। (Webster's Dictronary)

(v) কোনো আবেগহীন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অর্থের মারফত যথেচ্ছ ভাবে যৌনতার বিনিময়কে গণিকাবৃত্তি বলে। (Encyclopaedia Britannica)

(v) অভ্যাসবশত মাঝেমধ্যে যৌন মিলন যা কমবেশি যথেচ্ছ তা কিছু অর্থের বিনিময়ে ঘটলে তাকে গণিকাবৃত্তি বলে। (Mr. Geoffrey)

(vii) অর্থ অথবা কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে কোন মহিলা যখন যথেচ্ছ ও বাছবিচারহীনভাবে নিজের শরীরকে যৌনকার্যে ব্যবহার করতে দেয় তখন তাকে গণিকাবৃত্তি বলে। (SIT Act)

ওপরের এই সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি সংযুক্ত।

(ক) যথেচ্ছ যৌনসহবাস।

(খ) বিনিময় ব্যবস্থা।

(গ) কোনো তৃপ্তিদান/সন্তোষণের ক্ষেত্র নেই।

(ঘ) আবেগ, স্নেহ বা ভালোবাসার অনুপস্থিতি।

একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত বা প্রাক্‌বিবাহ যৌন সম্পর্কের সঙ্গে একে এক করে দেখা ঠিক নয়। অতি আকর্ষণ বা শারীরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ভালোবাসা বা ধর্ষণ হিসাবেই ওই সম্পর্কগুলি যেমন আত্মীয়দের সঙ্গে, বাড়ির কর্মচারীর সঙ্গে বা অচেনা মানুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হিসাবে দেখা উচিত। সুতরাং এইসব সম্পর্কে যথেচ্ছাচার বা বিনিময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রমীলা কাপুর বলেছেন, "Human sexual behaviour including the sale of sex, has long been the focus of attention. People have generally

biased attitude towards prostitution and it becomes very difficult to look at the facts objectively. I have come to realise that these girls are simply girls who have been in trouble.

৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মতোই গণিকাবৃত্তি সমান পুরোনো। ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ যেমন—মহাভারত বা জাতকে আমরা গণিকাদের চিহ্নিত করতে পারি। মনু, গৌতম, বৃহস্পতি—হিন্দু শাস্ত্রকাররা এবং কৌটিল্য গণিকাবৃত্তিকে চাপা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যার থেকে বোঝা যায় যে ওই সময়ে এটি ঘটত। পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যৌন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও নৈতিকতার একটি দ্বৈতনীতি সমাজ স্বীকৃত হয়ে এসেছে যেখানে পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখতে বাধা দেওয়া হয়নি কিন্তু মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। তাই একটি বিশেষ শ্রেণির মহিলারা ওই পুরুষকে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতৃষ্মা পরিতৃপ্ত করার জন্য তৈরি হয়। প্রাচীন ভারতে জমিদার, ব্যবসায়ী বা জমির মালিকদের মতো অভিজাতরা এমন ধরনের মহিলাদের তাদের কর্তৃত্বাধীন রাখতেন। পৌরাণিক যুগে, আমরা দেখেছি দেবদাসীদের উপস্থিতি—যারা ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে গণিকা। মুসলিম যুগে এই অভ্যাস হারেম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রচলিত ছিল। এবং রাজশাসিত রাজ্যের অবলুপ্তির পর সাধারণ গণিকাদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সভ্যতার ধাপগুলির মধ্য দিয়ে গণিকাবৃত্তি বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণের জন্য এই অভ্যাস ত্বরান্বিত হয় ষষ্ঠদশ শতকের থেকে। কিন্তু তা ভারতে সামাজিক সমস্যারূপে প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর। অন্যান্য দেশেও এই অভ্যাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ব্যবিলনে কিছু মাত্রায় গণিকাবৃত্তি বাধ্যতামূলক ছিল। মধ্যযুগে একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় সংগঠন গণিকাদের আয়ের অংশ থেকে ভাগ নিতেন।

৬.৪ প্রকারভেদ

গণিকাদের এই কয়েকটি রূপে বিভক্ত করা যায়—

(i) ব্রথেল ইনমেটস ঃ সাধারণভাবে এরা বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহিত হয়ে এসে ব্রথেল মালিকদের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এরা ব্রথেলে থাকতে বাধ্য হয় এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে এদের

মিশতে দেওয়া হয় না। তারা বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা দরিদ্র। এদের মূল্যহার তুলনামূলকভাবে কম।

(ii) কল গার্ল ঃ এই ধরনের গণিকারা সাধারণভাবে তাদের ব্যাবসা স্বাধীনভাবে চালায়। কখনো-কখনো দালালের সাহায্যও নেয়। তারা সম্মানীয়, মার্জিত, অভিজাত গণিকা যাদের মূল্যহার খুব বেশি। সাধারণভাবে তারা শিক্ষিত ও প্রগল্‌ভ। তারা কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলতে পারে এবং ভালো জায়গায় থাকে। তাদের দূরাভাষে যোগাযোগ করতে হয়। পুরুষ ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কোনো দালালের মাধ্যমে বা ক্রেতার সঙ্গে সরাসরিভাবে। তারা তাদের পেশা গোপন করতে সাধারণভাবে সফল হয়ে থাকে। তারা বেশিরভাগই স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, অফিসযাত্রী, গৃহকর্ত্রী, শিক্ষিত বেকার, সাধারণ অভিনেত্রী ইত্যাদি।

(iii) স্ট্রিট গার্ল ঃ এরা গণিকাদের মধ্যে একটি শ্রেণি যারা ক্রেতাদের রাস্তার ধারে, নৌকায়, বাগানবাড়িতে, পরিত্যক্ত বাড়িতে বা কোনো গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে তাদের ব্যাবসা চালায়। এরা সাধারণভাবে খুবই দরিদ্র এবং এদের মূল্যহার খুবই কম।

(iv) ফ্লাইং টাইপ ঃ আরও এক ধরনের গণিকা দেখা যায় যারা ফ্লাইং। এরা হাইওয়ে, ফেরিঘাট, বিভিন্ন ধরনের হোটেল ইত্যাদিতে ক্রেতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এদের রেলওয়ে স্টেশনেও দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

বর্তমানে ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সঙ্গে এই সমস্যাটি সারা দেশেই তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রামীণ এলাকাগুলোও এর আওতার বাইরে নয়। টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সাইন্সেসের তরফে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে ২০ লাখ গণিকা আছে এবং তারা ৮১৭টি নিষিদ্ধ পল্লিতে থাকে। এ ছাড়াও ৫৮ লাখ শিশুর মা-রা জানেন না তাদের বাবার পরিচয়। গণিকাদের এই সংখ্যার মধ্যে কল গার্ল বা সমাজের উঁচুতলার গণিকাদের বা স্ট্রিট প্রস্টিটিউটদের ধরা হয়নি। বড়ো বড়ো শহরে বর্তমানে কল গার্লদের নিয়ে সমস্যার বিস্তার খুবই বেশি। নিষিদ্ধ পল্লির সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলা শহরগুলিতেও কিছু কিছু এলাকায় এমন ব্যাবসা চলছে। হাইওয়ের ধারে স্ট্রিট গার্ল ও ফ্লাইং প্রস্টিটিউটদের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, দিল্লি এবং কোলকাতায় গণিকাদের সংখ্যা প্রচুর। তুলনায় পাটনা, চণ্ডীগড় ও ভুবনেশ্বরে এদের সংখ্যা কম।

শুধুমাত্র কলকাতাতেই ১৮ কোটি টাকার মত গণিকাদের জন্য খরচ হয়ে থাকে। এই অঙ্কের ওপর মদ, খাবার, টিপসের জন্য আলাদা খরচ হয়। সারা ভারতে এই ব্যবসায় লেনদেন হয় বছরে ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই ছবিটির সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হল যে গণিকারা তার আয়ের খুব কম অংশই নিজেরা ব্যবহার করতে পারে। ব্রথেল মালিকদের হাতে, পুলিশের হপ্তা আদায়ে, দালাল, সুদখোর, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ওষুধেই বেশিরভাগ টাকা খরচ হয়ে যায়। তার ফলে ৪০-৪৫ বছর বয়সের পর থেকে তাদের আয় আরও কমে যাওয়ায় তারা ক্রমশ ঋণের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

যেসব দেশে বৈধতা প্রদান (লাইসেন্স) চালু হয়েছে, সেখানে সমস্যাটির বিস্তারকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। ভারতের মতো দেশে, খুব অল্প সংখ্যক গবেষণা হয় যা থেকে এই সমস্যা বিষয়ে গভীরভাবে জানা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ফ্লাইং গার্লদের এবং কল গার্লদের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ই অজানা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্যাটির প্রসার ও বিস্তৃতির নির্ধারণ জটিল আকার ধারণ করে। তবে বলা যায় যে এই সমস্যাটির ক্রমশই বড়ো আকার ধারণ করছে এবং বড়ো শহর যেমন কোলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, পুনে, ব্যাঙ্গালোরে ক্রমশই এটি একটি বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে।

৬.৬ আর্থসামাজিক এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা

● যেহেতু বেশিরভাগ ব্রথেলই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং এই পরিস্থিতির শিকারদের স্বল্পাহার দেওয়া হয় এরা প্রায় প্রত্যেকেই এই রোগগুলির মধ্যে কোন এক বা একাধিক রোগের শিকার হয়— যৌনব্যাধি, যক্ষ্মা, রক্তশূন্যতা, এইডস, চর্মরোগ, সর্দিকাশি, মানসিক অস্থিরতা।

● এই ব্যবস্থায় এই মহিলাদের ওপর নানাধরনের শোষণ চলে ও এই মহিলারা পতিতা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

● কোনো সমাজই এই বৃত্তি স্বীকার করে না কিন্তু এটিকে প্রয়োজনীয় সামাজিক পাপ হিসাবে মেনে নেয়। সুতরাং এই সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তরিক নয়।

● আপাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই অভ্যাস সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে বাস্তবে উপস্থিত থাকে। এই অভ্যাস কেউ কেউ মেনে না নিলেও সমাজের অনেকেই এই অভ্যাসে অংশ নেন।

● এই সমস্যাটি শুধুমাত্র মহিলা বা মেয়েদের সমস্যা নয়। এই সমস্যাটির মোকাবিলার জন্য এটিকে সার্বিকভাবে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে দেখা দরকার। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে আলাদা।

● একবার একটি মেয়ে বা মহিলাকে গণিকা হিসাবে চিহ্নিত করলেই, তাকে আর একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তি যার নিজস্ব প্রয়োজন, ইচ্ছা, ব্যক্তিগত সমস্যা, সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এমন মনে করা হয় না।

● তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া হয় না। এদের সন্তানদের আকস্মিকভাবে জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এদের অস্পৃশ্য বলে মনে করা হয়।

● এটি একটি মানবিক এবং সামাজিক সমস্যা যার নৈর্ব্যক্তিক (unbiased) পরীক্ষা প্রয়োজন যা খুব কমই বাস্তবে ঘটে থাকে।

পেশাটির ওপর তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সমাজবিজ্ঞানীরা এবং সাধারণ মানুষ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন। এগুলি হল—

(১) নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (মর‍্যালিস্টিক ভিউ) গণিকারা বাজারি ভোগ্যবস্তু, স্বাভাবিকভাবে যা সমাজে স্বীকৃত হয় না।

(২) বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি (রিয়্যালিস্টিক ভিউ) এই সমস্যাটির গভীরতা আছে যদিও এটি সম্মানীয় পেশা নয়। সুতরাং এদের বাস নিষিদ্ধপল্লিতেই হওয়া উচিত।

(৩) উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (লিবার‍্যাল ভিউ) অন্যান্য পেশার মতো এটিও একটি পেশা। এটিকে আইনি বৈধতা দেওয়া উচিত যাতে এই পেশায় নিযুক্ত যারা, তারা সম্মানীয় জীবনযাপন করতে পারে।

৬.৭ শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা

গণিকাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ বিবাহিত। তাদের মধ্যে অনেকেই এই পেশায় আসার আগে থেকে বিবাহিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই সন্তান আছে। কেউ কেউ হয়ত হঠাৎই মা হয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না তাদের সন্তানের বাবা কে। এই যৌনকর্মীদের সন্তানদের দুর্দশা খুবই কষ্টদায়ক। সমাজে তাদের হীন চোখে দেখা হয়। তারা তাদের মায়ের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যায় অল্প বয়স থেকে এবং তাদের মধ্যে অবেগজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা ভালোবাসা, স্নেহ, স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন পায় না যা তাদের জীবনকে আরও দুর্দশাপূর্ণ করে তোলে। তাদের মায়েদের পেশার প্রকৃতি, কম আয়ের জন্য এই শিশুরা সঠিক নজর, শিক্ষার সুযোগ বা স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধাগুলিও পায় না। সঠিক বাসস্থান না থাকায় তারা সারাদিন ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ে। সমাজ তাদের সেভাবে মর্যাদা দেয় না এবং পুরুষ শিশুরাও অবহেলা

পায়। কন্যা শিশুরা তুলনায় সেবা পায় কেননা তারাই ও ব্রথেল মালিকের কাছে সাধারণত বন্ধক থাকে। তবে এই শিশুদের ওপর চিহ্নিতকরণ চলে যে তারা অবৈধ।

শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশা যৌনকর্মীদের শিশুদের অবস্থা থেকে কোনো অংশে কম নয়। প্রথমত, তাদের যৌন ক্রিয়াকর্ম শুরু করতে হয় শরীর গঠনের অনেক আগে থেকেই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ক্রেতারা শিশু যৌনকর্মীদের বেশি পছন্দ করে সেহেতু তাদের প্রায় ছয় সাত জন ক্রেতাকে একদিনে সঙ্গ দিতে হয়। তৃতীয়ত, তাদের দালাল ও ব্রথেল মালিকরাই সবচেয়ে বেশি শোষণ করে। চতুর্থত, দালাল ও ব্রথেল মালিকদের বিনামূল্যে যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য এই শিশুরা খুব সহজেই শিকার হয়ে পড়ে। পঞ্চমত, যেহেতু তাদের এই বৃত্তিতে থাকার সময়কাল দীর্ঘ, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, সচেতনতা কম সেহেতু তারা খুব সহজেই এস.টি.ডি, এইচ.আই.ভি এবং অন্যান্য যৌন সমস্যার শিকার হয়। ষষ্ঠত, তারা পরিবারের সদস্যদের দ্বারাও শোষিত হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা তাদের আয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বেশিরভাগ সময়ই তাদের পরিবারের সমদস্যরা এই আয় নিজেরা নিয়ে যায়।

৬.৮ গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক কাজ

সামাজিক সমস্যা কখনো বিচ্ছিন্ন নয়। তারা আন্তঃসম্পর্কিত। সামগ্রিকভাবে বিশ্বে গণিকাবৃত্তি একটি উত্তেজক সামাজিক সমস্যা হওয়ায় এর সঙ্গে অন্যান্য সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক আছে যার মধ্যে অপরাধমূলক কাজকর্ম একটি। গণিকাবৃত্তি প্রত্যেকের জীবনের, পরিবারের ছন্দকে নষ্ট করে দেয়। এটি স্বাভাবিক যে এই সমস্যা সম্প্রদায়—জীবনকেও নষ্ট করে। এইরকম একটি পরিবেশেই বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়।

অপরাধমূলক কাজকর্ম মূলত তিনটি জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—সম্পত্তি, মদিরা ও নারী। নারীকে কেন্দ্র করে বহু অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটে। আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কাজ থেকে শুরু করে সাধারণ ছোটোখাটো অপরাধেও মহিলাদের সরাসরি বা পরোক্ষ যোগদান খুবই সাধারণভাবে ঘটে থাকে। রেডিয়ো, টিভি বা সংবাদপত্র অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে পুলিশের অপরাধের নথি বা গোয়েন্দা দফতরে এ ব্যাপারে অনেক নজির আছে, যেখান থেকে বলা যায় যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে অপরাধী ও অপরাধের সম্পর্ক গভীর। গত কয়েকটি দশকে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৯ সমস্যার কারণের পেছনে যুক্তি

এমন কোনো সামাজিক সমস্যা নেই যার পেছনে কোনো একটি মাত্র কারণ আছে। অনৈতিক পাচারচক্র বা গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রেও তা সত্যি। অনৈতিক পাচারের পেছনে এই কারণগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

(i) অর্থনৈতিক কারণ ঃ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে বেশিরভাগ গণিকারাই দরিদ্র ঘর থেকে আসে। এইসব গবেষণা থেকে আরো দেখা যায় যে এই সব মেয়েরা গণিকাবৃত্তিতে আসে চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার ফলে। এস. ভেনুগোপালের মতে গণিকাবৃত্তির প্রধান কারণই অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। মি. বোজ্ঞার, ড. পুণেকর ও শ্রীমতী রাও-ও বলেছেন যে গণিকাবৃত্তির মূলে অর্থনৈতিক উপাদানই থাকে। দারিদ্রের চাপে মেয়েরা অনেক সময়ই স্বইচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করে। অন্যদের ক্ষেত্রে বাবা-মা/স্বামী/ভাই/আত্মীয় স্বজনের চাপ থাকে যাতে তাদের প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক মাসের আয় নিশ্চিত হয়।

(ii) অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত ছবি, যৌন উত্তেজনাবর্ধক সাহিত্য ও ছবি এবং যৌনোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাবার্তা ব্যক্তির চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এসবের মাধ্যমে যৌন বিকৃতির সৃষ্টি হয় কারো কারো মধ্যে, যারা তাদের যৌন চাহিদা যে-কোনো উপায়ে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এভাবেই তাদের একটি অংশ গণিকাবৃত্তিতে চলে আসে। শ্রীমতী প্রমিলা কাপুরের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে এমন কিছু মহিলা থাকেন যারা ১ ঃ ১ সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকেন না। তাদের যৌনতৃপ্তির জন্য তারা একাধিক পুরুষের সঙ্গ চান। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে অনেকেই এই পেশায় প্রবেশ করেন।

(iii) ধর্মীয় অনুশাসন ঃ দেবদাসী/বাসবী/যোগিনী প্রভৃতি হল ধর্মীয় অনুশাসন মেনে গণিকাবৃত্তিতে প্রবেশের উদাহরণ। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী একটি বহু পুরোনো প্রথা। এক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে খুব অল্প বয়সে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাদের সমাজ আয় গ্রহণ করে না। এর ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গণিকাবৃত্তিতে চলে আসে। যদিও এই প্রথা এখন লুপ্তপ্রায় তবুও এর অস্তিত্ব দেশের কিছু অংশে লক্ষ্য করা যায় যেমন মহারাষ্ট্রে, গোয়া এবং কর্ণাটকে। এই এলাকার মানুষের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু মেয়েকে তাদের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে গণিকাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ছাড়া কিছু উপজাতীর সনাতনী পেশাই গণিকাবৃত্তি। যেমন—রাজস্থানের বেদিয়া, উত্তরপ্রদেশের সাঁসী উপজাতি।

(iv) বিধবা বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঃ খুব অল্প বয়সে বিধবা হলে সামাজিকতার চাপে অনেক মহিলার পক্ষে পুনর্বিবাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে যৌন সম্পর্ক ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয় না। তাই জৈবিক চাহিদা পূরণে এবং পরিবারের অসহনীয় ব্যবহার এড়াতে কিছু বিধবা বাড়ি ছেড়ে গণিকালয়ে আশ্রয় নেয়।

(v) অপহরণ ঃ কিছু অসামাজিক ব্যক্তির কাছে মেয়ে ও মহিলাদের অপহরণ করে গণিকালয়ে পাঠানোই পেশা। আমরা পুলিশবিভাগ ও প্রত্যেকদিনের সংবাদ পত্র থেকে এই ধরনের ঘটনার অনেক উল্লেখ পাই। বম্বে শহরের গণিকাদের ওপর গবেষণায় ড. পুণেকর এবং অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে বহু সংখ্যক মেয়েদের বাধ্য করা হয়েছে এই পেশা বেছে নিতে। সেন্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের

কলকাতার গণিকাদের ওপর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩২.৩% গণিকাদেরই অপহরণের পর এই পেশা নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

(vi) মানসিক অসম্পূর্ণতা ঃ ইলিয়ট এবং মেরাল দেখিয়েছেন যে বহু সংখ্যক গণিকারাই মানসিকভাবে অসম্পূর্ণ। তারা বুঝতে পারে না কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা ভুল। যার ফলে তারা অসামাজিক ব্যক্তির অনৈতিকতার খুব সহজ শিকার হয়ে যায় এবং বাধ্য হয় গণিকার জীবন বেছে নিতে। বিশেষত দালালশ্রেণির লোক তাদের খুব সহজেই লোভ দেখিয়ে নানারকম আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত যৌনকর্মীতে পরিণত করে।

(vii) পারিবারিক কারণ ঃ অসুখী দাম্পত্যজীবন হলে, স্বামী অবিশ্বাসী হলে, স্বামী ছেড়ে চলে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা গণিকাতে পরিণত হয়ে থাকে। গণিকাদের জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বামীর সঙ্গে সমঝোতা না করতে পেরে কোনো একটা সময়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং এই পেশা নেয়। কখনো-কখনো তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিলে অন্য কোনো উপায় আর না থাকলে তারা এই পেশায় আসে।

(viii) অবৈধ যৌন সম্পর্ক ঃ অনেক অল্পবয়সি মেয়েরা বিশেষ করে কিশোরী বয়সের মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে কোনো পড়শি, আত্মীয়, বন্ধু, পারিবারিক বন্ধু, শিক্ষক, এমনকি গাড়ির চালক বা বাড়ির কর্মচারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কখনো-কখনো তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্কও ঘটে। এমন অনেক মেয়ে এই যৌন সম্পর্ক প্রকাশের সামাজিক ভয়ে গণিকাবৃত্তিকেই পেশা করে ফেলে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে সেইসব মেয়েদের ক্ষেত্রে যেখানে যাদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক ঘটে তারা এদের পরিত্যাগ করে বা মেয়েটি গর্ভবতী হলে বা অবিবাহিত মা হয়ে পড়লে এমন ঘটে থাকে।

ওপরের কারণগুলি ছাড়াও সহজে যৌন অভিজ্ঞতা পেতে, বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণায়, দুঃসাহসিক কাজের প্রবণতায়, নিম্নমানের নৈতিক মূল্যবোধ থাকলে, যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করার দরকার থাকলে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও এই পেশায় মেয়েরা এসে থাকে। সমাজে মেয়েদের নিম্নমর্যাদা, পুরুষশাসিত সমাজ, অল্প বয়সে বৈধব্য, গণিকার সন্তান হওয়ার ফলে সামাজিকভাবে নিন্দনীয় চিহ্নিতকরণের ভয়ে এই সমস্যা ঘটে থাকে।

৬.১০ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আইনি ব্যবস্থা

যৌন অপরাধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড চালু হয় যেখানে মহিলাদের কোনো যৌন সম্পর্কে জোর করে প্রবেশ করানোর বিপক্ষে কিছু নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এই কোডগুলি হল—

(i) জরিমানা, এক বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই, যদি কোনো মেয়েকে বিরূপ মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো বস্তুর দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবন/গোপনীয়তা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। (সেকশন—৩৫৪)

(ii) অপহরণ, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা, মহিলাদের অনিচ্ছায় অন্যের অস্বাভাবিক লোভের শিকার করা, এমন ব্যক্তিকে জরিমানা ও ১০ বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই হতে পারে। (সেকশন—৩৬৬)

(iii) ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো মেয়েকে বিক্রি করা বা ঘিরে রাখলেও সেই ব্যক্তির অনুরূপ শাস্তি হবে। (সেকশন—৩৭২)

(iv) ষোলো বছরের কম বয়সি মেয়ের সঙ্গে তার ইচ্ছা ছাড়া বা ইচ্ছানুযায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তার ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। (সেকশন—৩৭৫)

(v) অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে কোনো ব্যক্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। (সেকশন—৪৯৭)

(vi) কোনো বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কে প্রলুব্ধ করলে বা তার জন্য তাকে আটকে রাখলে সেই অপরাধীর জরিমানা ও দু-বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই হতে পারে। (সেকশন—৪৯৮)

স্বাধীনতার আগে এবং পরে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গণিকাবৃত্তি রুখতে কিছু আইন গঠন করেন। এগুলি হল—

★ বোম্বে প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩২

★ মাদ্রাজ প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩০

★ বেঙ্গাল প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৩

★ ইউ. পি প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৩

★ পাঞ্জাব প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৫

★ বিহার প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৪৮

★ এম.পি. প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৫৩

রাজ্যের গণিকাবৃত্তি প্রতিরোধ আইনে কিছু পার্থক্য আছে। কিছু বিশেষ আইনও গঠন করা হয় যেমন—

★ ইউ পি গার্লস প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯২৯

★ বোম্বে দেবদাসী প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৩৪

★ মাদ্রাজ দেবদাসী অ্যাক্ট ১৯৪৭

ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে সাপ্রেশন অফ ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট গঠন করেন। এটিকে ১৯৮০-তে সংশোধন করা হয় এবং ২০০৬-তে পুনর্বার সংশোধন করা হয়। এটি একটি শক্ত আইনে পরিণত হয়েছে। এটি লোকসভায় গৃহীত হলে কোনো গণিকালয়ে যাওয়া বা কোনো যৌন কার্যালয়ে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণিকাবৃত্তি কিছু কিছু জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে ওই দেশে তাদের কিছু সামাজিক সুবিধাও দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য বহু দেশে তা বৈধও ঘোষণা করা হয়েছে হয়তো ভারতকে এই পরিস্থিতিতে কোনো একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণের মাঝামাঝি একটি আর্থসামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বিবেচিত হবে।

৬.১১ সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হস্তক্ষেপ

সমাজের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এমনই একটি সমস্যা এই গণিকাবৃত্তি। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব জুড়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে। যার ফলে প্রায় অনেক দেশই এ বিষয়ে কিছু না কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে। আমাদের সরকার যে নীতিভিত্তিক কার্যপ্রক্রিয়া শুরু করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

(i) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যাটির মোকাবিলা করা। সময়ের সঙ্গে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনের সংশোধন করা।

(ii) বিষয়টির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টিকে নিয়ে ভাববে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(iii) গণিকালয়গুলিকে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যাতে যে কেউ ইচ্ছামতো এই পেশায় অংশগ্রহণ করতে না পারে।

(iv) সরকারি হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(v) গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সরকার পরিত্রাতা কেন্দ্র, সংরক্ষণশীল কেন্দ্র ইত্যাদি চালু করেছে।

(vi) সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, স্টেট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইজারি বোর্ড, সোশ্যাল অ্যান্ড মোরাল হাইজিন্ এজেন্সি প্রভৃতি গঠন ও সোশ্যাল অ্যান্ড মোরাল হাইজিন-এর অ্যাডভাইসারি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(viii) হোটেল, লজ, গেস্টহাউস, পার্লার, ডান্সবার প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে রেইড করা।

সরকার নারী ও শিশু পাচার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পাচারের পর যৌন শোষণ, বাণিজ্যিকভাবে যৌনতাকে ব্যবহার করা নারী ও শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের একটি জঘন্যতম কাজ। সুতরাং জনসমাজে এইসব শিশুদের উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরি বলে সরকার মনে করে। এই নারী ও শিশু পাচাররোধে ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট ১৯৮৬ চালু হয়েছে যা ১৯৫৬ সালে গৃহীত SIT Act-এর একটি রূপবিশেষ।

এ ছাড়া, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট দফতর একটি ভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ১৯৯৮-তে যার উদ্দেশ্য হল বাণিজ্যিক কারণে যৌন শোষণের শিকারদের পুনঃঐক্যবদ্ধ করা। এদের মূল উদ্দেশ্য হল—

- পাচার রোধ করা
- সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুসংহত করা
- স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান
- শিক্ষা ও শিশুর পরিচর্যা প্রদান
- গৃহনির্মাণ
- মাথার ওপর ছাদ ও সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- আইনি সংশোধন
- উদ্ধার ও পুনর্বাসন

এই দফতর একটি কমিটি গঠন করেছে যার নাম সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি কমিটি (সি.এ.সি.) যার চেয়ারম্যান হলেন ওই দফতরের সম্পাদক। এই কমিটির সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীরা। বেশিরভাগ রাজ্য সরকার স্টেট অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করেছে যার চেয়ারম্যান হলেন চিফ সেক্রেটারি বা অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি।

গত কয়েকবছরে যে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

(১) সমস্ত নির্বাচিত মহিলা LSG প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সচেতন করা যাতে পাচারকারীরা সহজে সরল মেয়েদের তাদের শিকার করতে না পারে।

(২) আন্তর্জাতিক পাচার রুখতে কী কী উপায় অবলম্বন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ওই দফতর একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটির আরো একটি উদ্দেশ্য হল পাচারিকৃত মহিলা ও শিশুদের কীভাবে উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পাচার বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করা।

(৩) সমস্যা মোকাবিলায় নানা ধরনের কর্মসূচি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই কর্মধারায় সুসংহতি বজায় রাখা।

(৪) ইউনিসেফের ভারতীয় অফিসের সঙ্গে সংযুক্তিতে কিছু ক্রোড়পত্র তৈরি করা যাতে সাধারণ সচেতনতা গড়ে ওঠে।

(৫) অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কতগুলি কর্মসূচির খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।

(৬) উপকূল অঞ্চল এবং বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে সমীক্ষা চালানো।

(৭) শিশুদের ওপর যৌন অত্যাচার রোধে সুসংহত আইন প্রণয়নের চেষ্টা চালানো।

(৮) জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৯) আই.টি.পি.এ.—১৯৫৬-র পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রক্রিয়াগত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দফতরটি।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ ব্যাপারে, কলকাতায় প্রায় তিন ডজন এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যাদের কার্যপ্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

(i) গণিকা ও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান।

(ii) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, এস. টি. ডি./এইচ. আই. ভি এবং অন্যান্য যৌন রোগ, সেফ সেক্স সম্বন্ধে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো।

(iii) গণিকাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মাথার ওপর ছাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা।

(iv) গণিকালয়ের মালিক, পুলিশ ও দালালদের দ্বারা যাতে গণিকারা শোষিত ও বিরক্ত না হয় তা দেখা।

(v) গণিকা এবং তাদের সন্তানদের জন্য কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করা।

(vi) কনডোম বিতরণ করা।

(vii) সমস্যাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমীক্ষা চালানো।

(viii) স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন ও তা পরিচালনা করা।

সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ-এর মধ্যেই এই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে এস.আই.টি-র ইউ. এনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার এস. আই. টি. অ্যাক্ট চালু করেছে। তবে দেশের সর্বত্র এই আইন সমানভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেমন— এই অ্যাক্টের ১৩নং সেকশনে বলা আছে যে রাজ্য সরকার এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে একটি অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করবে। কিন্তু এমন ধরনের কমিটির অস্তিত্ব প্রায় কোনো পক্ষেই নেই। এই

অ্যাক্টে আরও বলা আছে যে প্রতিরোধক ও পুনর্বাসন সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা নিম্নবর্তী সমস্যাগুলোর জন্য আজও কার্যকর হয়নি—

★ এমন হোমের সংখ্যা খুব কম

★ অপ্রতুল পরিকাঠামোগত সুবিধা

★ কর্মচারীদের নিম্নমান

★ অপ্রতুল প্রতিপালন ও তদারকি ব্যবস্থা

এ ছাড়াও এই সমস্যা সমাধানে একটি বড়ো বাধা হল যে পুলিশ ও প্রশাসন খুব কমই মালিক, ব্রথেল ম্যানেজার, দালাল ও ক্লায়েন্টদের নামে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার যাতে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সুস্থ সামাজিক জীবনের স্বার্থে।

৬.১২ অনুশীলনী

(১) গণিকাবৃত্তির সংজ্ঞা দাও এবং এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(২) গণিকাবৃত্তির কারণের পেছনে সম্ভাব্য যুক্তিগুলি কী কী?

(৩) যৌনকর্মীর সন্তানদের দুর্দশা এবং তাদের উন্নয়নকল্পে সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন।

৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(1) দি আন অ্যাডজাস্টেড গার্ল ঃ ডব্লু. আই. টমাস

(2) সোশ্যাল ডিস অরগ্যানাইজেশন ঃ ইলিয়ট ও মেরিল

(3) এ স্টাডি অফ দি প্রস্টিটিউটস ইন বোম্বে ঃ এস. ভি. পুণেকার ও কমলা রাও

(4) দি সোশিওলজি অফ প্রস্টিটিউশন ঃ কিংসলে ডেভিস

(5) প্রস্টিটিউশন ইন হিস্টোরিক্যাল্‌ অ্যান্ড মডার্ন পারসপেকটিভ ঃ বিশ্বনাথ জানা

একক ৭ ❑ বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সমস্যা

গঠন

৭.১ ভূমিকা
৭.২ শ্রেণিবিভাগ
৭.৩ সমস্যার প্রকৃতি
৭.৪ কারণসমূহ
৭.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার
৭.৬ প্রতিরোধ
৭.৭ অনুশীলনী

৭.১ ভূমিকা

যে-কোনো দেশের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হল শিশু। তারাই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কারণ তারা সহজে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে দেশের শিশুদের রক্ষা ও লালনপালন দরকার যাতে তারা ভবিষ্যতে ব্যবহার্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

১৯৯১-এর জনগণনায় দেখা গেছে যে ১৯ বছরর কম বয়সি শিশুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৩,৩৫,৬২,৪৩৬, যা প্রায় রাজ্যের সমগ্র জনসাধারণের প্রায় অর্ধেক (৬,৭৯,৮২,৭৩২) সেজন্য সমাজের উচিত এমন বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যা তাদের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও সুরক্ষা দিতে পারে এবং যেখানে তারা তাদের দেয় সুযোগগুলি ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের পরিবেশ প্রদান করাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

অনেক কারণের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক শিশুর খারাপ স্বাস্থ্য (পুষ্টিকর খাবারও তার অন্তর্গত), স্কুলে যাওয়ার সুযোগের অভাব, নানা ধরনের অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়। এই ধরনের শিশুরা এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যে তাদের পক্ষে তাদের সম্পূর্ণ যোগ্যতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই ধরনের ক্ষেত্রে তারা তাদের অধিকারগুলির থেকেও বঞ্চিত হয় এবং সমাজের উন্নয়নও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এটা জরুরি যে সমাজের সব স্তরের মানুষ বিশেষ করে তারা, যারা শিশুদের সংস্পর্শে দৈনন্দিন জীবনে আসেন, যেন শিশুর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। বিশেষ করে সেইসব শিশুদের ক্ষেত্রে যারা অর্থনীতিক অস্বাচ্ছন্দের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে।

৭.২ শ্রেণিবিভাগ

(i) সেইসব শিশুর যাদের পিতা-মাতা বা অন্য কোনো আত্মীয় নেই বা যারা অনাথ।

(ii) এক পিতা-মাতা পরিবারে (Single Parent Family) যেসব শিশুরা থাকে যেখানে হয় পিতার মৃত্যু হয়েছে বা তিনি তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা তদ্বিপরীতভাবে পরিত্যক্ত শ্রেণির অন্তর্গত যারা।

(iii) মানসিক রোগ বা কুষ্ঠরোগের জন্য যেসব পিতামাতা তাদের সন্তানের লালনপালন করতে পারেন না।

(iv) যেসব শিশুরা এমন কম আয়সম্পন্ন পরিবারে জন্মেছে যারা ঠিকমতো দু-বেলা খেতে পারে না।

(v) যৌনকর্মী মায়ের সন্তান যেসব শিশুরা।

(vi) ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প ও কারখানায় যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের সন্তানরা।

(vii) যে শিশুদের রাস্তায় জন্ম বা যারা রাস্তাতেই বড়ো হয়ে উঠছে।

(viii) কাগজ কুড়ানি হিসাবে যেসব শিশুরা কাজ করে।

(ix) সেইসব মায়ের সন্তান যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে এবং শিশুরা মায়ের কাজের সময় বস্তিতে বা তার আশেপাশে অযত্নে থাকে।

(x) শিশুর পাচারচক্রের শিকার বা যৌন অত্যাচারের শিকার যেসব শিশুরা বা যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

(xi) সেইসব শিশুরা যাদের AIDS/HIV হয়েছে বা যারা মাদকাসক্ত।

(xii) সেইসব শিশুরা যারা থ্যালাসেমিয়া বা ক্যানসার ইত্যাদি রোগে ভোগে, যে রোগের চিকিৎসা খরচ খুব বেশি।

(xiii) সন্ত্রাসবাদী হামলা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেসব শিশু ক্ষতিগ্রস্ত তারা।

(xiv) আকস্মিকভাবে বা জন্ম থেকেই যেসব শিশুর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে।

(xv) যেসব শিশুরা বিচ্যুতি ঘটিয়েছে এবং যাদের সংস্কার প্রয়োজন।

(xvi) ভেঙে যাওয়া পরিবারে যেসব শিশু দেখা যায়।

(xvii) অসামাজিক কাজকর্মে যেসব শিশুকে পাওয়া যায় যেমন—চুরি, মাদক পাচার, শিশু পাচার ইত্যাদি।

(xviii) মানসিকভাবে যে সব শিশু মানিয়ে নিতে পারে না।

৭.৩ সমস্যার প্রকৃতি

রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশু ও শিশুকর্মীদের সমস্যা অতীতেও ছিল কিন্তু ষাটের দশক থেকে এই সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামীণ এলাকা ও আদিবাসী এলাকা থেকে চলে আসা পরিবারগুলি শিল্প নির্ভর এলাকায় অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এই পরিবারগুলি তাদের কাজের ক্ষেত্রের কাছাকাছি এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকে। কখনো বা কোনো ব্রিজের তলায়, কোনো পাইপের ভেতরে, ফুটপাতে এইসব পরিবারগুলি থাকে। এই পরিবারগুলির শিশুদের কোনো শৈশব থাকে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে, শৈশবে বাবা-মায়ের যত্নের অভাবে তাদের দিনের মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা রাস্তাতেই দেখা যায়।

আগে উল্লিখিত সমস্ত শিশুদেরই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হয় এবং নীচে একটি তালিকায় তাদের সাধারণ কিছু সমস্যা আলোচনা করা হল—

(১) তারা বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের যারা দু-বেলা ভালো করে খেতে না পাওয়ায় অপুষ্টির শিকার।

(২) শিক্ষার সুযোগ নেই বা খুব কম।

(৩) বাবা-মায়ের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

(৪) রাস্তায় বা কাজের ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার।

(৫) যে-কোনো ধরনের রোগের শিকার হয় তাড়াতাড়ি এবং মাদক, মদ বা ধূমপানের মতো নেশার শিকার।

(৬) কোনো সৃষ্টিশীল কাজ, খেলাধুলার মাধ্যমে বিনোদন ব্যবস্থা নেই।

(৭) স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় না বা কোনো প্রতিষেধক গ্রহণ করে না।

(৮) সামাজিক কাজকর্মে খুব সহজেই জড়িয়ে পড়ে যারা তাদের ভিখারি, মাদক চালানকারী, ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করে।

(৯) গ্রামীণ এলাকা থেকে চলে আসা বা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলেরা সহজেই পাচারচক্রের শিকার হয় এবং মেয়েদের দেহব্যবসায় নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

(১০) এই শিশুদের মধ্যে HIV/AIDS-র সংক্রমণের সুযোগ বেশি হয়।

৭.৪ কারণসমূহ

ব্যাপক নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে নিঃস্ব মানুষের সমস্যা বেশিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্যাটি ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে তাদের পরিবারগুলির প্রব্রজনের ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে বস্তি এলাকায়, বা রাস্তায় থাকতে। এর ফলে আবারও তাদের নিঃস্ব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্র ও শহরে কিশোর ভিখারির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই বোঝা যায় নিঃস্ব মানুষের বৃহত্তর সমস্যা সমাজে কতটা।

দেশের অর্থনীতিক অবস্থায় অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে প্রত্যেকটি সদস্যকে কাজে যোগ দিতে বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যেখানে শিশুরা নির্ভরশীল। এইসব শিশুরা নিজেরা ঘুরে বেড়ায় বা পড়শিদের সঙ্গে থাকে বা তাদের থেকে বেশি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়। এই শিশুরা অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে যেগুলি ওই পরিবেশে ঘটে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে এইসব পরিবারের শিশুরা অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাবে ভুগতে থাকে। এদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা গড়ে ওঠে এবং এমন কিছু বিকল্প কাজে এরা জড়িয়ে পড়ে যার মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে সমাজের মূল ধারায় চলে আসতে।

যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায়, সনাতনী নৈতিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায়, অনুপরিবারগুলি স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই ভাঙনের একটি পার্শ্ববর্তী প্রভাব হল স্বামীর স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া, পুনর্বিবাহ আবার কখনো-কখনো স্বামীর হাতে স্ত্রীর বিক্রি হয়ে যাওয়া। আবার এই পরিবারগুলি এমন জায়গায় প্রব্রজনের ফলে চলে যায়, যেখানে সবসময় আত্মীয়দের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখা কঠিন, যেখানে স্বামীর দুরভিসন্ধি ফলপ্রসূ করা আরো সহজ হয়ে ওঠে। এসবের মাঝে শিশুদেরই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হয়।

আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমিকরণের খারাপ প্রভাবেও কিছু শিশুর জীবন অনিশ্চিত হয়ে যায়। ভোগবাদের বৃদ্ধির ফলে, গণমাধ্যমের বৃদ্ধির ফলে দেশের দুর্গম স্থানেও মানুষ টাকার পেছনে ছুটে চলেছে। অনেক দূরবর্তী গ্রামের মেয়েরাও পাচার হয়ে যাচ্ছে ভালো থাক এবং কর্মসংস্থানের লোভে। এরা কখনোই এদের ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না।

শিশুদের অবস্থা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় এই পরিস্থিতিতে বেশি সঙ্গীণ কারণ—

(১) কারণ ও ফলাফলের বোধ কম।

(২) কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রভাব এদের ওপর বেশি।

(৩) পরিপক্বতার অভাবে কোনো জটিল সমস্যাকে মোকাবিলা করার দক্ষতা কম।

(৪) মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কম।

(৫) প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

(৬) প্রতিদিনের কাজে বিঘ্ন ঘটলে তা মোকাবিলা করা কঠিন।

(৭) স্বাভাবিক জীবনে আগামী বিঘ্ন অনুমান করা সহজ নয়।

(৮) পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চাপ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

(৯) নানা ধরনের ভয় ও চাপের মধ্যে এরা থাকে। যেমন—আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটা, আঘাত পাওয়া, কোনো আত্মীয় বিয়োগ, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।

৭.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

বিশ্বে যে-কোনো শিশুই সরল, নির্ভরশীল, কৌতূহলী, সক্রিয়, আশাবাদী এবং সহজেই কোনো নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শিশু নানা বিপদের মধ্যে পড়ে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট ভোগ করে। ফলত ক্ষুধা, বাড়িছাড়া, মহামারী, অশিক্ষার ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হয়। রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কখনও বেঁচে থাকার জন্য অপরাধমূলক কাজ করে। এমনকি শিশু শ্রমিকরা দেহব্যাবসা, যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, HIV-এর দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অন্য ধরনের শোষণেরও শিকার হয়।

জার্মানে, ভারতে শিশু মৃত্যুহার হল ১০০০ জন্মপিছু ৭০। কন্যা শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার এখনও সবচেয়ে বেশি। তিন মিলিয়ন শিশু এখনও রাস্তায় বেড়ে ওঠে। ১১১ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে একটা বিরাট অংশ এখনও স্কুলে ঢোকেনি। (উৎস CRY)।

পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ১.৮%, অর্থপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক, ৩০% কানে শোনে না, ২০% চোখে দেখে না। ০-১৪ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে ১৫ মিলিয়নের লোকোমোটর ডিস্‌এবিলিটি আছে। ৬৭৬ মিলিয়ন গ্রামীণ এলাকায় থাকে ৪৩১ মিলিয়ন শহরে থাকে। এদের বেশিরভাগই থাকে পশ্চিমবঙ্গে।

৭.৬ প্রতিরোধক

স্বাস্থ্য ঃ দি ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম (ইউ. আই. পি) একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তারা সমস্ত মা ও শিশুর বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও কোলের শিশুর কাছে পৌঁছাবে যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

(১) পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর নিয়মিত প্রতিষেধক গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে

প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও এই পরিষেবার সুযোগ পায়। বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দরিদ্র এলাকাগুলিতে।

(২) হাম প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ভিটামিন-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং কতজন এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার সংখ্যাও গোনা হচ্ছে।

(৩) এই রাজ্যে পোলিও রোগ ক্রমশ কমছে। ১৯৯০-এ ৮৮৬ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৭৩-এ ১৯৯২-তে। কেন্দ্রীয় সরকার, কল্যাণমূলক সংগঠন ইত্যাদি ৫ বছরের কম বয়সি শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছেন।

(৪) শিশুর জন্মের পর টিটেনাস ইনজেকশন গ্রহণে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে শিশু মৃত্যুহার রোধ করা যায়।

(৫) ডায়েরিয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৭০% কমানো গেছে বিশেষ করে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে। ও.আর.এস. খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে। মৃত্যুহার (Mortality) এবং রোগগ্রস্ততা (morbidity) কমানোর জন্য ইনটিগ্রেটেড কনট্রোল অফ ডায়োরয়্যাল ডিজিজেজ (Integrated control of Diarrhoeal Diseases) এবং জল ও শৌচাগার (Water and sanitation) (CDD-WATSAN) ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) HIV/AIDS-এ আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য নানান প্রকাশনা ইত্যাদির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পুনর্স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে AIDS আক্রান্ত রোগীদের বাসস্থান, ওষুধ ও সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছে।

জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঃ

জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সরকারের পক্ষ থেকে সব সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। CAPART একটি সরকারি লগ্নিকারী সংস্থা যারা গ্রামীণ এলাকায় স্বল্প খরচে শৌচাগার নির্মাণ ও টিউবওয়েল তৈরির জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অর্থদান করে থাকে। জওহর রোজগার যোজনার (JRY) মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করার কাজ হচ্ছে। এ ছাড়া ইন্দিরা আবাস যোজনার অন্তর্গত পরিসেবার মাধ্যমে ধোঁয়াহীন চুলা তৈরির কাজ হচ্ছে।

শিক্ষা ঃ

(১) শিক্ষাদফতর স্কুলে ভর্তির তালিকা, শিশুদের স্কুলে টিকিয়ে রাখা, ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা, অনৈক্য দূরীকরণের চেষ্টা, প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্বজনীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছে।

(২) স্বাক্ষরতা অভিযানের ফলে, শিক্ষার সুবিধা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ছাড়া অর্থনৈতিকভাবে বৃদ্ধিশীল অবস্থাতে শিক্ষার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছয় থেকে পাঁচ বছর বয়সে ন্যূনতম বয়সসীমা হ্রাস হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যবই, স্কুলড্রেস, মিডডে মিল ইত্যাদির ব্যবস্থা সরকার করেছে। এই উদ্দীপকসমূহ তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারের কন্যা-শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে।

(৫) তপশিলি জাতি ও উপজাতি দফতর দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেছে।

(৬) রাস্তার শিশুদের জন্য, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য প্রকল্প, শিক্ষালয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুষ্টি ঃ

(i) অপুষ্টিজনিত সমস্যার অনেক উৎস আছে। যেমন—অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, সীমিত ক্রয়ক্ষমতা, খারাপ স্বাস্থ্য, পুষ্টি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান।

(ii) পুষ্টিসাধনে গৃহীত কার্যপ্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্বিভাগীয় যোগাযোগ ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপর।

(iii) সম্পূরক খাদ্যগ্রহণ, বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ এবং ICD প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক্ বিদ্যালয় উপযুক্ত শিশুদের তুলে ধরার প্রকল্প সমস্ত ব্লকস্তরে গ্রহণ করা হয়েছে।

(iv) সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুর জন্য মিডডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(v) সমস্ত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রকল্পে প্রত্যেকটি সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্যাণমূলক পরিসেবার মধ্যে শিশুদের টিফিন ও মিল প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

(vi) ভিটামিন-এর অভাবজনিত রোগের কারণে অন্ধত্ব প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করা হয়।

(vii) প্রত্যেক মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন করা যার মাধ্যমে অন্তত ছ-মাস অবধি যাতে শিশুর নিরাপত্তা (immunization) দেওয়া হচ্ছে।

(viii) ICD প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রাক্ বিদ্যালয় যাওয়া শিশুর স্বাস্থ্যকে নিয়মিত দেখাশোনা (monitoring) করা হচ্ছে।

অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজকর্ম ঃ

(i) আইনি দ্বন্দ্বে যেসব শিশুরা জড়িয়ে আছে, রাষ্ট্র তাদের বসবাসের জন্য সরকারি সংস্কারমূলককেন্দ্রে শিক্ষা, পুষ্টি, আমোদপ্রমোদ ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করেছে।

(ii) সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিকলাঙ্গ শিশুদের বিকাশের জন্য পুষ্টি ও বিশেষ স্কুল, বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছে।

(iii) নিষিদ্ধ পল্লির শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষত কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে যাতে তারা সংরক্ষিত পরিবেশে থাকতে পারে।

(iv) মাদকাসক্ত শিশুদের জন্য মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। এমনকি ওইসব কেন্দ্রে তারা থেকেও চিকিৎসা করাতে যাতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

(v) দুস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য সাহায্য, সুরক্ষা ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাদের কোনোরকম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৭.৭ অনুশীলনী

(১) কোন্ কোন্ ধরনের শিশুদের সুরক্ষা ও সাহায্যের প্রয়োজন আছে?

(২) শিশুদের সমস্যার বিস্তৃতি ও প্রসার কতটা?

(৩) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারি তরফে শিশুদের সমস্যার মোকাবিলার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

একক ৮ ❑ দারিদ্র্য

গঠন

৮.১ ধারণা

৮.২ দারিদ্র্যের প্রকাশ

৮.৩ দৃষ্টান্ত এবং পরিমাপ

৮.৪ দারিদ্র্যের কারণ

৮.৫ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল

৮.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্য বলতে এমন একটি সামাজিক অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সমাজের একাংশ তাদের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম ভোগ্য প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ব্যাপক অর্থে দারিদ্র্য বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর অক্ষমতাকে বোঝায়। যখন কোনো দেশের বেশিরভাগ জনগণ, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্য পোশাকপরিচ্ছদ, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন সেই দেশকে দরিদ্র দেশ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। বিশ্বের তৃতীয় সারির দেশগুলির অনেক দেশই ব্যাপক দারিদ্র্য কবলিত। যদিও বেশ কিছু উন্নত দেশেরও কিছু কিছু অংশে দারিদ্র্য লক্ষ করা যায়।

প্রায় সব দেশই দারিদ্র্যের সংজ্ঞা খাড়া করার চেষ্টা করেছে, তাই দারিদ্র্যের ধারণাটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন—আমেরিকার একজন দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান ভারতের একজন দরিদ্রের মতো নয়, এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষের থেকেও উচ্চতর হতে পারে। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মানের থেকে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দারিদ্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—চরম ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্য বলতে এমন

অবস্থাকে বোঝানো হয় যখন কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব থাকে। অন্যদিকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য হল অন্যের তুলনায় দারিদ্র্যের পরিমাপ। এই ধরনের দারিদ্র্য উন্নত দেশেও লক্ষ করা যায়।

৮.২ দারিদ্র্যের প্রকাশ

কোনো দেশের মোট জনগণের মধ্যে কাদেরকে দরিদ্র বলা হবে, কত শতাংশ লোক দরিদ্র সেই বিষয়ে নানারকম হিসাব এবং ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর হিসাবও ভিন্ন প্রকৃতির। তবে দারিদ্র্যের পরিমাপের জন্য দারিদ্র্যসীমার (Poverty line) ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন হল দারিদ্র্যসীমা কাকে বলা হয়।

দারিদ্র্যসীমা ঃ দারিদ্র্য সম্পর্কে দু-ধরনের ধারণা দেখতে পাই। একটি হল নিম্নতম মান (Minimum level) এবং অপরটি হল কাঙ্ক্ষিত মান (Desired level)। আমরা নিম্নতম মানের ধারণাটিই ব্যবহার করি। কারণ, আমাদের পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য হল নিম্নতম মানে পৌঁছানো। এ বিষয়ে নানা সময়ে নানা হিসাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলির ভিত্তিতে যে মূল বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় সেটি হল বেঁচে থাকার জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে হবে। যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ২২৫০ ক্যালোরি তাপশক্তি পেতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীকেই নিম্নতম মান হিসাবে ধরা হয়। সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে যে ব্যয় হয়, সেটিই হল নিম্নতম ভোগব্যয়। অর্থাৎ এটিই হল দারিদ্র্যসীমা।

যেসব ব্যক্তি এই পরিমাণ ভোগব্যয় করতে পারে না তাদের বলা হয় দরিদ্র, আর যাদের ভোগব্যয় এই সীমার থেকে বেশি তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থান করে। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী যেসব ব্যক্তির মাসিক ভোগব্যয় ২০ টাকার কম, তাদের দারিদ্র্যসীমার নীচে ধরা হয়।

ক্যালোরির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিমাপকে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Approach) বলা হয়। অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন না। তাদের বক্তব্য বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের ক্যালোরির প্রয়োজন একরকম নয়। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলি জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অন্তর্গত, সেগুলি এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি।

আয়-বন্টনে বৈষম্য ঃ কোনো একটি দেশের দারিদ্র্যের মাত্রা বুঝতে হলে, অবশ্যই ব্যক্তিগত আয়-বন্টনে বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রদত্ত রাশি তথ্য থেকে জানতে পারি যে, নিম্নের ২০ শতাংশ জনগণ মোট আয়ের ৯% ভোগ করে, যেখানে ওপরের ৫% জনগণ ১৭% মোট আয় ভোগ করে। তা ছাড়া ওপরের অর্ধেক জনগণ মোট আয়ের ৬৯% এবং

নিম্নের অর্ধেক ৩১% ভোগ করে। সংযুক্ত তালিকা থেকে আয়-বণ্টনে বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আয়-বণ্টনে বৈষম্য

উৎস ঃ সৌজন্যে Dull & Sundharam

শতাংশের বিভাগ	RBI-এর পরিমাপ ১৯৫৩-৫৪—১৯৫৬-৫৯		আয়েঙ্গার এবং মুখার্জির পরিমাপ ১৯৫২-৫৩—১৫৫৬		N.C.A.E.R-এর পরিমাপ ১৯৬০	
	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
ওপরের ৫%	১৭.০	২৬.০	১৪.০	১৭.৫	....	৩১.০
ওপরের ১০%	২৫.০	৩৭.০	৩৪.০	২৫.০	৩৩.৬	৪২.৪
ওপরের ৫০%	৬৯.০	৭৫.০	....	....	৭৯.৩	৮৩.০
নীচের ২০%	৯.০	৭.০	৭.৫	৮.৫	৪.০	৪.০

পাদটীকা ঃ সমস্ত পরিমাপ শতাংশে

মাথাপিছু ভোগব্যয় ঃ কোনো একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু ভোগব্যয়ের ধরন পর্যালোচনা করলে, সেই দেশের দারিদ্র্যের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেহেতু ভোগব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল, আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়ে। ব্যক্তিগত আয়-বণ্টন বৈষম্যের মতো, এক্ষেত্রেও সমাজের বিত্তশালী লোকজনের তুলনায় নিম্ন আয় সম্পন্ন লোকজনের ভোগব্যয় অনেক কম। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু ভোগব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি করা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট জনগণের নিম্নের ০-৩০ শতাংশ মোট ভোগ ব্যয়ের ১৫ শতাংশ ভোগ করে (গ্রামে) এবং ১৩.৭ শতাংশ (শহরে)। অন্যদিকে, ওপরের (৭০-১০০) শতাংশ মানুষ মোট ভোগব্যয়ের ৫১.৯ শতাংশ (গ্রামে) এবং ৫৩.৯ শতাংশ (শহরে)।

ওপরের রাশিতথ্যগুলি ১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাবে নিম্নের ০-৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে ১৫.৬ শতাংশ (গ্রামে) এবং ১৩.৩ শতাংশ (শহরে)। আবার ওপরের ৭০-১০০ শতাংশের জন্য ৫১.১ শতাংশ (গ্রামে) এবং ৫৫.৬ শতাংশ (শহরে)।

৮.৩ দৃষ্টান্ত এবং পরিমাপ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(i) ওঝার পরিমাপ ঃ অধ্যাপক পি.ডি. ওঝা দৈনিক মাথাপিছু ২২৫০ ক্যালোরি খাদ্যমূল্যের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন। ১৯৬০-৬১ ভিত্তি বছর (Base year)-র ভিত্তিতে ন্যূনতম মাসিক মাথাপিছু ১৫-১৮ টাকা ভোগব্যয়কে (শহরের ক্ষেত্রে) এবং ৮-১১ টাকা গ্রামের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমা হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৬০-৬৬ সালে গ্রামাঞ্চলে ১৮৪ মিলিয়ন লোক (গ্রামের মোট লোকসংখ্যার ৫১.৮) ভাগ এবং শহরের মোট লোকের ৭.৬% দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী। সারা দেশের হিসাবে মোট জনসংখ্যার ৪৪% দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী।

(ii) মিনহাসের পরিমাপ ঃ অর্থনীতিবিদ্ মিনহাসের হিসাব অনুযায়ী যাদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ২০ টাকার ওপরে তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে এবং যাদের এই ব্যয় ২০ টাকার নীচে অবস্থান করে তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী। এই দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে, তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামের দারিদ্র্যের সংখ্যা ও অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৬৫% দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, যা ১৯৬৯-৭০ সালে কমে ৫০.৬%-এ নেমে এসেছে।

(iii) ডাণ্ডেকর ও রথের পরিমাপ ঃ ড. ভি. এম ডাণ্ডেকর এবং ড. নীলকণ্ঠ দাস গ্রাম ও শহরের জন্য আলাদা আলাদা ভোগব্যয় ধার্য করেছেন। তাঁদের মতে ১৯৬০-৬১-কে ভিত্তি বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু বার্ষিক ১৮০ টাকা ভোগব্যয় এবং শহরাঞ্চলে ২৭০ টাকা হল ন্যূনতম ভোগব্যয়। ১৯৬৮-৬৯ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে এই হিসাবটাই গ্রাম ও শহরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩২৪ টাকা এবং ৪৮৬ টাকা হয়। তাদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৮-৬৯ সালে গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৪০% এবং শহরের মোট জনসংখ্যার ৫০% এরও কিছু বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত।

(iv) প্রণব বর্ধনের হিসাব ঃ ড. প্রণব বর্ধনের মতে মাসিক ১৫ টাকা মাথাপিছু ব্যয় হল দারিদ্র্যসীমা। সেই হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৩৮% এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫৩% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত। অর্থাৎ তাঁর হিসাব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়েছে।

(v) মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার হিসাব ঃ অর্থনীতিবিদ্ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সময়কালের গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই দুই দশকে দারিদ্র্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিবর্তন হয়নি কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে, যেমন—পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্র্যের অনুপাত ৫০% থেকে কমে ৪০% হয়েছে। আবার ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেড়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। তারপর আবার কমতে থাকে। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ দারিদ্র্যের ঘটনা কৃষির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত যখন

কৃষিতে ফসল ভালো হয়েছে তখন দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে, আবার যখন ফসল খারাপ হয়েছে তখন দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়েছে।

সপ্তম অর্থ কমিশনের হিসাব ঃ

সপ্তম অর্থ কমিশন দারিদ্র্যের হিসাব করতে দারিদ্র্যসীমার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন মোট পরিচিত Augmented poverty line হিসাবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত মাথাপিছু ব্যক্তিগত ব্যয়ের সঙ্গে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ের মধ্যে যেগুলি ধরা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

(ii) জলসরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা

(iii) শিক্ষা

(iv) প্রশাসনিক (পুলিশ, কারাগার ও আদালত) ব্যয়

(v) রাস্তাঘাট

(vi) সমাজকল্যাণ

এই নতুন হিসাব অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ (২৭৭ মিলিয়ন) দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। এর মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন গ্রামে এবং ৫২ মিলিয়ন শহরে।

ভারতে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত ঃ বি. এস. মিনহাস, আর এস জৈন এবং এস. ডি. তেণ্ডুলকর ভারতে ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সময়কালের জন্য দারিদ্র্যের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেন। এই কাজে NSS (National Sample Survey) রাশিতথ্য ব্যবহার করেন।

এই বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি নিম্নরূপ—

(i) গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের অনুপাত ১৯৭০-৭১ সালে ৫৮.৮% থেকে কমে ১৯৮৭-৮৮ সালে কমে ৪৮.৭ হয়েছে। শহরাঞ্চলে ওই সময়কালে সেটি ৪৬.২ থেকে ৩৭.৮% হয়েছে।

(ii) চরম সংখ্যাগত মানের দিক দিয়ে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের সংখ্যা ১৯৭০-৭১ সালে ২৫৮ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮৪ মিলিয়ন (১৯৮৭-৮৮)।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ওই সময়কালের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে সংখ্যাটি ৭৭ মিলিয়নে পৌঁছেছে।

(iii) ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২% যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার জনপ্রতি ০.৯%। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির এক ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

(iv) দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমবিভাগে সেইসব রাজ্যগুলি আছে যাদের দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত সর্বভারতীয় মাত্রার তুলনায় বেশি এবং অন্য বিভাগে আছে বাকি রাজ্যগুলি যাদের দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত সর্বভারতীয় মাত্রার তুলনায় কম।

১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রথমবিভাগের মধ্যে আছে—বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং কর্ণাটক। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু এবং কাশ্মীর, মণিপুর, রাজস্থান, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাট।

৮.৪ দারিদ্র্যের কারণ

ভারতের মতো দেশে দারিদ্র্যের নানাবিধ কারণ আছে, যেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্ধমান বিরাট জনসংখ্যা। ভারতবর্ষ সারাবিশ্বের কেবলমাত্র ২.৪% ভূভাগের অধিকারী অথচ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ ভারতের বাসিন্দা। পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট। ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার খুব সামান্য।

(ii) বেকারত্ব ঃ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বেকারত্ব। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকার পরিকল্পনার প্রথমদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রত্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মনে করা হত, যে অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে এবং তার সঙ্গো সঙ্গো দারিদ্র্য দূর হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, জাতীয় আয়ের উন্নতি হলেও দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সেজন্য পরবর্তীকালে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(iii) মুদ্রাস্ফীতি ঃ মুদ্রাস্ফীতি দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে এসেছে। গরিব মানুষরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়ছে। যারা দারিদ্র্যসীমার ঠিক ওপরে অবস্থান করছে, তারাও দারিদ্র্যসীমার নীচে আসবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ফলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(iv) শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা ঃ দারিদ্র্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ণতা।

শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার জন্য শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করছে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) প্রকৌশলগত নির্বাচন ঃ আমাদের দেশে বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে মূলধন নিবিড়-প্রকৌশল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। সেক্ষেত্রে শ্রমনিবিড় প্রকৌশল প্রয়োগ করলে অধিক শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মূলধন নিবিড় প্রকৌশল প্রয়োগের কারণে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(vi) আয় বণ্টন বৈষম্য ঃ ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈষম্য হল আয় বণ্টন বৈষম্য এবং এই কারণে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অল্প সংখ্যক জনগণ জাতীয় আয়ের বেশিরভাগই ভোগ করে। অন্যদিকে অধিক সংখ্যক লোক অল্প পরিমাণে ভোগ করে।

তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্বল্পতা, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভোগ্যদ্রব্য জোগানের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে দারিদ্র্যের সমস্যাটি বিরাজ করছে।

৮.৫ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল

ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। পরিকল্পনার প্রথমদিকে মনে করা হয়েছিল যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। দেখা যায় যে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ উন্নয়নের সুফলটি ভোগ করছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির কথা বলা হয়েছিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণির মানুষের উন্নতির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়, বিশেষ করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, গরিব মানুষের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২২০ মিলিয়ন মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এমন কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয় যাতে সরাসরি কাজ করে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব,

কর্মোৎপাদনশীলতা, কম মজুরি ইত্যাদি কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, জাতীয় আয়ের উচ্চহার দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান করবে।

তা ছাড়া তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তেমনই গ্রামের দুর্বল শ্রেণির (weaker section) জন্য বিশেষ কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হয়।

সপ্তম পরিকল্পনায়, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত বিশেষ কর্মসূচিগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এও আশা করা হয় যে, এইসব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৪-৯৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ এবং ২০০০ সালে ৫ শতাংশে পৌঁছাবে, যদিও এই বিবৃতির ব্যাপক সমালোচনা হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দশম পরিকল্পনাতেও বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্যের মতো একটি মূল সমস্যা বছরের পর বছর চলতে পারে না। তাই সময়সীমা নির্দিষ্ট করে, সঠিক মূল্যায়ন ও রূপায়ণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নতির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

৮.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

ভারত সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনাকালীন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(ক) ভূমি সংস্কার ঃ পরিকল্পনাকালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং প্রজা কৃষকদের নিরাপত্তার জন্য এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত জমি বণ্টনের জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

(খ) ব্যাংক ঋণ প্রসার ঃ ভারত সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জাতীয়করণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ যাতে সহজে ঋণ নিয়ে কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজ করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ঋণদান সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমেও এই কাজ সংগঠিত করা হয়।

(গ) গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রসার ঃ সরকার দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও ন্যায্য মূল্যের দোকানের (fair price shop) মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) দারিদ্র্য দূরীকরণে নির্দিষ্ট কর্মসূচি ঃ

বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারত সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে—

(i) গ্রামীণ কাজ কর্মসূচি (Rural works Programme)

(ii) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন এজেন্সি (Small Farmers Development Agency বা SFDA)

(iii) প্রান্তিক চাষি বা কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন এজেন্সি (Marginal Farmers and Agricultural Labour Development Agency বা MFAL)

(iv) খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (Drought Prone Area Programme বা DPAP)

(v) ন্যূনতম চাহিদা কর্মসূচি (Minimum Needs Programme বা MNP)

(vi) কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি (Food For Works বা FFW)

(vii) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)

(viii) জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি (National Rural Employment Programme বা NREP)

(ix) গ্রামীণ যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Training For Rural Youth For Self Employment বা TRYSEM)

(x) গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা RLEGP)

(xi) জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rojgar Yojane বা JRY)

(xii) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (Swarnajoyanti Gram Swarojger Yojana বা SJGSY)

৮.৭ অনুশীলনী

(১) দারিদ্র্যসীমা বলতে কী বোঝেন?

(২) ভারতে দারিদ্র্যের বিভিন্ন পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) ভারতে দারিদ্র্যের কারণগুলি কী কী?

(৪) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy : R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy : Mishra & Puri

(iii) The Indian Economy : Parmit Chowdhury

একক ৯ ❑ বেকারত্ব

গঠন

৯.১ বেকারত্বের ধারণা
৯.২ বেকারত্বের পরিমাপ
৯.৩ বেকারত্বের ধরন
৯.৪ বেকারত্বের কারণসমূহ
৯.৫ বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি
৯.৬ অনুশীলনী
৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ বেকারত্বের ধারণা (Concept of Unemployment)

ভারতের মতো জনবহুল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব সমস্যার উদ্ভব হয়। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি ১৫-৬০ বছর বয়স্ক, তার যোগ্যতা সত্ত্বেও যদি উৎপাদনমুখী ও আয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে না পারে, তবে তাকে বেকার বলা হয়।

বেকারত্বের ধারণা (concept of unemployment) কয়েক ধরনের হয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন (National Sample Survey Organisation বা NSSO) ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে যেসব সমীক্ষা করেছে, তাকে তারা বেকারত্ব সম্পর্কে তিনটি ধারণার কথা বলেছে। পরিকল্পনা কমিশনও বেকারত্বের সমস্যা আলোচনা করার সময় এই ধারণাগুলি ব্যবহার করেছে। NSSO যে তিনটি ধারণা দিয়েছে, সেগুলি হল—

(১) সচরাচর অবস্থা বেকার (Usual Status Unemployment)

(২) সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক অবস্থা বেকার (Current Weekly Status Unemployment)

(৩) সাম্প্রতিক দৈনিক অবস্থা বেকার (Current Daily Status Unemployment)

যেসব মানুষ কাজ না পেয়ে একবছর বা তার বেশি সময়কাল নিয়োগহীন অবস্থায় থাকেন তাদের স্বাভাবিক বা সচরাচর অবস্থা বেকার বলা হয়। এই বেকারত্ব দীর্ঘকালীন, একে প্রকাশ বা উন্মুক্ত

বেকারত্বও বলা হয় (Open unemployment)। সাধারণত শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি সপ্তাহের সাতদিনে অন্তত এক ঘণ্টার জন্যও কাজ না পান, তখন তাকে সাপ্তাহিক অবস্থার বেকার বলা হয়।

যদি কোনো সক্ষম মানুষ দিনে এক ঘণ্টাও কাজ না পান তখন তাকে দৈনিক বেকার বলা হয়। দিনে এক ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা কাজ পেলে ধরা হবে যে তিনি অর্ধদিবস কাজ করলেন।

৯.২ বেকারত্বের পরিমাপ (Magnitude of Unemployment)

সারা ভারতে ৯৪৭টি কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের (Employment Exchange) হিসাব অনুযায়ী ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪.৮ কোটি মানুষ কাজের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন এর মধ্যে সত্তর ভাগ শিক্ষিত (দশম মান বা তার বেশি) এবং ২৬ ভাগ মহিলা। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৬৯.৩ লক্ষ)

[তথ্যসূত্র : GOI Economic Survey ২০০৪-২০০৫]

NSSO-এর ৫৫তম সার্ভে অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে কর্মনিয়োগের হার বাৎসরিক ১% বেড়েছে। সংখ্যাগত দিক দিয়ে ১৯৮৩ সালে নিয়োগের সংখ্যা ছিল ৩০৩ মিলিয়ন যেটা ১৯৯৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৩৭৪ মিলিয়ন এবং ২০০০ সালে হয়েছে ৩৯৭ মিলিয়ন। ২০০০ সালে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৮.১১ মিলিয়ন, যা মোট নিয়োগের ৭ ভাগ।

সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের হ্রাস—১৯৮৩-৯৪ সালের মধ্যে যা ছিল ১.৫২% সেই হার ১৯৯৪-২০০০ সময়কালে কমে হয়েছে (–) ০.০৩%।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতে গ্রাম ও শহরের কর্মনিয়োগ ও বেকারত্বের একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতে মোট জনসংখ্যা ছিল ১০০৩.৯৭ মিলিয়ন। এর মধ্যে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৩৬৩.৩৩ মিলিয়ন এবং কাজ করে এমন শ্রমিকের সংখ্যা ৩৩৬.৭৫ মিলিয়ন। অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা ২৬.৫৮ মিলিয়ন (৭.৩২%)।

১৯৯৯-২০০০ সালে গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৭২৭.৫০ মিলিয়ন, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২৭০.৩৯ মিলিয়ন, কাজ করে এমন শ্রমিক ২৫০.৮৯ মিলিয়ন অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা ১৯.৩০ মিলিয়ন (৭.২১%)।

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট জনসংখ্যা ২৭৬.৪৭ মিলিয়ন, মোট শ্রমিকের সংখ্যা

৯২.৯৫ মিলিয়ন এবং কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৮৫.৮৪ মিলিয়ন। অর্থাৎ, বেকারের সংখ্যা ৭.১১ মিলিয়ন (৭.৬৫%)।

৯.৩ বেকারত্বের ধরন (Types of unemployment)

যেসব সক্ষম মানুষ চলতি মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না সাধারণত তাদের বেকার বলা হয়। উন্নত দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশের বেকারত্বের প্রকৃতি আলাদা, উন্নত দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্যের মন্দার কারণে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া ওইসব দেশে শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন বা উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনের কারণে কাঠামোজনিত বেকারত্বের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—

(i) মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployment) ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে শ্রমিকদের বছরে প্রায় কয়েকমাস কোনো কাজ থাকে না, কেবলমাত্র চরম ঋতুতে (peak season) তারা কাজ পায়। এই ধরনের অবস্থাকে মরশুমি বেকারত্ব বলা হয়। যেমন—আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকদের বছরে কয়েকমাস কাজ থাকে না। কিছু কিছু শিল্পকাজ মরশুমি প্রকৃতির হয়—যেমন শীতবস্ত্র উৎপাদনের কাজ। এইসব ক্ষেত্রের কর্মীরা স্বভাবতই বছরের কোনো কোনো সময় বেকারত্বের শিকার হয়।

(ii) প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised Unemployment) ঃ এ ধরনের বেকারত্ব সাধারণত গ্রামাঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়। কৃষি এদের পারিবারিক পেশা হওয়ায়, পরিবারের যেসব কর্মক্ষম ব্যক্তির অন্য কোনো উপজীবিকা নেই তারা সবাই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকেন। ধরা যাক, কোনো একটি পরিবারে সাতজন কর্মক্ষম সদস্য রয়েছেন এবং তারা সবাই তাদের কয়েক বিঘা চাষযোগ্য জমিতে কাজ করেন। তাদের ওই জমিতে পাঁচজন কর্মী হলেই যেখানে চাষ করা যায় সেখানে হয়তো সাতজন তাতে যুক্ত আছেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুজনের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। অর্থাৎ তাদেরকে ওই কাজের বাইরে সরিয়ে নিলেও মোট উৎপাদন হ্রাস পায় না। তাই এই দুজনকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকার। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা কাজে যুক্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে ওই দুজনই প্রচ্ছন্ন বেকার।

(iii) কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব (Structural Unemployment) ঃ আধুনিক শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার হয় ব্যাপকভাবে। শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এইসব উৎপাদন কাজে যুক্ত হন। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন প্রযুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যারা নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে না তারা কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব। যেমন—সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে কম্পিউটার চালিত করা হচ্ছে। স্বভাবতই বর্তমান ব্যাংকের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং কম সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে

আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে শুধু দক্ষ শ্রমিকরা কৃষিক্ষেত্রে কাজ পাচ্ছে। এভাবে প্রযুক্তিগত বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

(iv) বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Tradecycle Unemployment) ঃ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যচক্রের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরনের অর্থনীতিতে মাঝে মধ্যে মন্দা দেখা যায়। মন্দার সময় শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। ফলে শিল্প শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়। ভারতবর্ষ মিশ্র অর্থনীতির দেশ হলেও, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া বর্তমান উদারীকরণের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আরও প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে। ফলে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(v) সংঘর্ষজনিত বেকারত্ব (Frictional Unemployment) ঃ বাজারে চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্যের কারণে এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। তা ছাড়া উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল সংস্কারের ফলে অথবা শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতির ফলে এই বেকারত্বজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(vi) শিক্ষিত বেকারত্ব (Unemployment of Educated Person) ঃ যখন কোনো দেশে শিক্ষিত ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কর্মনিযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাকে শিক্ষিত বেকারত্ব বলা হয়। যেমন—ভারতে পরিকল্পনাকালীন সময়ে কর্মমুখী শিক্ষার তুলনায় প্রথাগত শিক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়েছে। ফলে প্রচুর যুবক-যুবতি ওই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

৯.৪ বেকারত্বের কারণসমূহ (Causes of Unemployment)

আমাদের দেশে বেকারত্বের নানাবিধ কারণ উল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল ঃ

(i) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ঃ পরিকল্পনাকালীন সময়ে আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয়নি। ফলে বেকারত্বের চাপ বেড়েছে। ভারতে এই বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ii) সেচের অপর্যাপ্ত সুবিধা ঃ ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে শস্যচাষের আওতাধীন মোট আবাদি জমির মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ জমি সেচের সুবিধাযুক্ত। ১৯৯২-৯৩ সালে ওই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ শতাংশ হলেও মোট আবাদি জমির প্রায় ২/৩ অংশ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

সেক্ষেত্রে জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রচুর পরিমাণে মরশুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

(iii) বিভিন্ন শিল্পে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির ধীরগতি ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম জোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মনিয়োগের হারে বৃদ্ধি ঘটেনি। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের আগমন ঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানের আশায় এক বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকের (Migrated labour) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেইহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি।

(v) মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি ঃ আমাদের দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বেশিরভাগ উৎপাদন পদ্ধতি যন্ত্র-নির্ভর, যেখানে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু ভারতের মতো জনবহুল দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম-নিবিড় হওয়ার পরিবর্তে মূলধন-নিবিড় হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে, বেকার সমস্যা, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(vi) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ঃ যাবৎকাল আমাদের দেশে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পরিকল্পনাকালে মানব উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, ফলে শিক্ষিত যুবক-যুবতিরা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমানকালে, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৯.৫ বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি ঃ (Programmes for cradication of unemployment)

ভারতে পরিকল্পনার প্রথম যুগে মনে করা হত যে অর্থনৈতিক প্রগতির হার দ্রুত হলেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। সরাসরি বেকারত্ব হ্রাসের জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ হয়নি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ভারত সরকার বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এম. ভগবতীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

১৯৭৩ সালে এই কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশ করা হয়। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল ঃ

(i) গ্রামীণ কর্মপ্রকল্প (Rural Works Programme) ঃ এই কর্মসূচিতে গ্রাম এলাকায় স্থায়ীভাবে আয় সৃষ্টি করতে পারে এমন উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়। এর ফলে গ্রামীণ বেকার সমস্যা সামগ্রিকভাবে দূরীকরণ করা যাবে না, কিন্তু বেকারত্বের তীব্রতা কিছুটা লাঘব করতে পারবে।

(ii) প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন শ্রমিক প্রকল্প (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Programme) ঃ এই প্রকল্পে প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম যেমন, ডেয়ারি, মুরগি পালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

(iii) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agency) ঃ ক্ষুদ্র চাষিরা যাতে তাদের কাজকর্মে বৈচিত্র্য আনতে পারে, সেজন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা স্থাপন করা হয়। তা ছাড়া কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সংস্থা চাষিদের আর্থিক সাহায্য দিত।

(iv) সুসংহত শুষ্ক ভূমি উন্নয়ন (Integrated Dry Land Agricultural Development) ঃ এই কর্মসূচির অধীনে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেমন—ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, জলসেচের প্রসার প্রভৃতি। এগুলি শ্রম-নিবিড় কর্মসূচি, প্রত্যাশিত হিসাব অনুযায়ী প্রতি এক কোটি টাকার কাজের জন্য ১৫ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হবে।

(v) কৃষিসেবা কেন্দ্র (Agro-Service Centre) ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত (Under-graduate, Diploma holders in Mechanical & Electrical, Graduate in science and Agriculture etc.) বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। এই স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি এবং মেরামতির কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া খাটানো এবং কৃষিযন্ত্রপাতির spare-parts ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

(vi) অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (Area Development Scheme) ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বাজার কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

(vii) জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP) ঃ ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্প চালু হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে যারা শুধুমাত্র মজুরির ওপর নির্ভর করে এবং কৃষিক্ষেত্রে মরশুমি বেকারত্বের সময় দুর্দশায় পতিত হয়, তাদের সাহায্য করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কর্মহীন বেকারদের জন্য বাৎসরিক ৩০০-৪০০ মিলিয়ন জন-দিবস (man-days) কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ধার্য করা হয়। এই প্রকল্পের অন্তর্গত কাজগুলি হল, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলসেচের জন্য কূপ খনন, গ্রামীণ জলাধার নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা,

গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরি, বিদ্যালয় এবং বালোয়াদি কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ, পঞ্চায়েত কার্যালয় নির্মাণ ইত্যাদি। ১ এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখ থেকে NREP-কে জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(viii) গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural Landless Employment Guarantee Scheme বা RLEGP) ঃ ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে NREP প্রকল্পের পরিপূরক হিসাবে এই প্রকল্প চালু করা হয়। RLEGP-এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদের সৃষ্টি করে খেত মজুরদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোও এই প্রকল্পের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, মহিলা, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে, ১১৫৪ মিলিয়ন জন-দিবস (man-days) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পকেও ১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(ix) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP) ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালু প্রকল্পগুলিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে একত্রিত করা হয়, এর নাম দেওয়া হয় Integrated Rural Development Programme বা IRDP। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে উৎপাদনের উপকরণ জোগান দিয়ে, তাদের স্বনিযুক্তিতে সাহায্য করাই হল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

(x) জওহর রোজগার যোজনা (Johar Rojgar Yojana বা JRY) ঃ ১৯৮৯ সালে এই যোজনা চালু করা হয়। সেই সময়ে প্রচলিত NREP এবং RLEGP প্রকল্প দুটিকেও এর আওতায় আনা হয়। গ্রামীণ জনগণের লাভজনক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং যৌথ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোও এর অন্যতম লক্ষ্য। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(xi) অন্যান্য ব্যবস্থা ঃ গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য আরও বিভিন্ন রকমের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্যচাষি উন্নয়ন সংস্থা, কাজের বিনিময়ে খাদ্যপ্রকল্প (FFW), খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prone Area Programme বা DPAP), ইন্দিরা আবাস যোজনা, শহরের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প (Self-Employment Programme for the Urban Poor বা SEPUP), শহরের শিক্ষিত যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প (Self Employment Programme for the Educated Urban Youth বা (SEEUY) প্রভৃতি।

কর্মনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে দুটি নতুন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। যেমন নিয়োগ নিশ্চিত প্রকল্প (Employment Assurance Scheme বা FAS) এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (Prime Minister Rojgar Yojona বা PMRY)।

এত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসলে প্রতি বছর যতজন নতুন শ্রমিক শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে, মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ তার থেকে কম, তাই বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে গেলে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বেকারি এবং দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই বেকারত্বের সমস্যা যত তীব্র হবে দারিদ্র্যজনিত সমস্যাও ততই বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ওপরও জোর দিতে হবে। কৃষিভিত্তিক নানান গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বছরে এক কোটি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য সুপারিশ করার জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এম.পি. গুপ্তার নেতৃত্বে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে। এই টাস্ক ফোর্সের হিসাব অনুযায়ী সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ গত দশকে দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে সরকারি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রেই অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মোট কর্মসংস্থানের ৯২% এই অসংগঠিত ক্ষেত্রেই ঘটছে।

৯.৬ অনুশীলনী

(১) বেকারত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) বেকারত্ব কয় প্রকারের ও কী কী?

(৩) শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের কারণগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(৪) বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তার একটি সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy—R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy—Mishra & Puri

একক ১০ ❑ জন বিস্ফোরণ (Population Explosion)

গঠন

১০.১ জনসংখ্যা সংক্রান্ত অবস্থা

১০.২ জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব

১০.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা

১০.৪ জন বিস্ফোরণের ফলাফল

১০.৫ জনসংখ্যা নীতি

১০.৬ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি

১০.৭ অনুশীলনী

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ জনসংখ্যা সংক্রান্ত অবস্থা (Population Status)

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩৬ মিলিয়ন। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটি বেড়ে হয় ৮৪৪ মিলিয়ন। আবার ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা হল ১০২৭ মিলিয়ন।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। **প্রথম পর্যায়** ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর বিস্তৃত। **দ্বিতীয় পর্যায়** ১৯২১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এবং **তৃতীয় পর্যায়** ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়ে, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৩৬ মিলিয়ন (১৮৯১) থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৫১ মিলিয়ন (১৯২১)। অর্থাৎ এই তিরিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছিল ১৫ মিলিয়ন। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কারণ এই সময়কালে উচ্চ জন্মহারের সঙ্গে মৃত্যুহারও খুব বেশি ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, জনসংখ্যা ২৫১ মিলিয়ন (১৯২১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬১ মিলিয়ন (১৯৫১)। অর্থাৎ এই তিরিশ বছরে ১১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হ্রাস, এবং তুলনামূলকভাবে জন্মহারের ক্ষেত্রে সামান্য হ্রাস। এই

সময়কালে মহামারি, প্লেগ, কলেরা, স্মল পক্স ইত্যাদি মারণ রোগগুলি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে, জনসংখ্যা ৩৬১ মিলিয়ন (১৯৫১) থেকে বেড়ে ৬৮৩ মিলিয়ন (১৯৮১) হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ, ৩২২ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় পরিকল্পনার শুরু হয়, হাসাপাতল এবং চিকিৎসা পরিসেবার প্রসার ঘটে এবং মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে যায়। ফলস্বরূপ, এই সময় জনবিস্ফোরণ দেখা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় বছরে ২.১১ শতাংশ।

১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৬৮৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৪৪ মিলিয়নে। অর্থাৎ দশ বছরে বৃদ্ধি ঘটে ১৬১ মিলিয়ন। এই দশকেও পূর্বের ন্যায় ২.১১ শতাংশ হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা ৮৪৪ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয় ১০২৯ মিলিয়ন। অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটে ১৮৩ মিলিয়ন।

কোনো একটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেই দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে এই দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহারের তফাতের মধ্যেই পাওয়া যায়। নীচের তালিকা থেকে ভারতের জন্ম ও মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

তালিকা নং ১

ভারতে বার্ষিক গড় জন্ম ও মৃত্যুহার

দশক	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯০১-১৯১০	৪৯.২	৪২.৬	৬.৬
১৯১১-১৯২০	৪৮.১	৪৭.২	০.৯
১৯২১-১৯৩০	৪৬.৪	৩৬.৩	১০.১
১৯৩১-১৯৪০	৪৫.২	৩১.২	১৪.০
১৯৪১-১৯৫০	৩৯.৯	২৭.৪	১২.৫
১৯৫১-১৯৬০	৪০.৯	২২.০	১৮.৯
১৯৬১-১৯৭০	৪১.২	১৯.০	২২.২
১৯৭১-১৯৮০	৩৬.৮	১৫.৭	২১.১
১৯৮১-১৯৯০	৩৩.৭	১২.৬	২১.১

Source : Census of India 1971, Census of India 1918.

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি ছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারও ছিল কম। কিন্তু ১৯২১ সালের পর থেকে, জন্মহারে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ না করা গেলেও মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকে। ১৯১১ থেকে ১৯২০-তে যেখানে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৮.৬ সেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৬-এ স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে।

১০.২ জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition)

জনসংখ্যা পরিবর্তনের তত্ত্বটি ইতিহাসভিত্তিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বর্তমান শিল্পোন্নত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ (stage) লক্ষ করা যায়।

প্রথম ধাপে, যখন দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তখন জন্মহার এবং মৃত্যুহার দুই-ই খুব বেশি থাকে। ফলস্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হারও কম থাকে। দ্বিতীয় ধাপে, যখন দেশে শিল্পায়নের সূচনা হয় এবং জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহারে লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় ধাপে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ধাপে দেখা যায় যে, দেশ যখন একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয় তখন জনগণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। দেশ নগরায়ণের দিকে বেশি ঝোঁকে, ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকেই তাদের জীবনযাত্রার মান একটা স্তরে বজায় রাখতে আগ্রহী থাকে। ফলে জন্মহারেও হ্রাস ঘটে। তা ছাড়া উন্নত অর্থব্যবস্থাতে মৃত্যুহারও কম থাকে। অর্থাৎ উন্নয়নের এই স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই কম থাকার ফলে একটি স্থির ও অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকে।

১০.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা (Indian Experience)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষ, প্রথম ধাপে অবস্থান করেছে। তার কারণ; আমরা দেখেছি, ভারতে এই সময় পর্যন্ত জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি ছিল (যেমন ১৯২০ সালে জন্মহার ৪৮.১ এবং মৃত্যুহার ৪৭.২) ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল (০.৯) পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশক থেকে, ভারত জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে।

এই সময়ে মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে এই মৃত্যুহার ১৯২০-এর দশকের অর্ধেকেরও কম হয়েছে। (প্রতি হাজারে ১৯)। কিন্তু জন্মহার সেই হারে হ্রাস পায়নি, তবে ভারতের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পোন্নত দেশের থেকে আলাদা। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ছাড়াই।

ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে মোট পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে ৬৩.৬৯ শতাংশ কৃষিকাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তবে, ১৯৯১ সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) ঘোষণা করার পর অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই অর্থনীতির তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য হল উদারীকরণ (Liberalisation), বেসরকারিকরণ (Privatization) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation)। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয়েছে।

(ক) মৃত্যুহার হ্রাস (Decline in the Death Rate) ঃ ভারতে মৃত্যুহার যে ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে তার অন্যতম কারণ হল চিকিৎসা পরিসেবার উন্নতি। এই উন্নতির ফলে, নানা ধরনের অসুখবিসুখ, মহামারি (যেমন—কলেরা, পক্স ইত্যাদি), যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা প্রতিটি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি ঘটানো হয়। জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের (PHC) উন্নতি ঘটানো হয়। ফলে মৃত্যুহার (Crude Death Rate—CDR) হ্রাস পায়। মৃত্যুহারের এই হ্রাস, দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ শুরু হওয়ার অনেক আগেই ঘটে যায়। ফলে এ কথা বলা যায় না যে, জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুসরণ করে জন্মহারেরও হ্রাস ঘটবে। বাস্তবে দেখা যায় মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও জন্মহারে সেরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ১৯৭০-৮০ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল যথেষ্ট বেশি (২.২২ শতাংশ)।

(খ) উচ্চ জন্মহার (High Birth Rate) ঃ ভারতে জন্মহার বেশি হওয়ার কারণগুলি হল—

(i) মহিলাদের সার্বিক বিবাহ (Universal Marriage of women) ঃ মহিলাদের মধ্যে বিবাহ একটি সর্বজনীন ঘটনা। অর্থাৎ প্রায় সকল মহিলারই বিবাহ হয়ে থাকে। নানারকম সামাজিক কারণে প্রায় প্রতিটি যোগ্য মহিলারই বিবাহ হয়। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৪০-৪৪ বছর বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে একবারও বিবাহ হয়নি, এমন সংখ্যা মাত্র ০.৫৫ শতাংশ। যেহেতু বিবাহিতা মহিলারা শিশুর জন্ম দেয়, এই ঘটনাটি জন্মহার বেশি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

(ii) সর্বজনীন মাতৃত্ব (Universal Motherhood) : বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে মাতৃত্ব প্রায় সর্বজনীন, অর্থাৎ সাধারণত প্রতিটি বিবাহিতা মহিলারই শিশু জন্মায়। মাতৃত্ব বিবাহিতা মহিলাদের কাছে এক সেরাপ্রাপ্তি ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৫০ বছর বা তার বেশি বয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬.১ শতাংশ মহিলার কোনো শিশু জন্মায়নি। তবে মনে রাখা দরকার এই মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিতা মহিলাদেরও ধরা হয়েছে।

(iii) মহিলাদের বিবাহের বয়স (Age at Marriage among Women) : আমাদের দেশে মহিলাদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রথা চালু আছে। অতীতে (১৮৯১-১৯০১ দশকে) ১৪ বছরের কম বয়স্কা বিবাহিতার সংখ্যা ছিল ২৭ শতাংশ। তবে, ১৯২৯ সালের 'Child Marriage Restraint Act' চালু হওয়ার পর অবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটে। ১৯২১ সালে, বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৩.৭ বছর, ১৯৬১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৫.৮ বছর। ১৯৯৪ সালে এই বয়স বেড়ে হয়েছে ১৯.৪ বছর। যেহেতু একজন মহিলার শিশু ধারণ করার হার সর্বোচ্চ হয় ১৫-৪৪ বছরের মধ্যে তাই, বেশিরভাগ মহিলার এই বয়সের মধ্যে বিবাহের ঘটনা ঘটলে, শিশু জন্মের হার বেশি হয়।

(iv) আংশিক সফল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Partially Effective Birth Control Methods) : আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলি আংশিকভাবে সফল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত ছিল না, আবার অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাবের দরুন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়নি। এ ছাড়া অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পুরুষ শিশুর প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি নানা কারণ লক্ষ করা যায়। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৫-৪৯ বছর বয়স্কা কোনো মহিলা গড়ে ৪.৯৯টি শিশুর জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে জন্মের হার ৪৯৯-এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫.০৭ এবং শহরাঞ্চলে ৪.১৮।

১০.৪ জন বিস্ফোরণের ফলাফল (Effects of Population Explosion)

(i) নিম্ন মাথাপিছু আয় (Low per capita Income) : ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে, জাতীয় আয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আশানুরূপ কার্যকরী হয়নি। আমরা জানি, দেশের মোট জাতীয় আয়কে, মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার জন্য মাথাপিছু আয় কম থেকে গেছে। মাথাপিছু আয়কে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয় (যদিও বর্তমানে ইউনেস্কো নির্ধারিত HDI—Human Development Index, অধিক গ্রহণযোগ্য)।

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৯০-৯১ এই ৪০ বছর সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৪.২১ শতাংশ। কিন্তু ওই সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২.২৩ শতাংশ। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২১ শতাংশ। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫%শতাংশ কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশ। (এই হিসাব ১৯৮০-৮১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী)।

(ii) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হ্রাস (Lowering the growth Rate of Population) ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে দেয়। জনসংখ্যা বেশি হারে বৃদ্ধি পেলে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কম হবে। মাথাপিছু আয় কম হলে, সঞ্চয় কম অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়। আমরা জানি, দেশের মোট উৎপাদন বিনিয়োগের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয় বাড়বে। সুতরাং মাথাপিছু আয় কম হওয়ার জন্য জাতীয় আয়ও কম হয়।

(iii) খাদ্য সমস্যা (Food Problems) ঃ অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথাস যখন তার বিখ্যাত রচনা "Essays on population" প্রকাশ করেন, তারপর থেকেই জনসংখ্যা ও খাদ্যসমস্যার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। ভারতে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯২১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১.১১ একর থেকে কমে ০.৪৭ একর হয়েছে। অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

১৯৫৬ এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে মোট খাদ্যশস্য (দানাশস্য এবং ডাল) উৎপাদন ৬৩ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ মিলিয়ন টন, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৭ মিলিয়ন থেকে ৪৯৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়। ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১ গ্রাম থেকে মাত্র ৫১২ গ্রামে দাঁড়ায় (৩১ বছরে ১৮.৮ শতাংশ)।

(iv) জনসংখ্যা ও অনুৎপাদনশীল ভোক্তা (Population and Un-productive Consumer) ঃ ভারতের মোট জনসংখ্যাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল ভোক্তা। উৎপাদনশীল বলতে তাঁদেরকে বুঝি, যাদের জাতীয় উৎপাদনে অবদান আছে। আর যাদের জাতীয় উৎপাদনে কোনো অবদান নেই, তাদের অনুৎপাদনশীল বলা হয়। অনুৎপাদনশীল ভোক্তার মধ্যে পড়ে শিশু, বৃদ্ধ এবং ১৫-৫৯ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কোনো কাজ করে না। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকার সমস্যাও তত তীব্র হচ্ছে। ফলে, অনুৎপাদনশীল ভোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ, জাতীয় উৎপাদন ভোগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

জনসংখ্যার কর্মী ও কর্মী নয় এমন জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগত অনুপাত ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬১ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫৬ মিলিয়ন। ১৯৮১-তে সেটি হয়েছে ৪৬৪ মিলিয়ন। মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ হল ০-১৪ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ কর্মী নয় এমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ, শিশু জন্মের হার বেশি হওয়া।

(v) জনসংখ্যা এবং বেকার সমস্যা (Population and Unemployment Problems) ঃ কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে, শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিক হার, বেকার সমস্যাকে আরও তীব্র করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) শুরুতে (১৯৮০ সালে) মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ২০.৭ মিলিয়ন। অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭) সংখ্যাটি বেড়ে হয় ২৮ মিলিয়ন। অর্থাৎ প্রতি বছর শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পনাকালে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা যাচ্ছে না। ফলে পুরানো সংখ্যার সঙ্গে নতুন সংখ্যা যোগ হয়ে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

(vi) জনসংখ্যা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সমস্যা (Population and the Problems of Education, Medical Fecilities and Housing) ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে, ফলে, শিক্ষাগত ব্যয়ের চাহিদাও বাড়ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় হল একপ্রকার সামাজিক বিনিয়োগ। দেশের ছেলেমেয়েরা যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে দেশে ভালো শ্রমবল গড়ে ওঠে, যাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। হিসাব অনুযায়ী ছাত্রপিছু শিক্ষাখাতে বাৎসরিক খরচ ১৪৪ টাকা। এই খরচের হিসাব (৬-১৪ বছর), যার সংখ্যা ১৫৬ মিলিয়ন (১৯৮১)। মোট খরচ হয় ২২৪৬ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হিসাব করলে সংখ্যাটি অনেক বেশি হবে।

জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং আবাসনের ক্ষেত্রেও ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৫ জনসংখ্যা নীতি (Population Policy)

ভারতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের প্রয়োজন অবশ্যই। ১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬১ মিলিয়ন। ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যা হয়েছে ১০২৭ মিলিয়ন।

ভারতবর্ষ বিশ্বের প্রথম দেশ যে ১৯৫২ সালে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু এই ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে। এই

পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয় এই ভাষায়—"the objective of stabilising the growth of population over a reasonable period."

এই পরিকল্পনায় যে লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়, সেগুলি হল—

(i) প্রতি হাজারে জন্মহার (CBR), ১৯৭৩ সালের মধ্যে ২৫শে কমিয়ে আনা।

(ii) ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে জন্মহার ২৩ করা।

কিন্তু নানা কারণে এই দুটি ক্ষেত্রেই নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি।

১৯৮৩ সালে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত 'Working Group on Population Policy' সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (National Health Policy—1983) গৃহীত হয়। এই নীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলি হল :

(i) ২০০০ সালের মধ্যে Net Reproduction Rate (NRR) কমিয়ে ১-এ আনা।

(ii) এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য জন্মহার ২১ এবং মৃত্যুহার জন (প্রতি হাজারে) করা হবে। তা ছাড়া শিশুমৃত্যুর হার ৬০-এর নীচে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৯৯৫ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পরবর্তীকালে রিভিউ করে ঠিক করা হয় যে, এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি আগামী ২০০৬-২০১১ সময়কালের মধ্যে অর্জিত হবে।

জনসংখ্যা নীতি (১৯৯৭-২০০২) : নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত জনসংখ্যা নীতি, ভারতের উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পিছনে তিনটি কারণ চিহ্নিত করে—

(i) সন্তান ধারণে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি হওয়ার দরুন মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি। ১৫-৪৪ বছর বয়স্ক মহিলার সংখ্যা ১৯৬৭ সালে ছিল ৭৮.৮ মিলিয়ন, সেই সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ১৪৪.২ মিলিয়ন।

(ii) শিশু মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার জন্য দম্পতিরা বেশি সন্তানের ব্যাপারে আগ্রহী থাকে।

(iii) জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ।

নবম পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় সেগুলি হল—

(ক) শিশুমৃত্যুর হার ৫০ (প্রতি হাজারে) কমিয়ে আনা।

(খ) জন্মহার ২৩ (প্রতি হাজারে) করা।

(গ) TFR (Total Fertility Rate) ২.৬ করা।

২০০২ সালের মধ্যে ওই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল—

(i) নিশ্চিত মাতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ii) জন্মনিরোধক ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা।

(iii) গর্ভপাতকে আইনি স্বীকৃতি প্রদান।

(iv) কার্যকরী পুষ্টি পরিসেবা দান।

(v) সংক্রামক যৌন ব্যাধি (STD) এবং RTI (Reproductive Tract Infection)-এর প্রতিরোধ।

এই জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার জন্য আরও যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেগুলি হল—

(i) Primary Health Centre (PHC)-গুলিকে উন্নত করা। প্রতিটি PHC-তে একজন পুরুষ ডাক্তার একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন জনসংখ্যা বিষয়ক ডাক্তার নিয়োগের কথা বলা হয়।

(ii) মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সন্তান প্রসব, ANN (Auxiliary Nurse Midwive)-দের IUD (Intra Uteriam Devices) প্রতিস্থাপনে প্রশিক্ষণ, PHC-গুলিতে OT-র ব্যবস্থা করা যাতে বন্ধ্যাত্বকরণের কাজ করা যায় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়।

(iii) জনসংখ্যা নীতিকে Total Literary Mission (TLM)-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ।

(iv) দম্পতিদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী জন্মনিরোধকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

(v) জন্মনিরোধকের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত' উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে 'দলগত' উৎসাহদানের ওপর গুরুত্বদানের কথা বলা হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ (National Population Policy 2000) : এই নীতিতে ২০১০ সালের মধ্যে Replacement Level of Fertility-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলা হয়। তা ছাড়া ২০৪৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থা (stability) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

এ ছাড়া যে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) শিশুমৃত্যুর হার (IMR) প্রতি হাজারে ৩০শে কমিয়ে আনা।

(ii) মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার (MMR) প্রতি লাখে ১০০-র নীচে নামিয়ে আনা।

(iii) ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকরণ, বিবাহ নিবন্ধকরণ, সর্বজনীন টিকাকরণ (মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রেই)-এর ক্ষেত্রে।

(iv) মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে সঠিক বয়সে বিবাহের জন্য উৎসাহ দান।

(v) কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা এবং ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যা বিষয়ক জাতীয় কমিশন (National Commission on Population) নামে একটি স্থায়ী-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার প্রধান কাজ হল জনসংখ্যা নীতি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা, তার দেখাশোনা করা।

১০০ কোটি টাকা নিয়ে Population Stabilization Fund তৈরি করা হয়েছে, যা জনসংখ্যা নীতির কাজকর্ম রূপায়ণে খরচ করা হবে। এই তহবিল শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কোম্পানি, বেসরকারি সংগঠন প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হবে।

১০.৬ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি (Family Welfare Programme)

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে, সরকারিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি (Family Planning Programme) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় ১৯৬৬-৬৭ সালে, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হল—

(i) পরিবার পিছু গড় শিশুর সংখ্যা ৪.২ থেকে ২.৩-এ কমিয়ে আনা।

(ii) শিশু জন্মহার ২১, মৃত্যুহার ২৯ এবং শিশু মৃত্যুর হার ৬০-এ নামিয়ে আনা।

(iii) যোগ্য দম্পত্তির (Eligible Couple) ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৬০%-এ পৌঁছে দেওয়া।

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে স্থিতাবস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঠিক হয়।

কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় সপ্তম পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা পুনর্বিবেচনা

করা হয় এবং বাস্তবসম্মত লক্ষ্য ধার্য করা হয়। এই পরিকল্পনায় CPR (Couple Protection Rate) ৪২% ধার্য করা হয়। এ ছাড়া ১৯৯০ সালের মধ্যে বন্ধ্যাত্বকরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ৩১ মিলিয়ন। তা ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে ব্যাপক আকার দিয়ে, এর নামকরণ করা হয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের (Mother and Child Health—MCH) ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির মূল দিকগুলি হল—

(i) জনগণকে ছোটো পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করা।

(ii) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্মনিরোধকের জোগান সুনিশ্চিত করা।

(iii) মা এবং শিশু স্বাস্থ্য (Mother and Child Health—MCH) কর্মসূচির সঙ্গে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির সহযোগিতা ও সংযুক্তিকরণ।

(iv) বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

(v) স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, টিকাকরণ কর্মসূচি, পুষ্টি পরিষেবা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার, মা ও শিশুদের বিভিন্ন প্রকারের রোগ ইত্যাদি হ্রাস।

(vi) মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

(vii) পরিবার কল্যাণ কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধার প্রদানের মাধ্যমে কাজে আগ্রহী করে তোলা। .

(viii) বিবাহের বয়স বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ।

(ix) আইনস্বীকৃত গর্ভপাত সম্পর্কে দম্পতিদের সঠিক তথ্য জানানো।

(x) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

(xi) পরিবার পরিকল্পনার জন্য আরও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে অস্থায়ী (Non-permanent) পদ্ধতির ওপর। এর সঙ্গে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। যাতে পরিবার পরিকল্পনার উদ্যোগ ব্যাহত না হয়।

১০.৭ অনুশীলনী

(১) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করুন।

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, অর্থনীতির ওপর কীরূপ প্রভাব লক্ষ করা যায়?

(৩) ভারতে শিশু জন্মের হার বেশি হওয়ার কারণগুলি কী কী?

(৪) ভারতের জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাধর্মী প্রবন্ধ লিখুন।

(৫) পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কী, কেন এবং কীভাবে সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy : R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy : Mishra & Puri

একক ১১ ❑ কৈশোর অপরাধ

গঠন

১১.১ ভমিকা

১১.২ কৈশোর অপরাধের ধারণা

১১.৩ প্রকৃতি ও পরিণাম

১১.৪ বৈশিষ্ট্য

১১.৫ সমস্যার বিস্তৃতি

১১.৬ উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

১১.৭ অপরাধীদের পরিচর্যার নানা উপায়

১১.৮ কিশোর অপরাধীর তত্ত্বাবধানমূলক প্রতিষ্ঠান

১১.৯ কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ ভূমিকা

ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষি, বহু জাতিভুক্ত মানুষের দেশে হাজার রকমের সমস্যা দেখা দেয়, কৈশোর অপরাধ তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার ধরন এতটাই জটিল যা দেশের সাধারণ নাগরিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেভাবে শহর ও নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে কৈশোর বয়সে অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। ব্যাপকহারে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্যা মোকাবিলার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা না থাকার ফলে এই সমস্যাও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সকলের কাছেই গভীর উদ্বেগের ও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মোকাবিলা করতে হলে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১১.২ কৈশোর অপরাধের ধারণা

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কৈশোর অপরাধ বলতে আমরা বুঝি "একটি শিশু আইন লঙ্ঘন করলে এবং আইনত দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করলেই তা হবে কৈশোর অপরাধ।" অন্য অর্থে একজন কিশোর অপরাধী হবে সেই যার কাজকর্ম তার যত্ন ও শিক্ষাদানের জন্য দায়বদ্ধ অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যদের কাছে বিপদসঙ্কেত ও উদ্বেগের কারণ হবে। উদয়শঙ্করের ভাষায় কৈশোর অপরাধ হল "একটা বিদ্রোহ, ক্ষোভের প্রকাশ যার লক্ষ্য কিছু ধ্বংস করা বা ভেঙ্গে ফেলা বা পরিবেশটা পাল্টে দেওয়া।" ফ্রায়েডল্যাণ্ডারের মতে "এটা কৈশোর অভব্যতা যা আইনগতভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে।" সিরিল বার্ট (Cyril Burt)-এর মতে এটা সমাজবিরোধী প্রবণতা যা প্রথাগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বা না করেই মোকাবিলা করা যেতে পারে। উইলিয়াম এইচ. সেলডম (William H. Sheldom)-এর ধারণায় এটি হলো সঙ্গত আশা-প্রত্যাশার বাইরে কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। এমন এক ধরনের কাজ যা বড়রা করলে তা অপরাধ বলেই বিবেচিত হতো। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে কৈশোর অপরাধী সেই যার কাজকর্ম সমাজের স্বাভাবিক রীতি-নীতির পক্ষে বেমানান। সে এমন ভূমিকা পালন করে যা সমাজের কাছেই বিপদসঙ্কেত। প্রথাগতভাবে বলা যায় যে, যে কোন লিঙ্গের ৭ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ১৮ বছর পেরিয়ে গেলে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তারা আর শিশু থাকে না। অন্যদিকে ৭ বছর বয়সের নীচে শিশুদের কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে না। বয়সের এই মানদণ্ড কোথাও কোথাও একটু ভিন্ন থাকতে পারে। দেশকাল ভেদে সেই তারতম্য থাকা স্বাভাবিক।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার যুগে আমরা কাউকে অপরাধী বলতে পারি না। তার কাজকর্মকে অপরাধীর আচরণ হিসাবে বলতে পারি। তারা কোন নির্দিষ্ট ধরনের মানবজাতি নয়। স্বাভাবিক আশা-প্রত্যাশার মধ্যে বেড়ে ওঠা অন্য দশজনের মতো তারাও স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তারতম্য ঘটে কখনো কখনো তারা যখন সমাজের অন্যদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। কৈশোর অপরাধের ধারণায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন বলা হয়ে থাকে যে কৈশোর অপরাধ কোন শারীরবৃত্তীয় উপাদানও নয় আবার মানসিক ভারসাম্যহীনতাও নয়। এই ধরনের শিশুদের আচরণগত সমস্যাই মূলত দায়ী।

১১.৩ প্রকৃতি ও পরিণাম

কৈশোর অপরাধের প্রবণতা নানাবিধ। সকল অপরাধীর ধরন যেমন এক নয়, তেমন বিভিন্ন কিশোর-কিশোরীর অপরাধ প্রবণতাও বিভিন্ন হয়। যেমন কারও কারও প্রবণতা থাকে স্কুল থেকে

পালিয়ে যাওয়া। সে স্কুলের কাজকর্ম বা বিদ্যাচর্চার মধ্যে কোন আনন্দ বা উৎসাহ পায় না বলেই তার মধ্যে স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস বাড়ে। কখনো কখনো পরিবেশগতভাবে বা কখনো সেই স্কুলের নানান বিষয়ের পেছনে বেশী প্রভাব ফেলে থাকে। ইলিয়ট ও মেরিল (Elliot ও Merill) এই স্কুলছুট প্রবণতাকে কৈশোর অপরাধের কিণ্ডারগার্টেন বলে চিহ্নিত করেছেন। যদি স্কুল তার নিয়মনীতি না থাকা, সঠিকভাবে দেখভাল না করা, শিক্ষকদের অকারণ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, বসার জায়গা ঠিকভাবে না থাকা, পড়ানোর কোন চর্চা না থাকা প্রভৃতি নানান কারণে শিশুদের ধরে রাখতে না পারে তাহলে সেই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুট-এর প্রবণতা বাড়বে। এমনকি পারিবারিক পরিবেশ, ভালো বন্ধু-বান্ধবী না থাকা, মনের মধ্যে খেলাধুলার সাধ না থাকা, পড়ার খুব চাপ থাকা ইত্যাদি কারণেও অনেক কিশোর-কিশোরীকে স্কুলছুট হতে বাধ্য করে।

ভবঘুরে বা যাযাবরত্ব কৈশোর অপরাধের আরেক প্রকৃতি। সংশ্লিষ্ট শিশুর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই এই প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা সাধারণত ৮ বছর বয়সী বা তার কাছাকাছি সময়ে সবচেয়ে বেশী হয়। এই ধরনের শিশুদের সাধারণত কোন যত্ন নেওয়া হয় না বা পারিবারিক দিক থেকে অবহেলিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুরা কোন না কোন ভগ্ন পরিবার থেকে বা অগোছালো পরিবার থেকে আসে।

আরও এক ধরনের প্রবণতা কৈশোর অপরাধীর মধ্যে দেখা যায় যা হলো জুয়া খেলা। কৈশোরের একেবারে গোড়ার দিকে এই প্রবণতা আসে। তার অজান্তেই তার মধ্যে এই অভ্যাস শক্ত ভিত তৈরি করে দেয়।

উপরোক্ত তিন প্রকৃতির কৈশোর অপরাধ ব্যতীত অন্য ধরনের অপরাধও কৈশোরে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, কেউ কেউ ভিক্ষা করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে ভিক্ষুক হিসাবে স্বীকৃত হয়। কেউ কেউ অত্যন্ত অশালীন কথাবার্তার চর্চায় মগ্ন হয় এবং পরবর্তীকালে তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অভব্য আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া চুরি, মদ্যপান, মাদক ব্যবহার, পতিতালয়ে যাওয়া, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির মতো নানান অসামাজিক কাজে কৈশোরে কেউ কেউ হাত পাকায়।

১১.৪ বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের কৈশোর অপরাধের নানান রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিচে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

★ পরোয়া না করার আচরণ

★ সংযত আবেগ

★ মেলামেশায় ও কথোপকথনে বাছবিচার

★ বাড়ির বাবা-মা/অন্য লোকজন/প্রতিবেশী/শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এড়িয়ে চলা।

★ পড়াশোনায় ভালো না লাগা।

★ এলোমেলোভাবে জীবনযাপন।

★ সঠিকভাবে ঘুম না হওয়া।

★ অসচ্ছল বা উস্কো-খুস্কো দেখানো।

★ ছোট ছোট সঙ্গীসাথী গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠতা।

★ অর্ধেকভাবে আয় ও নেশা করা, জুয়াখেলা, যৌন ব্যবসায় মেতে যাওয়া।

★ বাড়ির বাইরে দিন ও রাত কাটানো প্রভৃতি।

১১.৫ সমস্যার বিস্তৃতি

একথা মনে রাখা দরকার যে কৈশোর অপরাধীরা নানারকমের অসামাজিক ও সমাজবিরোধী কাজকর্মের সাথে যেমন চুরি, যৌন অপরাধ, স্কুলছুট, অত্যাচার, পাচার প্রভৃতির সাথে যুক্ত। কিন্তু এই অপরাধগুলোর প্রত্যেকটাই সমান গুরুতর হবে এমনটা সাধারণত হয় না। অন্যদিকে প্রতিটি অপরাধীর আচরণও একইরকম হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৈশোর অপরাধীর আচরণ বিষয়ক একটি গবেষণার প্রতিবেদনে চুরি সংক্রান্ত অপরাধ সবার আগে এবং দৈহিক নির্যাতনকে সবার শেষে ক্রমানুসারে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদয়শঙ্করের মতে দিল্লির সমস্ত কিশোর অপরাধীর মধ্যে ৭৭.৭% (মোট ১৪০ জনের মধ্যে) কোন না কোন চুরির সাথে জড়িত।

যাই হোক, কৈশোর অপরাধ বর্তমান সমাজে এবং সরকারী ব্যবস্থার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। অনেকে মনে করছেন যে, এই সমস্যা এমন গভীরে প্রবেশ করেছে যে এর থেকে সমাধানের পথ বার করা খুবই কঠিন। কেউ কেউ মনে করছেন এখনও সময় আছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বা সমস্যা মোকাবিলা করার। সমস্যার আদৌ সমাধান করা যাবে না তেমন নয়। ১৯৭০-এর কলকাতা শান্ত হবে কেউ কখনো ভাবতেও পারেন নি। সেখানে আর্থিক, সামাজিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেছে। ঘটেছে সকলের কল্পনার বাইরে।

একই রকমভাবে কৈশোর অপরাধও মোকাবিলা করা সম্ভব। যদি কোন দেশ ৬৫% সাক্ষরতার হার নিয়েও পরিবার পরিকল্পনার মতো কর্মসূচীকে চূড়ান্ত সফল রূপদান করতে পারে, অর্ধেকেরও

বেশি কৃষক নিরক্ষর হয়েও কৃষিবিপ্লব ঘটাতে পারে, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রূপায়ণ ঘটাতে পারে তাহলে সেই দেশ তার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় কৈশোর অপরাধ মোকাবিলা করতে পারবে না। একথা কেউ মানতে চায় না।

১১.৬ উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

এই সমস্যা সৃষ্টির পেছনে নানান কারণ আছে। কৈশোর অপরাধ ঘটার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব কারণ থাকে তার কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল। সবচেয়ে বড় কারণ হিসাবে পরিবার এবং সমষ্টির নানান দোষ-ত্রুটি থেকেই এই অপরাধ দানা বাঁধতে শুরু করে। যাই হোক, এই সমস্যা সৃষ্টির পিছনে মূল কারণগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) দারিদ্র্যতা ঃ বেআইনী ও অসামাজিক কাজ সম্পর্কিত কৈশোর আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দারিদ্র্যতা। আমাদের দেশে এর গভীরতা এবং বিস্তৃতিও উদ্বেগজনক। মহাত্মা গান্ধী একে শাশ্বত বাধ্যতামূলক অবস্থা বলেই অভিহিত করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কৈশোর অপরাধের প্রবণতা শহুরের দারিদ্র্য অধ্যুষিত বস্তি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ডঃ আর. কে. মুখার্জীর কথায়— এখানেই এই সমস্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে ঘটে তার কারণ শিশু অবস্থাতেই এর জীবাণু প্রবেশ করে। গ্লেক এবং গ্লেক (Glueck and Glueck) মন্তব্য করেছেন যে, ৬৫% কৈশোর অপরাধী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো থেকেই আসে। তবে দেখা গেছে, বর্তমানকালে শহরের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলো থেকেই কৈশোর অপরাধী আসে, তা নয়। জীবনের প্রতিটি স্তর থেকেই তারা অপরাধের জগতে প্রবেশ করে। বিস্ময়ের কথা এই যে, আজকাল তথাকথিত শহুরে বিত্তশালী ও শিক্ষিত পরিবারগুলো থেকেই কৈশোর অপরাধীর একটা বড় অংশ আসছে।

(খ) সুযোগ-সুবিধার অসাম্যতা ঃ অন্য অনেক কারণের পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বৈধভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অসাম্যতাও একটা বড় কারণ। যার ফলে হতাশা ও মানসিক অবসাদের কারণে অবৈধ কাজকর্মের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। মার্টন (Merton) বলেছেন, "সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠা আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিকভাবে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গঠিত নানান উপায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার এটা একটা লক্ষণ।"

(গ) অসংগঠিত পরিবার ঃ যে কোন মানুষেরই পারিবারিক বাতাবরণ তার আচরণ গঠনে সাহায্য করে। মজবুত পারিবারিক বন্ধন থেকেই তার চরিত্র গঠন হয়। মনস্তত্ত্ববিদদের ধারণায় অসংগঠিত পরিবারের একজন মানুষ নিজেকে অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখনই, যখন তার উপর

প্রতিনিয়ত অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সে ভয়ানক হিংস্রও হয়ে উঠতে পারে। একটা শিশুর ক্ষেত্রে তার শারীরিক বিষয়ের থেকে মানসিক বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। পারিবারিক আবেগ ও অনুশোচনা যদি শিশুর মানসিক অবস্থার পরিপন্থী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা শিশুর শারীরিক বিষয়ের প্রতি অধিক যত্নশীল হই। কিন্তু তার মানসিক বিষয়ের প্রতি বা পারিবারিক সুসম্পর্কের প্রতি খেয়াল সেভাবে রাখি না। শিশুর নিরাপত্তাবোধ না থাকলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা আসে না। স্বাভাবিকভাবেই ভগ্ন-পরিবরার শিশুর জন্মাবস্থা থেকেই আচরণগত সমস্যার কারণ তৈরি করে থাকে। যদিও এখন 'বাড়ি' শব্দটির ধারণায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অতীতের 'হোম' থেকে আজকের বাড়ি'র মধ্যে একটা বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। দেখা গেছে প্রায় ৫০% কৈশোর অপরাধী পারস্পরিক সম্পর্কের দিক থেকে ভাঙা বাড়ি থেকেই আসে। সমষ্টির লোকজন যেখানে পারস্পরিক খবরাখবর রাখেন না, তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় যা পরবর্তীকালে শিশুদের জীবনে অপরাধের ঘটনায় যুক্ত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

(ঘ) সঙ্গী-সাথীর দৈন্যতা ঃ শিশুরা জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিয়মে তার সমবয়সী সঙ্গী-সাথীর ভক্ত হয়। সকলেই যে সম-মনোভাবাপন্ন সঙ্গী পায় তা নয়। দেখা গেছে অসৎ মনোভাবাপন্ন ও বাউণ্ডুলে প্রকৃতির সঙ্গী-সাথী পেয়ে এবং তার প্ররোচনায় অনেক শিশু একটু বড় হয়ে নানান রকম অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। Glueck and Glueck দেখেছেন যে ৭২% ঘটনায় দুজন, তিনজন বা তার বেশী কিশোর-কিশোরী যৌথভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষেও কৈশোর অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে দলবদ্ধভাবে বা একাধিক দল মিলেই অপরাধ ঘটানো হয়েছে। শুধু যে অসৎ সঙ্গী থেকেই অপরাধীর প্রবণতা আসে এমনটা নয়, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিশুর আচরণ গঠনও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে কাজ করে থাকে।

(ঙ) সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঃ কৈশোর অপরাধের এটাও অন্যতম একটি কারণ। বিভিন্ন জনের সাথে মানিয়ে চলতে না পারা ও অবসাদজনিত মানসিক অবস্থা একজনকে কোন একটি মনোভাব থেকে বিপরীত মনোভাবাপন্ন করে দিতে পারে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেছেন এই অবস্থা থেকে অপরাধ জন্ম নিতে পারে। তাদের মতে সমাজের একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ বা ভাব বিনিময় যার থেকে এই ধরনের অপরাধ ঘটানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

(চ) অবহেলা বা বাতিল করা ঃ মা-বাবা/অভিভাবকের দ্বারা শিশুদের অবহেলা বা বাতিল হওয়া থেকেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই আচরণের অঙ্গ হলো নিষ্ঠুর ব্যবহার, অত্যধিক কড়া শাসন, নানা রকমের শাস্তিদান প্রভৃতি যা শিশুদের মনে তাদের মা-বাবা বা অন্য অভিভাবকের প্রতি হিংস্রভাব

জাগিয়ে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে বিভিন্ন জায়গায় (যেমন, স্কুল, কাজের স্থলে) কর্তৃপক্ষের উপর ভয়াবহ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ক্রমে মিথ্যাবাদী হয় এবং স্কুলছুট হয়। এভাবে উপরোক্ত ধরনের আচরণের ফলে শিশুদের মনে অপরাধের ভাবনা দানা বাঁধে।

এছাড়াও গঠনমূলক বিনোদন, সৃজনশীলতার অভাব, সুস্থ মানসিকতার প্রতিবেশী না থাকা, সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষাব্যবস্থা, তরুণ বয়সে বিপজ্জনক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রভৃতি নানারকম কারণেও কিশোর অপরাধীর প্রবণতা বেড়ে চলেছে। উপরোক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ব্যতীত ব্যক্তিগত নানান বিষয়ও থাকে। যেমন—মানসিক বিকাশে বাধা, ভাবাবেগের প্রভাব এবং বুদ্ধিমত্তার (Intelligence Quotent) স্তর পশ্চাৎপদগ্রস্ত-এর মতো বিষয়গুলিও এই সমস্যার পেছনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১১.৭ অপরাধীদের পরিচর্যার নানা উপায়

জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজ্য ও জেলাস্তরে এবং কখনো কখনো জেলাস্তরের নীচেও কর্মরত নানান স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কৈশোর অপরাধের মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই সমস্যার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা ঠেকাতে সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় হলেও কৈশোর অপরাধের নানান প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ভাবনাচিন্তার দরকার। সমষ্টির সামাজিক গঠনপ্রণালী ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই সমস্যার শেকড় বিস্তৃত। সুতরাং শুধুমাত্র পুলিশ, প্রশাসন বা আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য বহুমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার মূলক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা এবং 'একের জন্য বহুজন' সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সূত্র বার করা দরকার।

বেশ কিছুদিন আগে থেকে ভারতে সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচি (Social Defence Programme) গ্রহণ ও রূপায়ণের কাজ চলছে। কৈশোর অপরাধের মতো গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ও এই কর্মসূচিতে ভাবা হয়েছে। কিন্তু ঘটনার উপর শুধুমাত্র গবেষণা ও নানান গতিপ্রকৃতির বিষয় চিহ্নিত করে রেখে দিলেই কাজ হয় না। সমস্যাটির সবদিক সঠিকভাবে বিবেচনা করে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। সেই কাজ করতে গেলে কৈশোর অপরাধ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

অন্যদিকে, বিশেষ বিশেষ কিছুক্ষেত্রে শাস্তিবিধান-এর মাধ্যমেই যে সমাজ সজাগ হবে এবং এই অপরাধ থেকে মুক্ত হবে, এমনটা ভাবা যায় না। যদি অপরাধীকে পুনরায় শিক্ষাদান ও হাতের কাজের

নানান বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে অপরাধীর পাশাপাশি সমাজেরও কিছুটা স্বার্থপূরণ হয়। যার ফলে, সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই ধরনের অপরাধীর পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বনের পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা জাগে। আজকের শহুরে জীবন নানান ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা। বিশেষ করে মহানগর জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কৈশোর অপরাধ তার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা। যার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই দরকার। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তার নতুন প্রজন্মের নাগরিক বিশেষ করে শিশুদের পরগাছা-প্রবণতা থেকে মুক্ত করা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে দেশের নগরাঞ্চলে গজিয়ে ওঠা কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার মোকাবিলায় সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। সকলের সর্বোত্তম প্রচেষ্টায় সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে। এখানে সমস্যার সমাধানের কথা মাথায় রেখে কতকগুলি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

★ পিতামাতা/অভিভাবকের সবার আগে শিশুদের মনের গুণগত বিকাশ ও শারীরিক মানসিক বিকাশের জন্য সব রকমের উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে শিশু তার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

★ সংশোধনমূলক পরিষেবা শিশুর পাশাপাশি তার পরিবারের জন্যও প্রদান করা যাতে শিশুটি তার পরিবার থেকে বাইরে গিয়ে পরিষেবা লাভ ও পরিবারের থেকে বঞ্চনার শিকার না হয়।

★ যে সব পরিবার অসহায় ও নানান সমস্যায় জর্জরিত, তাদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা থাকা এবং প্রয়োজনে সমাজ যেন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তা দেখা।

★ অপরাধ প্রবণতা রোধের জন্য পিতামাতা ও শিশুর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা একান্ত দরকার। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এর প্রভাব সীমাহীন। এই লক্ষ্যে পিতামাতাকে সঠিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরী।

★ তরুণ অপরাধীকে 'অপরাধী' হিসাবে বিবেচনা না করে প্রতিকারমূলক পরিচর্যা দেওয়া দরকার। খাঁচায় বন্দী করা নয়, তাদের সংশোধনের উদ্যোগই কাম্য।

★ বাড়ি, বিদ্যালয় ও সমাজে চরিত্রগঠনমূলক কাজকর্মের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

★ শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক করা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ঘটানো যাতে শিশুরা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ পায়। সেজন্য শিক্ষা-সূচিতেও পরিবর্তন আনা দরকার।

★ শিশুদের উপর নানা রকমের অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য দায়ী প্রাপ্ত বয়স্কেরা যাতে কঠিন

সাজা পায় তা দেখা। সেই মানুষদের বা তাদের গোষ্ঠীর হাত থেকে শিশুদের উদ্ধার করা একান্ত জরুরী।

★ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া।

★ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সৃজনশীল কাজকর্মের সুযোগ তৈরি করা।

এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার আশু সমাধান হওয়া বা সেই উদ্দেশ্যে অপরাধীর জীবন ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দরকার হয়। এটা ঘটনা, এই কাজে সংযুক্ত পরিকল্পনাকারী, নীতি নির্দ্ধারক, সমাজবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট সমাজ এবং পরিবারের কাছে এই বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও সমস্যার তীব্রতা যে স্তরে বিরাজ করছে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে যদি সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তা না হলে উন্নত দেশগুলির মতো এক চিরাচরিত সমস্যা হিসাবে কৈশোর অপরাধ আমাদের দেশে বিরাজ করবে।

১১.৮ কিশোর অপরাধীর তত্ত্বাবধানমূলক প্রতিষ্ঠান

কোন এক সময় কিশোর অপরাধীকে যখন পুলিশ চিহ্নিত করে, দেরী না করে তাকে ধাপে ধাপে প্রথমে কোন সংস্থার হোমে ও পরে অন্য কোন আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের সংস্থাগুলির মধ্যে জুভেনাইল কোর্ট, শর্ট্ স্টে হোম, রিমাণ্ড হোম, সার্টিফায়েড স্কুল, অক্সিলিয়ারী হোম, ফষ্টার হোমস, সক্ষম ব্যক্তির সংস্থা (Fit Persons Institutions), অবহেলিত শিশুদের রক্ষণাগার (Uncared Children Institutions), সংশোধনমূলক বিদ্যালয় (Reformatory School) ও Borstal Institutions প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিশোর আদালত (Juvenile Court) একটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আদালত। কিশোর অপরাধীকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশকে তাকে (শিশুকে) এই আদালতে হাজির করাতে হয়। এই আদালতে ১৮ বছরের নীচের বয়সের শিশুদের নিয়ে বিচার হয় বলে এর কাজকর্ম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এখানে সাদা পোশাকে পুলিশ হাজির হয়। বিচার চালানোর পদ্ধতিও আলাদা ধরনের। বিচার চলাকালীন সাধারণ লোকজনকে ভেতরে থাকতে দেওয়া হয় না। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচারক এখানে দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। যদিও এই ধরনের আদালতের সংখ্যা খুবই কম। সাময়িক আশ্রয় (Short Stay Home) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় ১৯৬৯ সালে। এটি রূপায়ণের জন্য ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের কাছে এই প্রকল্প স্থানান্তরিত হয়।

মূল উদ্দেশ্য হল পারিবারিক ও সামাজিক নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বিপন্ন বালিকা বা মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান ও পুনর্বাসনের সুযোগ বাড়ানো। ২০০৪-২০০৫ সালে এই আশ্রয়/হোমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বিচারাধীন কিশোর অপরাধীর হাজত (Remand Home) এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে অপরাধীদের অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের নিরাপদে রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত কর্মীদের সাহায্যে তাদের শ্রেণীবিভাজন ও পর্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। কখনো কখনো তাদের কিছুদিন রাখার পর আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এই হোমের সংখ্যা খুবই কম। সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় এইসব হোম পরিচালিত হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিটি কিশোর আদালতের সঙ্গে কমপক্ষে একটা রিমান্ড হোম-এর ব্যবস্থা থাকে।

শংসায়িত বিদ্যালয় (Certified School) মূলত শিশুদের পরিচর্যা করার জন্যই গঠিত হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী দীর্ঘকালীন বা সাময়িক পরিচর্যার ব্যবস্থা এখানে করা হয়। যদিও সরকার সরাসরি নানান স্কুল পরিচালনা করে থাকে, তবুও এই ধরনের বিদ্যালয় অনুদানমূলক সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ন্যূনতম ৬ মাস ও সর্বাধিক তিন বছরের পড়ার সুযোগ থাকলেও শিশুরা এই সময়কালে প্রয়োজনে সাধারণ শিখা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনে যুক্ত হতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শিশুদের বিদ্যালয় থেকে মুক্ত করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এই মুক্তির পরবর্তী স্তরে প্রবেশন অফিসারের নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

কিশোর অপরাধীদের দেখাশোনার জন্য আরও একটি ব্যবস্থা হল সহায়ক হোম (Auxiliary Home). যে সব কিশোর অপরাধীর দণ্ডবিধান হয়, তাদেরকেই কিছুদিনের জন্য এই হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শংসয়িত বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে এই হোমগুলো গঠন ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন সমাজকর্মী এই হোমের ছেলে/মেয়ে অপরাধীর চালচলন ও ব্যবহার নিরীক্ষা করবেন এবং উপযুক্ত প্রতিবেদনসহ তাদের শংসয়িত স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

লালনপালন হোম (Foster Home) সাধারণত ১০ বছর বয়সের নীচে শিশু-অপরাধীদের যত্ন ও লালনপালনের জন্য গঠন করা হয়। যতদিন পর্যন্ত কৈশোরকালীন অপরাধের বিচারালয় ঐ শিশুর অন্য কোনভাবে পরিচর্যার বিষয়ে না সন্তুষ্ট হয়, কোন শিশু অপরাধীকেই ততদিন কোথাও পাঠানো হয় না। সরকারী সাহায্য নিয়ে সাধারণত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের হোম পরিচালনার কাজ করে থাকে।

সক্ষম ব্যক্তির সংস্থা (Fit Persons Institution) সাধারণত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

উদ্যোগে শিশুদের গ্রহণ করা, নিরাপত্তাদান করা, অত্যাচার/শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্যই গড়ে তোলা হয়। অবহেলিত শিশুদের রক্ষণাগারে (Uncared Children Institution) যে সব শিশুর অপরাধ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বা কোন অপরাধ করার অব্যবহিত আগে থেকেই তাদের যত্ন ও লালনপালনের ব্যবস্থা করে থাকে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এইসব সংস্থায় থাকার ফলে অপরাধপ্রবণ শিশুদের সঠিকভাবে জীবনযাপনের পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

অন্য আরও দুই ধরনের সংস্থা মূলত সংশোধনমূলক বিদ্যালয় (Reformatory School) এবং কারারুদ্ধ সংশোধন প্রতিষ্ঠানের (Borstal Institution) মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের পরিচর্যার বন্দোবস্ত করা হয়। দেখা গেছে, কখনো কখনো ১৫ বছর বয়সের কম তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অপরাধ করার একটা প্রবনতা আসে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত তাদের রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। সংশোধনমূলক বিদ্যালয়ে তাদের রাখার ফলে তারা লেখাপড়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ পায় এবং সুন্দর পরিবেশে নিজেদের মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ পায়। কারারুদ্ধ সংশোধন প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর থেকে ২১ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের রাখার ও সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশের বন্দোবস্ত করা হয়। কখনো খোলামেলা পরিবেশে কখনো রুদ্ধদ্বার অবস্থায় এই সংশোধনমূলক কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এইসব সংস্থা থেকে অপরাধীদের মুক্ত করার দিনক্ষণ ধার্য্য করা হয়।

১১.৯ কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার সমাধান বা নির্মূল করা দরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সমস্যার প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য যে সব আইনগত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বলবৎ হলেই অনেক কাজ হতে পারে। আইনরক্ষক ও আইন চর্চাকারীদের গভীর মনোযোগ এবং আইনরক্ষায় কঠোরতা একান্ত দরকার। ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত (সংশোধিত হয় ১৯৭৮ সালে) শিশু আইন এবং ২০০০ সালে প্রবর্তিত কৈশোর অপরাধী সুরক্ষা আইন ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্য বলবৎ করলেও বহুলাংশে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে। এই ধরনের আইন বলবৎযোগ্য করার প্রক্রিয়া যাতে আরও মজবুত ও

শক্তিশালী হয় তার জন্য পরিকল্পনাকারী ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পরামর্শ দান কেন্দ্র, মানসিক পরিচর্যা কেন্দ্র (Mental Care Centre), শিশুর পথ প্রদর্শন কেন্দ্র (Child Quidance clinic) ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলো যাতে আরও বেশি নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে কাজ করে সে ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান নানান সংস্থা বা বিভাগগুলো তাদের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি এই সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলায় উদ্যোগ নেবে। যদিও সংশ্লিষ্ট পরিবার সচেতন ও সজাগ থাকলে গোড়াতেই এই সমস্যা নির্মূল করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের ষষ্ঠ অধিবেশনে এই মর্মে সকলের সহমতের ভিত্তিতে বলা হয়—"কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিকারে শক্ত পারিবারিক বন্ধনের কোন বিকল্প নেই। সরকারী হস্তক্ষেপের বদলে সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি এক্ষেত্রে বেশি সাফল্য এনে দেয়। বিপথগামী তরুণ প্রজন্মকে তাদের পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচর্যা করাই সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক হয়। তাদের কৈশোর আদালতে পাঠালে সেই পথে আশানুরূপ সাফল্য সবসময় আসে না।" অধ্যাপক জে. সাহা (Prof. Smt. J. Shah)-র মন্তব্য উদ্ধৃতি করে বলা যায়—"স্থানীয় প্রতিবেশী স্তরে কৈশোর অপরাধের প্রতিরোধ সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে করা যায়।" সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিদ্যালয়সমূহ, পাড়া-প্রতিবেশী এবং পরিবারের সদস্যদের সামগ্রিক প্রয়াসেই এই সমস্যার প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কখনো আকর্ষণীয় বিদ্যালয় কর্মসূচি গ্রহণ, সংঘবদ্ধ সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ, স্নেহ-ভালোবাসার বাতাবরণ তৈরি করা, পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির মাধ্যমেও এই সমস্যার প্রতিকার হতে পারে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এইসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। কৈশোর অপরাধ প্রতিকারের জন্য গৃহীত কর্মসূচি-সুস্থ পরিবার গঠন, সংহতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা, সহায়ক শিক্ষালাভের সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও সৃজনশীল কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে গৃহীত হলে শিশুমনে মূল্যবোধ ও আইনগত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

১১.১০ অনুশীলনী

(ক) কৈশোর অপরাধ-এর সংজ্ঞা দিন। কৈশোর অপরাধ ও কৈশোর অপরাধীর মধ্যে তফাৎ কি? ভারতবর্ষে এই সমস্যার বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) কৈশোর অপরাধের পেছনে কি কি কারণ থাকে তা বর্ণনা করুন। এই সমস্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(গ) কৈশোর অপরাধীদের পরিচর্যার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) ডঃ বি. আর. কিশোর—ইন্সিডেন্স এন্ড ক'সেস অব জুভেনাইল ডেলিন্‌কুয়েন্সি।

(খ) ডঃ সুশীল চন্দ্র—সোশ্যিওলজি অব্ ডেভিয়েসান ইন ইন্ডিয়া।

(গ) রাজনাথ খান্না—জুভেনাইল টেন্ডেন্সী এন্ড স্কুল।

(ঘ) এস. এস. শ্রীবাস্তভ—জুভেনাইল ভ্যাগর‍্যান্সী।

(ঙ) ডঃ ভি. জগন্নাথন—প্রিভেন্‌শান্ অফ্ জুভেনাইল ডেলিন্‌কুয়েন্সি।

একক ১২ ❑ যুবসম্প্রদায়ের সমস্যা

গঠন

১২.১ ভূমিকা

১২.২ ধারণা

১২.৩ বৈশিষ্ট্য

১২.৪ সমস্যার বিশ্লেষণ

১২.৫ যুব বিক্ষোভ, আন্দোলন ও নেতৃত্ব

১২.৬ যুব কল্যাণ নীতি

১২.৭ আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

১২.৮ অনুশীলনী

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য যে যুবকেরাই দেশের প্রধান শক্তি। দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের সাফল্য অনেকটাই যুবশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক দেশের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে প্রত্যেক আন্দোলন বা বিপ্লবের ক্ষেত্রে যুবশক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি। কিছু প্রবীণ নেতৃত্বের পরামর্শের আড়ালে থেকেই যুবশক্তি মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা দিয়েই প্রতিটি আন্দোলন সাফল্য লাভ করে থাকে। যার ফলে বীর সৈনিক বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের কণ্ঠে যুবশক্তির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বলে গেছেন যে কেবলমাত্র যুবক, যুবকেরাই পারে দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত

রাখতে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুবকদের উজ্জীবিত করতে, তাদের মধ্যে সচেতনতা, সাহস ও উন্মাদনা সঞ্চার করতে এবং দেশগঠনের কাজে তাদের ভূমিকা মজবুত করতে এইসব মনীষীগণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১২.২ ধারণা

যুবসম্প্রদায় কারা ? অন্যভাবে বলতে গেলে যুবসম্প্রদায়ের ধারণাটি কি ? এসব প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে কঠিন এবং বহুধা বিভক্ত। সাধারণভাবে যুবসম্প্রদায় বলতে বোঝায় তরুণ বয়সের সেইসব মানুষ যাদের অসীম সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, বলবান ও উদ্যমী। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে "যুবসম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃগোষ্ঠীর সাথে আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়।" এটি হলো একটি সামাজিক জগৎ থেকে অন্য এক সামাজিক জগতে রূপান্তরের সময়কাল। কখনো কখনো আমাদের নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা নির্দিষ্ট বয়সকেই যৌবনকাল বলে ব্যাখ্যা করে থাকি। কিন্তু এই বয়স বা আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। যাই হোক, যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দিতে আমরা সরকারী নিয়ম অনুসরণ করতে পারি। এই নিয়মে বলা হয়েছে যে ১৫-৩৫ বছর বয়ঃগোষ্ঠীর মানুষকেই যুবসম্প্রদায় বলে বিবেচনা করা হবে। কিছুকাল আগে এই নিয়মেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তিত নিয়মানুসারে যুবসম্প্রদায়কে দু-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, সন্নিহিত যুবসম্প্রদায় (Adjacent youth), মূলতঃ ১২-১৯ বছর বয়স্কদের বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, পরিণত যুবসম্প্রদায় (Matured youth), মূলত ২০-৩৫ বছর বয়সীদের বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষে ১৫-৩৫ বছর বয়সী মানুষদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

দেশভিত্তিক বয়সের এই মানদণ্ড দিয়ে যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন শ্রীলঙ্কায় ১৫-২৯ বছর বয়সীদের বলা হয়ে থাকে যুবক-যুবতি, মালয়েশিয়ায় ১৫-৪০ বছর বয়সীদের, পাকিস্তানে ১৮-৩০ বছর বয়সীদের, ব্রুনেইতে ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের, সিঙ্গাপুরে ১৫-৩০ বছর বয়সীদের এবং হংকং-এ ১০-২৪ বছর বয়সীদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

১২.৩ বৈশিষ্ট্য

যুবসম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু বিশেষ ধরনের গুণাবলী যা

অন্যদের থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তাদের সাথে বয়স্কদের বা শিশুদের আচরণগত বা ব্যবহারগত কিছু তারতম্য খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

★ তারা শিহরিতপ্রাণ (vibrant)

★ তারা তেজোময় ও উদ্যমী

★ তারা আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল

★ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার গণ্ডি সীমিত

★ তাদের ধৈর্যশক্তি খুবই কম ও যে কোন কাজের তাৎক্ষণিক ফল আশা করে।

★ শ্রেয়'র চাইতে 'প্রেয়'র প্রতি তাদের প্রীতি বেশী।

★ তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাও বেশি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে তারা উৎসাহী হয়।

★ তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

★ তাদের হৃদয়ে থাকে ভালোবাসার দুর্নিবার টান।

এই ধরনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে যুব সমাজকে অন্যদের থেকে আলাদা করাটা খুব সহজ হয়।

১২.৪ সমস্যার বিশ্লেষণ

সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতো যুবসম্প্রদায়েরও বিশেষ ধরনের কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(ক) সারা বিশ্ব জুড়ে বেকার ও আংশিকভাবে নিযুক্ত যুব সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অতীতের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। বিশ্ব কর্মসংস্থান প্রতিবেদনে (World Employment Report 1998-99) এই পরিস্থিতিকে ভয়ানক এবং আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে প্রায় ৭৫০-৯০০ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ আংশিকভাবে নিযুক্ত বলে জানা গেছে। প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ (যারা ১৫-২৪ বছর বয়ঃগোষ্ঠীভুক্ত) ভীষণভাবে কাজের সন্ধানে ব্যস্ত বলে দাবি করা হয়েছে। ফলে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে বেকারত্ব ও আংশিকভাবে নিযুক্ত থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ব্যাপকহারে বেড়ে চলা বেকারত্ব ভারতের মতো দেশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

(খ) এই দেশের বয়ঃসন্ধিকালীন অপুষ্টি একটি ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, কারণ দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে বিশেষ করে এই বয়সের মেয়েদের কম বয়সে বিয়েও মাতৃত্বজনিত কারণে সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশে নানান প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়।

(গ) বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও প্রতি বছর হাজার হাজার কিশোরী অপহরণ ও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। যেমন—ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রায় ৯,০০,০০০ যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ইউরোপের পাশ্চাত্য দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫,০০,০০০ মহিলা ও কিশোরী পাচার ও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। স্বভাবতই, তরুণ প্রজন্মের কাছে এই সমস্যা অত্যন্ত সংবেদনশীল।

(ঘ) বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিয়ে করার প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পাবেই কিন্তু যৌন সম্পর্ক গড়ার আগ্রহ কমছে না। বহু সংখ্যক তরুণ-তরুণী সান্ধ্যকালীন বিনোদন হিসাবে ইন্টারনেটে ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নানান রকমের অশ্লীল ছবি ও দৃশ্য নিয়ে মেতে থাকছে। যেখানে নিয়ামক কর্তৃপক্ষ· কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম। সারা বিশ্ব জুড়ে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাইবার কাফে ও নৈশ ক্লাবের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবনের সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব দ্রব্য সেবনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য সেবনের অনুপাত হিসাব করলে দেখা যাবে ১৮-২৯ বছর বয়সের কোন না কোন যুবক-যুবতি এই দ্রব্য সেবন করেছেন এমন সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ। কোন কোন রাজ্যে এই সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

(চ) সারা বিশ্ব জুড়ে যত মানুষ মারা যায় তার প্রায় অর্ধেক সংখ্যায় থাকে ১০-২৪ বছরের তরুণ-তরুণী। পথ দুর্ঘটনা ও জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় কম বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুই বেশি ঘটে থাকে। ভারত, থাইল্যান্ড, উগান্ডা ও জিম্বাবোয়েতে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ যুবক-যুবতি মারা যাচ্ছে HIV/AIDS- এ আক্রান্ত হয়ে।

(ছ) দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও অধ্যবসায়ের ফলে এবং ন্যায্য আইনগত অধিকার ভোগে বঞ্চিত হয়ে যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ অনেক দেরিতে সমাজস্বীকৃত যৌনজীবনে প্রবেশ করছে ফলে তাদের যৌবনকাল অন্ধকারে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে দিনে প্রায় ৫৫,০০০ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে যার প্রায় ৯৫% সম্পূর্ণ বিপজ্জনক ও নিরাপদ নয় এমন। যাদের বেশিরভাগ ভুক্তভোগীই যুবতি বা অল্প বয়সী মহিলা।

(জ) বোধশক্তির অভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ না পেয়ে যুবসমাজের একটি বড় অংশ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিভাগের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ জন বালিকার মধ্যে ২২ জন এবং প্রতি ১০০ জন বালকের মধ্যে ১৮ জন আত্মহত্যার পথে যেতে চেয়েছে বা সেই ধরনের প্রবণতা রয়েছে। এই আত্মহত্যার পথ অবলম্বনের পেছনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে অসন্তোষ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষের চণ্ডীগড়ে শহুরে কর্মরত মহিলাদের ৩০-৩৫ বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক আত্মহত্যার ধারণা মাথায় এসেছে। জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তকরণ বিভাগের (National Crime Record Bureau) ১৯৯৬ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ৮৮২৪১ টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে ৩৮% হলো ১৫-২৯ বছর বয়সী এবং ৩৩% মাঝারি বয়সের মধ্যে পড়ে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৬২·৩৪ শতাংশ বাড়ে, অর্থাৎ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হতাশা ও অসচ্ছলতাই এর পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও যুবসম্প্রদায় আরও যে সব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে, তার কয়েকটি কারণ হল—

- ★ প্রযুক্তিগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ত আয়োজন।
- ★ মনঃ সমীক্ষা (Counselling) ও পরামর্শদানের অভাব।
- ★ অস্তিত্ব ও পরিচিতির অভাব।
- ★ অভিভাবকত্বজনিত দ্বন্দ্ব।
- ★ উপযুক্ত সময়ের আগে বিয়ে ও পিতামাতা হওয়া, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে।
- ★ রাজনীতিবিদ বা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থান্বেষীদের শিকার হওয়া।
- ★ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ও সমাজবিরোধী কাজকর্মে যুক্ত হওয়া।
- ★ হতাশা, বিষণ্ণতা ও সহানুভূতিহীনতার শিকার।
- ★ খেলাধুলা, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সৃজনশীল কাজকর্মের যৎসামান্য আয়োজন
- ★ মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের শিকার হওয়া।

উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবক ও যুবতীদের বেশীরভাগ কোন না কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। সামাজিক পরিবেশ তাদের আনন্দদানের, জীবন বিকাশের, সম্ভাবনা প্রকাশের এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারছে না।

১২.৫ যুব বিক্ষোভ, আন্দোলন ও নেতৃত্ব

ভারতের স্বাধীনতালাভের আগে ও পরে যুবসম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাদের ভূমিকা আরও সক্রিয় হয়। জাতীয় দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে যুবসম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিছুদিন আগেও দেখা গেছে যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ তাদের নিজেদের স্বার্থে ও নানান দাবি নিয়ে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত করেছে। বিগত কয়েকদশকে তাদের আচরণগত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহু যুবক-যুবতি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের সংগঠন স্থাপন করছে যেমন—ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, মহিলামণ্ডলী প্রভৃতি। এইসব সংগঠন সংগঠিতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে গঠনমূলক কাজকর্ম রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে এইসব যুবসংগঠন ও মহিলা সংগঠনগুলি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে উদ্যোগ নিচ্ছে। সাক্ষরতার কর্মসূচি, বনসৃজন, সচেতনতা শিবির, রক্তদান শিবির, HIV/AIDS-এর প্রতিরোধ আন্দোলন প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে মূলত দেশের যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে। দেশের জরুরী অবস্থার মোকাবিলাতেও যুবসমাজের মধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, একদিকে যেমন বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশে উদ্যোগী হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি দেশের নানান গঠনমূলক কাজেও যুবসমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

যুবসমাজ কেবলমাত্র হিংসাত্মক, ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা বা ব্যবহারের শিকার হয় তা নয়, তারা দেশের গঠনমূলক কাজেও ব্রতী হয়। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রায় পাঁচ লক্ষ যুবক-যুবতি নানান রকমের গঠনমূলক কাজে ও উন্নয়নমূলক কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও লক্ষাধিক পুরুষ ও মহিলা দেশের সেবায় জীবনের মূল সময় ব্যয় করে থাকে। একবিংশ শতকে সমাজ গঠনে ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে যুবসমাজের শক্তি ও গতিশীলতার দ্বার খুলে যেতে পারে। তাদের মধ্যে থাকা অসাধারণ শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে গঠনমূলক সম্ভার গড়ে তোলা যেতে পারে। ১৯৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক যুববর্ষ' বলে ঘোষণার পাশাপাশি আমাদের দেশে যুব সমাজের আদর্শ, তাদের কল্পনা ও তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাদের অংশগ্রহণে স্থায়ী সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে (General Assembly) যুবকদের সার্বিক বিকাশে দেশের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব যুবসম্প্রদায়-এর কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ে। অন্যদিকে আবার ১৯৯৮ সালে

কমনওয়েলথ যুব শাখা যুব সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসূচি পরিকল্পনা (Plan of Action for Youth Empowerment বা PAYE) রচনা করে। ২০০৫ সালের এই কর্ম পরিকল্পনায় বলা হয়— "যুবসমাজের তখনই ক্ষমতায়ন হয়, যখন তাদের নিজেদের জীবনে নিজেদের পছন্দ করাটা স্বীকৃত হয়, সেইসব পছন্দের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে পারে এবং সেই কাজের উদ্ভূত ফলাফল এর দায়িত্ব গ্রহণ করে।" দেশের সরকার এবং নাগরিক সমাজকে যৌথভাবে যুবসমাজের বৃদ্ধির অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

১২.৬ যুব কল্যাণ নীতি

যুব সমাজের মান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত ও বাস্তবোচিত নীতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অনুসারে নীতি (Policy) হলো সরকার বা কোন ব্যক্তি বা কোন দল যা করবে বলে ঠিক করে বা সম্মত হয়, তাকেই বোঝায়। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য 'নীতি' বলতে বুঝব একগুচ্ছ নির্দেশিকা যা সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিভাবে চলা যায় বা ভাবা যায় তার সুচিন্তিত পথ বলে দেয়। উন্নত দেশগুলোত যুব সমাজের সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য যুবনীতি প্রণয়ন ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার কথা ভাবা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও যুবনীতি প্রণয়নে এবং যুবসমাজের কল্যাণসাধনে অর্থবহ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই নীতি প্রণয়নের জন্য ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিগতভাবে যুব সমাজের দুটো পৃথক ধারা চিহ্নিত করা হয়।

প্রথমত, তারা সংবেদনশীল, উদ্যোগী, আদর্শবান, নিঃস্বার্থপর, শক্তিশালী ও অভিনব ভাবনার অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, তারা অবাধ্য, বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খল।

যুব সমাজের জন্য বাস্তবোচিত নীতি রচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবেই সহায়তা করে। যেমন—

★ ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় গোঁড়ামি।

★ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান।

★ বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত দারিদ্র্যতা।

★ বেকারত্ব ও আংশিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি।

★ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরক্ষতার উচ্চহার।

★ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগের অভাব।

★ যুবসম্প্রদায়ের প্রান্তিকীকরণ (marginalisation)।

★ লিঙ্গ ও জাতিভেদে অসাম্যতা।

★ খেলাধুলা ও গঠনমূলক সৃজনশীল কাজের অভাব।

★ কিশোর অপরাধী ও অপরাধ উভয়ের হার বৃদ্ধি।

★ মদ্যপান ও নেশাগ্রস্ততার কুপ্রভাব।

★ নির্যাতন, অপহরণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার ও ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি।

★ প্রযুক্তিগত দক্ষ লোকজনের অভাব।

দেশের যুবসম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের সময় উপরোক্ত বিষয়গুলো যেমন সহায়ক হয় অন্যদিকে তেমন সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থাও করা হয়। এই ধরনের নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের নিজেদের সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক বিকাশে তাদের অবদান ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, সরকারই যুব সমাজের উন্নয়ন ও তাদের সামগ্রিক বিকাশের কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে থাকে। কিন্তু এ কাজে আজকাল বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ সংস্থা, পরিবার, বণিক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি এগিয়ে আসছে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের নীতি প্রণয়নে সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান সক্রিয়ভাবে থাকার ফলে তার সুদূরপ্রসারী ফল অর্জন এবং যুবসম্প্রদায়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমষ্টির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভালোই হোক আর মন্দ, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে এই নীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোথাও ব্যক্তি হিসাবে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে এই নীতি বা কর্মপন্থার প্রভাব যুব সমাজের উপর পড়ে থাকে। কারণ যুব সমাজ তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য মূলতঃ সমাজ প্রদত্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ তাদের যুবসম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিকাশের জন্য কোন না কোন নীতি প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৫ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে অনুষ্ঠিত সভায় কমনওয়েলথ-এর যুব বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছিলেন যে, "প্রতিটি সদস্যভুক্ত সরকারের (কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত) ২০০০ সালের মধ্যে যুব সমাজের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা থাকবে যেখানে দেশের যুব সমাজের জন্য সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি উল্লিখিত থাকবে। সেই দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য কোথাও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আবার জাতীয় স্তরে আলোচ্য সূচি হিসাবে যুব সমাজের বিষয়গুলো উঠে আসতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে দেশের যুব সমাজের জন্য কর্মপন্থা রচনা করা মানেই সেই দিন থেকে যুব সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করবে। যদি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার নিশ্চিত হয় যে, সেই কর্মপন্থার বাস্তবায়নে যুব সমাজের প্রকৃত সমস্যা কতটা সমাধান করা যাবে, তাহলেই তা সম্ভব। সুতরাং কর্মপন্থা রচনার দিন থেকেই সংশ্লিষ্ট সরকারকে যুব সমাজের কল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও কলাকৌশল স্বার্থকভাবে রূপায়ণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হয়।

যুব সমাজের জন্য গৃহীত কর্মপন্থায় নানান সুযোগ/প্রয়োগ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যুব সমাজের উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধনায় এইসব ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশভিত্তিক সেইসব ক্ষেত্র আলাদা আলাদা হলেও তাদের জন্য গৃহীত কর্মপন্থায় যেসব উপাদান সংযুক্ত করা হয়, তার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল।

★ যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য স্বচ্ছ দূরদর্শিতা প্রদর্শন।

★ নীতি ও মূল্যবোধ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতিদান।

★ ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি।

★ যুব সমাজের জন্য রচিত কর্মপন্থার উদ্দেশ্য, জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি স্থাপন।

★ লিঙ্গবৈষম্য বর্জিত একটি দলিল।

★ যুব সমাজের সমস্যা ও ভবিষ্যত অগ্রগতির প্রতি সামগ্রিকভাবে নজরদান।

★ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা পদাধিকারীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দলিল।

★ নতুন প্রজন্মের জীবনপঞ্জী পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট দলিল।

কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যখন যুব সমাজের জন্য কোন কর্মপন্থা রচনা করতে যায়, তখন বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয়। যেমন—

★ গুণগত ও পরিমাণগত লক্ষ্য পূরণের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল থাকা।

★ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা (নির্দিষ্ট, পরিমেয়, লক্ষ্যপূরণ সাপেক্ষ, বাস্তবসম্মত, সময় নির্দিষ্ট বা Specific, Measurable, Achierable, Realistic and Time-bound-SMART)

★ যুবসম্প্রদায়ের সঙ্গেও সমষ্টির লোকজনের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেই প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা।

★ উদ্দেশ্যমূলক ও গভীরভাবে পর্যালোচনার সুযোগ থাকা।

★ কাজের বিস্তৃতসূচক ও সাধারণ সীমারেখা থাকা।

★ বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর যুব সমাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মপন্থার ব্যাখ্যা থাকা প্রভৃতি।

১২.৭ আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যুব সমাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ৩৪তম সাধারণ সভায় ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ হিসাবে পালন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই দিবস পালনের মূল্য বিষয় হিসাবে তাদের "অংশগ্রহণ, উন্নয়ন ও শান্তি"র জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যুব সমাজের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে যুব সমাজের অবদান, তাদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, শেখার আগ্রহ ও বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য ইচ্ছার জন্য এইসব দেশে তাদের সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের স্বভাব ও গুণাবলীর জন্য দেশের সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই জন্যই আমাদের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মপন্থায় যুব সমাজকে ও যুব সংগঠনকে কাজে লাগানোর বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়ার দরকার হয়। এই ধরনের যুব সংগঠন সরকারী বা বেসরকারী নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করে থাকে। এমনকি সমষ্টির চাহিদা ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের উদ্যোগেও নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সরকার এইজন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নানান রকম উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই ধরনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার তার নানান কর্মকাণ্ডে সমষ্টির মানুষজন (বিশেষ করে যুব সমাজ)-এর অংশগ্রহণের নানান উপায় অবলম্বন করছে। দেশের গঠনমূলক কাজে ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যুব সমাজের অংশগ্রহণেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব এবং তার জন্য দেশের যুবশক্তিকে জাগানো ও তাদের প্রাণশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা খুবই জরুরী। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ মানেই তাদের নিজেদের উন্নয়ন ও সামগ্রিকভাবে সমষ্টির উন্নয়নও হয়ে থাকে। যে কোন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ সমষ্টির অংশগ্রহণের পাশাপাশি যুব সমাজের অংশগ্রহণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহুক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয় না বা উৎসাহ দেওয়া হয় না। কারণ সে বিষয়ে চিরাচরিত উদাসীনতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব ও সংকল্পগ্রহণের মানসিকতার অভাব। গ্রামীণ অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচির আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত না হওয়ার পেছনে যুব সমাজের অংশগ্রহণকেই দায়ী করা হয়। আমাদের ধারণা আছে যে, যেখানে সাক্ষরতার হার কম সেখানে সমষ্টির অংশগ্রহণও কম।

অন্যদের অর বিপরীত ধারণাও আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে নিরক্ষর সমষ্টিতেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানো যেতে পারে, যদি তাদের উপযুক্তভাবে সংঘবদ্ধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে সেই সম্ভাবনা ও সদ্‌ভাবনা থাকে।

আমাদের অগ্রগতি ও সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের লক্ষ্যে শান্তি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যা পরিস্থিতি তাতে শান্তি নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শান্তির বার্তাবাহক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী সবকিছুর বিনিময়ে দেশের শান্তিরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের মানুষ এখনও তাঁকে স্মরণ করে। এখনও মানুষ বিশ্বাস করে যে, দেশের অগ্রগতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। ধ্বংস মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যদিও বহুমত, বহু মতবাদ এখানে থাকতে পারে। অনেকে মনে করতে পারেন যে দেশের উন্নয়নে শান্তির কোন ভূমিকা নেই। এমনকি শান্তি মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য করে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে একটা প্রতিযোগী পরিস্থিতি দুর্দান্ত ফল দেয়, মানুষকে ঘুম থেকে টেনে তুলে আনে সেই প্রতিযোগিতায় নামার জন্য এবং ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক যুব বর্ষের তিনটি উপাদান একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যা যে কোন দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমনওয়েলথ দেশভুক্ত একটি সদস্য দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ১৯৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ' হিসাবে পালন করে।

এই আন্তর্জাতিক যুব বর্ষে কতকগুলো উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। যেমন—

★ সাধারণের মধ্যে যুব সমাজের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার নানান দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

★ যুব সমাজের নিজেদের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার ঘটানো হয়।

★ যুব সমাজের কল্যাণ সাধনায় সরকারী বিভাগ ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর উপযুক্ত ভূমিকা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়।

★ যুব সমাজের কল্যাণে কিছু অর্থবহ কর্মসূচীর সূচনা করা হয়।

★ জাতীয় অগ্রগতিতে যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবা হয়।

উপরোক্ত নানাবিধ উদ্দেশ্য পালনের কথা মাথায় রেখেই সমগ্র দেশ জুড়ে যুব বর্ষ উদযাপিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী নানা বিভাগের পাশাপাশি যুব সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে এই বছরটিতে বিশেষ উন্মাদনার সঞ্চার হয়।

১২.৮ অনুশীলনী

(ক) যুবসম্প্রদায় বলতে কি বোঝায়? যুবসম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) আজকের যুবসম্প্রদায় নানান রকমের সমস্যায় জর্জরিত।—সেগুলি কি কি?

(গ) আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ পালনের যৌক্তিকতাসহ এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

(ঘ) বিক্ষোভ কি? ভারতবর্ষে কি ধরনের যুব বিক্ষোভ সংগঠিত হয় এবং তার কারণগুলো কি কি?

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) Youth Welfare In India, —L. J. Kudchedkar.

(খ) Encyclopaedia of Social Work in India, Vol-II, Social welfare Deptt. govt. & India.

(গ) Social Welfare in India, Social Welfare Department, govt. of India.

Note